ইতিহাস-চর্চা জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা

ইতিহাস-চর্চা

জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা

সম্পাদক

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী

কলকাতা

প্রথম প্রকাশ—১৯৮৫

© পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৮৫

কালান্তর প্রেস, ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭ হইতে মুদ্রিত ও কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত।

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের জন্মলগ্ন থেকেই, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল সাবলীল বাংলা ভাষায়, সুলভে, ইতিহাসের গবেষণা গ্রন্থ। প্রবন্ধ-সমষ্টি ও পুস্তিকা প্রকাশ করে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার প্রসার ঘটানো।

আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ যে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুস্তক-প্রকাশক কে. পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ইতিহাস সংসদের বই ও পুস্তিকা নিয়মিত প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছেন। "ইতিহাস চর্চা : জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা" গ্রন্থটি সেই যুগ্ম উদ্যমের প্রথম পরিচিতি বহন করছে।

ইতিহাস সংসদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ ডঃ ইকতিদর আলম খান যে ইংরেজি ভাষণ দিয়েছিলেন, তার পূর্ণ বঙ্গানুবাদ দিয়ে গ্রন্থটি শুরু করা হয়েছে। সম্মেলনে ও সংসদের বিভিন্ন আলোচনাচক্রে অন্যান্যদের নির্বাচিত ভাষণও এখানে স্থান পেয়েছে—যেমন ডঃ অশীন দাসগুপ্ত, ডঃ গৌতম নিয়োগী ও অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়। ডঃ বরুণ দে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ ইংরেজী প্রবন্ধের ভাষান্তর ছাপার অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অনুবাদ কর্মে সহায়তা করেছেন কুণাল চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িকতার উপর দুটি দীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জী খণ্ডটিকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রত্যেকেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

"কালান্তর" ছাপাখানা পরিচালকবর্গ ও সমস্ত কর্মীরা নিরলস পরিশ্রম ও যত্ন করে যথাসময়ে বইটি বের করায়, তাঁদেরও অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

আমরা আশা ও ভরসা রাখি পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের সকল উৎসাহী ছাত্র, শিক্ষক ও অনুরাগী এই গ্রন্থটি পড়ে উপকৃত হবেন।

২ পাম প্লেস
কলকাতা ৭০০০১৯
১৪ সেপ্টেম্বর
১৯৮৫

ইতি
গৌতম চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

মধ্যযুগের ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি
ইকতিদার আলম খান — ১

জাতীয়তাবাদ, ধনতন্ত্র, ঔপনিবেশিকতা : সম্পর্কের জটিলতা
বরুণ দে — ২২

সাম্প্রদায়িকতা ও ইতিহাস চেতনা
অশীন দাশগুপ্ত — ৬৫

ভারতের জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের ধারার গুরুত্ব
গৌতম চট্টোপাধ্যায় — ৬৯

প্রসঙ্গ : সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতের ইতিহাস
গৌতম নিয়োগী — ৮২

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক বাংলাগ্রন্থের সূচী
গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী—সংকলিত — ১১৬

ভারত-ইতিহাস চর্চায় সাম্প্রদায়িকতা : গ্রন্থপঞ্জী
গৌতম নিয়োগী—সংকলিত — ১৭৩

মধ্যযুগের ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি

ইকতিদার আলম খান

যে উদারনৈতিক চিন্তাসমূহ ভারতীয় সংবিধানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট আছে, এবং যেগুলি আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্র সংগঠনের সাধারণ কার্যপ্রণালীর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে, সেগুলি বাস্তবে একটি যথার্থঃ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, অর্থাৎ এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মের কোনো ভূমিকা পালন করাই সম্ভব হবে না, তেমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। জোরটা পড়ে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার উপর নয়, বরং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তার মধ্যস্থতা করার ভূমিকার উপর। কিন্তু, একই সঙ্গে, রাষ্ট্রকে দেখা হয় হিন্দু সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা সংস্কার করার হাতিয়ার রূপে। ইসলামিক প্রতিষ্ঠানদের ক্ষেত্রেও তার কাছ থেকে অনুরূপ, কিন্তু কম দৃশ্যমান ভূমিকা পালনের আশা করা হয়।(১) সুতরাং আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রকে বলা যায় 'একটি ধর্মোত্তর সংগঠন, যাকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানদের প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। নিজেকে একটি বিশেষ ধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে একাত্ম না করলেও, এই রাষ্ট্র দেশের সবকটি প্রধান ধর্মকে, এবং তাদের মাধ্যমে ঐ ধর্মগুলির অনুবর্তী জনগণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে, আধুনিকীকরণ ও ধনবাদী বিকাশের ঘটমান প্রক্রিয়াকে যে সামাজিক রীতিগুলি সাহায্য করে তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানে আনতে চায়। এ থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় সংবিধানের নিয়ামক নীতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ধারণা গাঁথা আছে, তা ভারতীয় ব্যবস্থার একটি

---

১ দ্রষ্টব্য: এম. এন. রায়, **র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট**, বম্বে, ১৪ মে ১৯৫০, ভি. কে. সিংহ সম্পাদিত **সেকুল্যারিসম্ ইন ইণ্ডিয়া**, ১৯৬৮, পৃঃ ১৫৪ তে পুনর্মুদ্রিত; ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথ, **ইণ্ডিয়া অ্যাস এ সেক্যুলার স্টেট**, ১৯৬৩, পৃঃ ২১৬-৩৪; ও সেতলওয়াদ, **সেক্যুলারিসম**, প্যাটেল মেমোরিয়াল লেকচার, ১৯৬৫ পৃঃ ১৭,২২।

বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থায় একটি বুর্জোয়া-ভূস্বামী জোটকে একটি অনুন্নত ও কৃষ্টিগতভাবে খণ্ডিত সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও ধনবাদী বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

এই বিশেষ ধরণের ধর্মনিরপেক্ষতার পূর্ব ইতিহাস কি, তা একটি বিতর্কিত বিষয়। সমাজবিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। তাঁদের উত্তর নির্ভর করেছে আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্র সংগঠন তার বর্তমান রূপ পাওয়ার পিছনে কোন কোন শক্তি ও প্রভাবের হাত ছিল, সে বিষয়ে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি। একথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার অনেকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বাস্তব রূপ নিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে।(২) এগুলি ছিল গান্ধীবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের সারগ্রাহী কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও স্বার্থবাহী গোষ্ঠীর রফা ও মীমাংসার ফল। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তর্নিহিত ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আচরণের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে ভারতের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে, এই প্রস্তাবনাও বিবেচনাযোগ্য।(৩) কিন্তু মনে হয় যে এই প্রশ্নের উত্তর আরেকটি, এবং সম্ভবত বেশী প্রাসঙ্গিক দিক থেকে দেওয়ার চেষ্টা করা যায়। তা হল, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রের স্থায়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির রেখাচিত্র আঁকা। এই পথে অনুসন্ধান চালাতে পারলে বোঝা যাবে, আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যসমূহের উৎস কি পরিমাণে প্রাক-আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে পাওয়া যাবে। বর্তমান লেখকের পূর্বতন একটি নিবন্ধে দেখানো হয়েছে, মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির

---

২ নিখিল ভারত কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে (১৯৩১) একটি প্রস্তাব গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম এমন একটি রাষ্ট্রের উল্লেখ করা হয়, যা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সালিসি করতে পারবে। এই প্রস্তাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘুদের জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তার স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয় "রাষ্ট্র সমস্ত ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষতা দেখাবে।" রাধাকৃষ্ণন পরে এই চিন্তার আরও বিকাশ ঘটান এবং বিশেষভাবে বলেন যে একে "সেক্যুলারিস্‌ম বা নাস্তিকতার সঙ্গে" গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। দ্রষ্টব্য : সেরুলওয়াদ, **সেক্যুলারিসম**, পৃঃ ১৭, ২২।

৩ বেদান্তের দর্শন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করে, রাধাকৃষ্ণনের এই যুক্তির সংক্ষিপ্তসারের জন্য দ্রষ্টব্য : ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথ, **ইণ্ডিয়া অ্যাস এ সেক্যুলার স্টেট**, পৃঃ ১৪৭।

কার্যপ্রণালীর নিবিড় অনুসন্ধান দেখায়, ১৮শ শতকের শেষ পর্যন্ত ভারতে যে বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক সংগঠনের বিবর্তন ঘটছিল, তার সমস্ত বিশেষ দিকগুলি সহ ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা যেন তারই একরকম সম্প্রসারণ।(৪) বর্তমান প্রবন্ধে আমি ঐ একই যুক্তির উপর আরও বিস্তৃত আলোচনা করব, এবং ইতিমধ্যে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ উদ্ঘাটিত হয়েছে তার উল্লেখ করব।

এই প্রসঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর আধিপত্যাধীন মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা প্রাসঙ্গিক হবে। এই রাষ্ট্রগুলি অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বজায় থাকত, দুটি স্পষ্টত সনাক্ত করা যায় এমন শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাথমিক যুদ্ধ ও দখল কায়েম করার পর কার্যোপযোগী আপোষ রফার ভিত্তিতে। এই গোষ্ঠী দুটি হত রাজার প্রধানত মুসলিম সেনাধ্যক্ষরা এবং মূলতঃ হিন্দু স্থানীয় পরম্পরাগত প্রধানরা। উভয় গোষ্ঠীই প্রাপ্তিসাধ্য সামাজিক উদ্বৃত্ত দখল করার ভিত্তিতে বজায় থাকত এবং বিভিন্ন স্তর থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করত। সুতরাং রাজার সেনাধ্যক্ষদের এবং বংশানুক্রমিক প্রধানদের একই শাসক শ্রেণীর দুটি খণ্ড রূপে দেখা যুক্তিসঙ্গত হবে। এই বৃহত্তর শাসক শ্রেণীর প্রাথমিক স্বার্থসিদ্ধিই ছিল মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির লক্ষ্য। অবশ্যই, এই রাষ্ট্রগুলিতে আদায়কৃত উদ্বৃত্তের সিংহভাগ দখল করত রাজা ও তার উচ্চতম কর্মচারীরা, এবং তার ফলে অবধারিতভাবে বংশানুক্রমিক প্রধানরা বহু সময়ে ক্ষুব্ধ হত, এমন কি রাষ্ট্রীয় আয়ের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে রাজা ও তার সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হত। পারসিক রচয়িতারা বহু ক্ষেত্রে সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে দেখতেন তাঁদের ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার চশমা পরে। ফলে তাঁদের উপলব্ধিতে ভ্রান্তি ছিল। তাঁরা এই সংঘাতগুলিকে একটি ধর্মযুদ্ধের অঙ্গ বলে চরিত্রায়ণ করেন। তাঁদের উপলব্ধি অনুযায়ী, একজন মুসলিম শাসকের কর্তব্য ছিল অবিরাম এইরকম ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই, যখন রাজস্ব সংকোচনের পরিস্থিতি দেখা দিত শাসকশ্রেণীর এই ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্ব তখন হিংস্র ও দীর্ঘায়ত হয়ে পড়ত। অন্যদিকে, যখন একটি রাষ্ট্রের হাতে থাকত

৪ ইকৃতিদার আলম খান, 'দ্য সেকুলার স্টেট ইন ইণ্ডিয়া ; হিস্টোরিক্যাল পারস্পেক্টিভ', এসেস ইন অনার অভ প্রফ. এস. সি. সরকার, পি, পি, এইচ, ১৯৭৬, পৃ ১৬৬।

দ্রুতহারে প্রসারমান সম্পদ, তখন শাসক শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন কমে যাওয়ার ঝোঁক দেখা দিত, এবং হিন্দু নেতারা মুসলিম রাজন্যবর্গ ও তাদের সেনাধ্যক্ষদের আধিপত্যাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মতা দেখানোতে অনেক বেশী উৎসাহিত হত। কখনো কখনো শাসকশ্রেণীর মধ্যে তুলনামূলক শান্তির সঙ্গে সঙ্গে আসত রাষ্ট্রের কার্যপ্রণালীর নিয়ামক নীতিতে পরিবর্তন, যার লক্ষ্য হত অ-মুসলিম গোষ্ঠীদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও তাদের জন্য স্থান করে নেওয়া।

উপরে শাসক শ্রেণীর যে পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে, যে রাষ্ট্র তার প্রতিনিধিত্ব করত, তা ইসলামিক ধর্মরাষ্ট্র হিসেবে সংগঠিত হয়ে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের প্রচারের জন্য একনিষ্ঠতা দেখালে বেশীদিন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারত না। জিয়াউদ্দিন বারাণী এবং আবুল ফজল সার্বভৌমিকতার সমস্যা প্রসঙ্গে যে মন্তব্যগুলি করেছেন তা পূর্ণমাত্রায় প্রমাণ করে যে শুধু মুঘল সাম্রাজ্য নয়, দিল্লীর সুলতানতন্ত্রও পুরোদস্তুর ইসলামিক ধর্মরাষ্ট্র ছিল না এবং বাস্তবে তারা তাদের রাষ্ট্র সংগঠনের মধ্যে অনেকগুলি সুস্পষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে বহন করত। এ কথাও মনে করা যায় যে তাঁরা রাষ্ট্রতত্ত্বের যে সমস্ত আবশ্যক চরিত্র ব্যাখ্যা করেন তার কিছু কিছু প্রথম ইসলামিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বের বদলে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রতত্ত্ববিদদের রচনা থেকে ধার করা ছিল। এই হল আরেকটি ইঙ্গিত, যা দেখিয়ে দেয় মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রগুলিতে কোন ধরণের এবং কতটা রূপান্তর ঘটছিল, যা তাদের একটি মিশ্র শাসক শ্রেণীর বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলছিল। নীচে আমরা বারাণী ও আবুল ফজলের রচনাবলী বিশ্লেষণ করে উপরে উল্লিখিত দুটি বক্তব্য প্রমাণ করার মাধ্যমে এই রাষ্ট্রগুলির ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রসমূহের অনুসন্ধান আরম্ভ করব।

বারাণীর—ফতোয়া-ই জাহান্দারী—দিল্লী সুলতানতন্ত্রের প্রকৃত চরিত্র বোঝা সম্ভব করে তোলে। মুহম্মদ হাবিব লিখেছেন যে ঐ রাষ্ট্র "কোনো অর্থেই একটি ধর্মরাষ্ট্র [theocratic state] ছিল না। ইসলামের শরিয়ত নয়, রাজা কর্তৃক সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় আইন বা জাওয়াবিৎ ছিল তার ভিত্তি।" বারাণীর সংজ্ঞা অনুযায়ী জাবিতা হল "রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য রাজা নিজের উপর বাধ্যতামূলক কর্তব্যরূপে চাপিয়ে দেন এমন কার্যপ্রণালী, এবং যা থেকে তিনি নিজে কখনো বিচ্যুত হন না।" একথা স্পষ্ট, যে এই জাওয়াবিৎ

বহু সময়ে রাজন্যবর্গ ও রাজার সেনাধ্যক্ষদের প্রতি আনুকূল্য দেখাবে। বারাণী একটি সাধু আশা পোষণ করেন যে সুলতান কর্তৃক সৃষ্ট জাওয়াবিৎ যেন শরিয়তের ধারা ভঙ্গ না করে। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন যে জাওয়াবিৎ কোনো ধর্মগ্রন্থ বা উলেমা কর্তৃক তার ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সৃষ্ট ছিল না। রাজা এই আইনগুলির প্রণয়ন করতেন তাঁর রাজ্যের জন্য কি ভাল, তিনি নিজে তা যেরকম বুঝতেন তার ভিত্তিতে। মুহম্মদ হাবিবের ভাষায় "বারাণী আমাদের কোনো সন্দেহেই রাখেন নি। কোনো সংঘর্ষের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন (অর্থাৎ জাওয়াবিৎ) শরিয়তের চেয়ে বড় হত।"(৫) প্রয়োগক্ষেত্রে ভারতের মুসলিম শাসকদের দ্বারা প্রণীত বহু জাওয়াবিৎ রাষ্ট্রের উপর ইসলামিক শরিয়তের প্রভাবকে লঘু করে দিত। পঞ্চদশ শতকে কাশ্মীরের জয়নুল আবেদীন গোহত্যা নিষেধ করে যে জাবিতা প্রণয়ণ করেন(৬) এবং যা শুধু আকবরের শাসনকালে(৭) নয়, এমন কি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের শাসনকালেও সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যে বলবৎ ছিল(৮), এই ধরণের জাওয়াবিতের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে সেটির কথা বলা যায়। এ কথা বোঝা দরকার যে মুঘল সাম্রাজ্যে গোহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা, এবং পবিত্র বলে মনে করা হত এমন অন্যান্য প্রাণীহত্যার উপরও নিষেধাজ্ঞা, কেবল হিন্দু প্রজাদের প্রতি সদিচ্ছার ইশারাজ্ঞাপক পদক্ষেপ ছিল না। এই জাওয়াবিতগুলির সঙ্গে ছিল কড়া শাস্তির ব্যবস্থা। গোহত্যা বা ময়ূর বধের দায়ে অভিযুক্ত মুসলিমদের যে সরকারী কর্তৃপক্ষ শাস্তি দিয়েছে,

---

৫. মুহম্মদ হাবিব, **দ্য পলিটিক্যাল থিয়োরী অভ দ্য দিল্লী সুলতানেট,** কিতাব মহল, এলাহাবাদ, মুখবন্ধ, পৃঃ ৬

৬ জয়নুল আবেদীন কর্তৃক গোহত্যা নিষেধ করা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, আবুল ফজল, **আইন-ই আকবরী**, ২য় খণ্ড, নাভাল কিশোর, পৃঃ ১৮৫।

৭ আবদুল কাদার বাদাউনী, **মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ**, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ২৬১।

৮ মোগল সাম্রাজ্যের জনৈক অধস্তন কর্মচারী, সুবাট সিং, ১৬৪৪-৪৭-এর মধ্যে রচনা করেন **তাজকিরা-ই পীর হাস্সু তেলি**। এই গ্রন্থের পৃঃ ৩০বি—৩৭এ পড়লে মনে হয়, পাঞ্জাব অঞ্চলে শাহজাহানের শাসনের মধ্যভাগ পর্যন্ত গোহত্যা নিষিদ্ধ ছিল।

এমন ঘটনা নথিভুক্ত আছে। এটা স্পষ্টতই শরিয়তের মর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা।(৯)

রাষ্ট্রের কর্তব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বারাণী স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরেন যে "প্রশাসনিক জীবনে স্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল প্রত্যেককে নিজের যথাযথ কাজের ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখা, কারণ তা হলে দেশের প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থার উন্নতি হয়।" তাঁর মতে, "যখন একটি পেশাভুক্ত ব্যক্তিগণ মুনাফার প্রেরণায় অপর একটিকে গ্রহণ করেন, তখন (রাষ্ট্রের) জীবন স্থিতিশীল থাকে না।" **ফতোয়া-ই-জাহান্দারীর** এক জায়গায় তিনি জনগণের পেশা অনুসারে সমাজে বুদ্ধিজীবি, যোদ্ধা ও কারিগর, এই তিনটি বিভাগ সৃষ্টি করতে বলেন। আরেক জায়গায় তিনি ছ'টি পেশাগত গোষ্ঠীর উল্লেখ করেন : যোদ্ধা, কৃষিজীবি, ফাটকাবাজ, দোকানদার, ব্যবসায়ী এবং রাজ-কর্মচারী। এই গোষ্ঠীগুলির উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বারংবার বলেন যে সমাজের ভালর জন্যই এদের পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে।(১০) এই যে গোষ্ঠীগুলিকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, তারা হল জন্মের ভিত্তিতে মানুষের যে দুটি বড় ভাগ তিনি দেখিয়েছেন, সেই সৃফাজিল ও আরাজিলের মধ্যে বিভাজনের পর। মানুষের জন্ম ও পূর্বপুরুষ অনুযায়ী বিভাজন কোরাণোত্তর পর্বের ইসলামিক সমাজে নতুন বিভাজন নয়। যে সব মুসলিম তাত্ত্বিকরা আব্বাসিদদের পরবর্তীকালের তুর্কী আধিপত্যাধীন রাষ্ট্রগুলির কার্যপদ্ধতিকে ভিত্তি করে সাধারণীকরণ করেছেন, এই বিভাজন তাঁদের রচনায় কেন্দ্রীয় বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।(১১) কিন্তু সমাজ তিনটি বা ততোধিক পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত, এবং এক পেশা থেকে আরেকটিতে যেতে না দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে তাদের মধ্যে ভারসাম্য রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে, এই তত্ত্ব গ্রহণ করে বারাণীর রাষ্ট্রতত্ত্ব গোড়ার দিকের মুসলিম তাত্ত্বিকদের স্বীকৃত অবস্থান থেকে সরে গেছে। এদিক থেকে তিনি যেন

---

৯ আবদুল কাদার বাদাউনী, **মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ**, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮, এবং **ট্রাভেলস অভ ফ্রে সেবাস্টিয়ন ম্যানরিক** ১৬২৯-১৬৪৩, অনুবাদ, একফোর্ড লুয়াড', ২য় খণ্ড, অক্সফোর্ড', ১৮২৭, পৃঃ ১১৩।

১০ মুহম্মদ হাবিব অ্যাণ্ড আফসার উমর, **দ্য পলিটিক্যাল থিয়োরী অভ দ্য দিল্লী সুলতানেট**, পৃঃ ৩৮, ৯৭।

১১ নিজামুল মুল্ক, তুসি, **শিয়াসৎনামা**, তেহরাণ, ১৩৪৮, পৃঃ ২১৬।

কৌটিল্য, নারদ প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় লেখকদের সুপরিচিত নির্দেশের অনুবর্তী, যে শাসকের কর্তব্য হল কোন ব্যক্তিকে তার বর্ণ বা জাতির নিয়মের বাইরে পদক্ষেপ করতে না দেওয়া।(১২)

সার্বভৌমিকতার সমস্যা প্রসঙ্গে আবুল ফজলের মন্তব্যগুলির গভীর অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে দিল্লীর সুলতানতন্ত্রের জন্ম থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রক্রিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি সার্বভৌমিকতার নতুন যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা রাষ্ট্রকে একটি বিশেষ ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখার রীতিকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দেয়। **আইন-ই মঞ্জীল** আবাদীতে (যাকে ব্লকম্যান অসতর্কভাবে অনুবাদ করেছিলেন "আইন-ই, দ্য হাউসহোল্ড") আবুল ফজল রাজশক্তির সংজ্ঞা দেন নিম্নরূপ : "ঈশ্বর নিঃসৃত একটি আলোক, **ফারর-ই ইজাদী**, যা ঈশ্বর রাজাদের কাছে কোনো ব্যক্তির মধ্যস্থতা ব্যতীতই প্রদান করেন।" "**ফারর-ই ইজাদী** অবগত হওয়ার ফলশ্রুতি" হিসেবে অন্যতম সদগুণ হত এই, যে রাজা সর্বদাই "ধর্মীয় গোষ্ঠীগত পার্থক্যের" ঊর্ধ্বে থাকবেন। ধর্ম বা অন্য যে কোনো রকম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে প্রভেদ না করে, তাঁর সমস্ত প্রজাকেই তিনি সমানভাবে রক্ষা করবেন ও বদান্যতা দেখাবেন।(১৩) সার্বভৌমিকতার এই নতুন তত্ত্বের কাঠামোর ভিতরে জিম্মিদের উপর নির্দিষ্ট কতকগুলি ধরনের বাধানিষেধ চাপিয়ে দেয় যে ধারাগুলি, সেগুলির কোনো স্থান ছিল না। এই তত্ত্ব রাষ্ট্রকে বিশেষ কোনো একটি ধর্মের প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত হতেও দেয় না। বরং অন্যদিকে, আবুল ফজল কর্তৃক লিপিবদ্ধ সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী রাজা তাঁর রাজ্যে সার্বজনীন মিলনসাধন (**সুল্‌হ্‌-ই কুল**) করতে বাধ্য ছিলেন। **আইন-ই আকবরীর** তৃতীয় খণ্ডে, **আহ্‌ওয়াল-ই হিন্দুস্তান** শীর্ষক একটি আলোকদায়ক অংশে ভারতীয় সমাজে দৃশ্যমান "ভুল বোঝাবুঝি" ও "বিবাদসমূহের" কারণ ব্যাখ্যাকালে তিনি আকারে ইঙ্গিতে বোঝান যে ধর্মীয় নিপীড়ন, অন্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত

---

১২ আর শ্যামাশাস্ত্রী, **কৌটিল্যস অর্থশাস্ত্র**, মহীশূর, ১৯৬৭, পৃঃ ৭, এবং ইউ. এন. ঘোষাল, দ্রঃ **দ্য ক্লাসিকাল এজ**. আর. সি মজুমদার (সম্পাদিত), ১৯৭০, পৃঃ ৩৪৫।

১৩ আবুল ফজল, **আইন-ই-আকবরী**, ১ম খণ্ড, এইচ ব্লকম্যান কর্তৃক অনুদিত, পৃঃ ৩-৪।

আইন অনুসরণ করা (ওয়ারজিদান-ই তুন্দ বাদ-ই তাগলিদ ওয়া আফস্থুরদান-ই চিরাঘ-ই খিরাদ) এবং জনগণের পক্ষে একে অপরের পথ বা ধর্মকে ভাষাগত প্রাচীরের ফলে বুঝতে না পারা (বেগাঙ্গি-ই জুবানহা ওয়া নাদানীস্তান ই বাসিচ-হা-ই ইয়েক দিগের) ইত্যাদি নেতিবাচক উপাদানগুলি, যা সামাজিক সংঘর্ষে অংশ নেয়, সেগুলিকে যে সারানো যায় না তার কারণ প্রধানত রাজাদের উদাসীনতা। (১৪) এই অংশটি থেকে নির্ভুলভাবে বেরিয়ে আসে য আবুল ফজলের মতে, হিন্দুস্তানে যে রাজা সুলহ্-ই-কুল প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহী, তাঁকে সর্বাগ্রে আবুল ফজল উল্লিখিত সামাজিক দ্বন্দ্বের কারণসমূহ অপসারণ করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। তা হল, জনগণকে বিভিন্ন ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করানো, এবং তার জন্য, যাঁরা সমাজের বাছাই করা অংশ, তাঁরা যাতে পরিচিত একটি ভাষায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলি পড়তে ও বুঝতে পারেন, তা সম্ভব করে তোলা। এই অনুচ্ছেদটি পড়তে পড়তে সমস্ত প্রধান ব্রাহ্মণ্য ধর্মগ্রন্থগুলিকে পারসিক ভাষায় অনুবাদ করাবার জন্য আকবরের প্রচেষ্টার কথা মনে পড়ে। মনে হয়, ধর্মীয় বিদ্বেষ কাটানোর এই মনোরম প্রতিবিধানের দিকে একটি পদক্ষেপ হিসেবেই ঐ অনুবাদ প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল।

এটা দেখার মত, যে সার্বভৌমিকতাকে ফারর-ই ইজাদী রূপে প্রতিপন্ন করার তত্ত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধভুক্ত করা গিয়েছিল কেবল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে, যখন আকবরের রাজপুত নীতির ফলে রাজার সেনাধ্যক্ষদের গঠন উল্লেখযোগ্যরকম পরিবর্তিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে রাজপুত দলপতিরা উচ্চ মনসবদারদের ২২.৫% স্থান দখল করেছিলেন, ও তাঁদের শক্তি ক্রমশ বাড়ছিল। (১৫) একথা স্পষ্ট যে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য সহযোগে এই তত্ত্বের উত্থান, (যার প্রতিফলন ঘটেছে আইন-ই-আকবরীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবুল ফজলের মন্তব্যসমূহে) কোনো না কোনোভাবে রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ সেনাপতিমণ্ডলীর গঠনের উপরিউল্লিখিত রূপান্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সম্ভবত এই তত্ত্ব এমন এক শাসকশ্রেণীর কৃষ্টিগত আত্মিক বৈশিষ্ট্যের

---

১৪ আইন-ই আকবরী, ৩য় খণ্ড, নাভাল কিশোর, পৃঃ ৩ ৪।

১৫ দ্রষ্টব্য : আথার আলি, মুঘল নোবিলিটি আণ্ডার আওরঙ্গজেব, ১৯৬৬, পৃঃ ৩১।

পরিবর্তনের জানান দিচ্ছিল, যে শ্রেণীর মধ্যে রাজপুত দলপতিদের গুরুত্ব মোট উদ্বৃত্তের অংশ লাভ এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ব্যবহার, উভয় দিক থেকেই স্থিরভাবে বাড়ছিল।

কিন্তু আমাদের এ কথাও মনে রাখা ভাল, যে **ফারর-ই ইজাদী** তত্ত্ব আবুল ফজলের নিজস্ব অবদান ছিল না। বাস্তবে, সার্বভৌমিকতার এই নতুন এবং স্পষ্টতই অ-ইসলামিক চেতনা আকবর সিংহাসনে আসীন হওয়ার আগে থেকেই মুঘল রাষ্ট্রনীতিতে উপস্থিত ছিল। হুমায়ূন নাকি জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়ার অনুষ্ঠানের জন্য বিশদ আচারাদি গ্রহণ করেছিলেন। রফিউদ্দিন ইব্রাহিম শিরাজীর বক্তব্য অনুযায়ী এই অনুষ্ঠান **জালওয়া-ই কুদ্স** ("দেবত্বের প্রকাশ") নামে পরিচিত ছিল। বোঝা যায়, রাজাকে ঐশ্বরিক মহিমায় অঙ্কিত করার প্রচেষ্টা ছিল। বস্তুত, নিষ্ঠাবান ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা এই প্রথা চালু করার জন্য তাঁকে দৈব প্রতিষ্ঠা অবলম্বনের প্রচেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত করেন।(১৬) সম্ভবত এই ধরনের কোনো সন্দেহবশঃতই শাহ তমাস্প তুরস্কের সুলতান সেলিমকে রচিত একটি পত্রে হুমায়ূনকে শরিয়ত খারিজ করার জন্য সমালোচনা করেন।(১৭) এ থেকে মনে করা উচিত যে **ফারর-ই ইজাদী** তত্ত্বের অন্তর্নিহিত শাসক শ্রেণীর নতুন কৃষ্টিগত আত্মিক বৈশিষ্ট্য হুমায়ূন সিংহাসনে আসার মধ্যেই মাথা তুলেছিল, এবং সম্ভবত তা ছিল পূর্ববর্তী দুই শতাব্দীকাল জুড়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হিন্দু নেতাদের দিল্লীর সুলতানতন্ত্রের প্রশাসনে প্রবেশ করার ফল।

যে সমস্ত রাজরা দৃশ্যমানভাবে অসহিষ্ণু ধর্মীয় নীতির অনুবর্তী ছিলেন, তাঁদের শাসনকালেও রাষ্ট্রের সাধারণ কার্যপদ্ধতি যে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মোটামুটিভাবে **সুলহ-ই কুল** নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, এই স্ববিরোধী ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা করতে হলেও শাসকশ্রেণীর পরিবর্তমান কৃষ্টিগত আত্মিক বৈশিষ্ট্যের এবং তৎসংলগ্ন রাজপুত দলপতিদের গুরুত্বের বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার উল্লেখ করতে হবে। এই দাবীর সমর্থনে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শাহজাহানের শাসনের গোড়ার দিকে গোহত্যা সম্পূর্ণ নিষেধ করা

---

১৬ রফিউদ্দিন ইব্রাহিম শিরাজী, **তাঝ্‌কিরাত উল-মুলাক্**, পাণ্ডুলিপি, বৃটিশ লাইব্রেরী, নং ২৩,৮৮৩, নবম পরিচ্ছেদ।

১৭ দ্রষ্টব্য, আজিজ আহমদ, **স্টাডিস্ ইন ইসলামিক কালচার ইন দি ইণ্ডিয়ান এনভায়রনমেণ্ট**, অক্সফোর্ড, ১৯৬৪, পৃঃ ২৫।

নির্দেশ বলবৎ থাকা(১৮) বা আওরঙ্গজেবের শাসনকালেও ১৬৭৯ পর্যন্ত জিজিয়া কর স্থগিত থাকা(১৯), অথবা আওরঙ্গজেবের শাসনের দ্বিতীয়ার্ধে, যখন তিনি অন্যক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত অসহিষ্ণু আচরণ গ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়ে মুঘল রাষ্ট্রের সামরিক চাকরীতে হঠাৎ করে অনেক বেশী অ মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া।(২০) আবুল ফজল কর্তৃক নিবন্ধভুক্ত সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের মূলনীতিগুলি যে মুঘল রাষ্ট্রনীতিতে স্থায়ীভাবে স্থান পেয়েছিল, তা আরো প্রমাণিত হয় **আখাম-ই আলমগীরীতে** সংরক্ষিত আওরঙ্গজেবের পত্রাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন উক্তি থেকে। মুঘল রাষ্ট্রের জীবনে শরিয়তের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়সংকল্প হওয়া সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব তাঁর এক সেনাধ্যক্ষকে লেখেন "ধর্মের সঙ্গে ঐহিক জীবনের কি সম্পর্ক আছে? আর ধর্মের বিষয়ে ধর্মান্ধতা কেন প্রবেশ করবে? আপনার জন্য আপনার ধর্ম আছে, আর আমার জন্য আমারটা (**লাকুম দিনকুম ওয়া লিদিন**)। যদি সমস্ত আইন মানা হত তবে সমস্ত রাজপুতদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা আবশ্যক হত।" আর একটি চিঠিতে তিনি ঘোষণা করেন, "কারো ধর্ম নিয়ে আমাদের কি চিন্তা থাকতে পারে? যীশুকে তাঁর ধর্ম অনুসরণ করতে দাও, আর মোসেস্‌কে তাঁর নিজের ধর্ম।"

আবুল ফজল কর্তৃক নিবন্ধভুক্ত রাষ্ট্রতত্ত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তিনি যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতার অস্তিত্বকে ন্যায়সঙ্গত বলে ব্যাখ্যা

---

১৮ দ্রষ্টব্য, সুরাট সিং, **তাঝকিরা-ই পীর হাস্সু তেলি**, পৃঃ ৩০বি-৩৭এ।

১৯ এস. আর. শর্মা, **দ্য রিলিজিয়স পলিসি অভ দ্য মুঘল এম্পারার্স**, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৫৩। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় সতীশ চন্দ্র, 'জিজিয়া অ্যাণ্ড দ্য স্টেট ইন ইণ্ডিয়া ডিউরিং সেভেনটিন্‌থ সেঞ্চুরী,' **জার্ণাল অভ দি ইকনমিক অ্যাণ্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি অভ দি ওরিয়েন্ট**, ১২, পৃঃ ৩২-৪০, যেখানে তিনি **খুলাসাত-উস সিয়াক** থেকে একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেন, যা থেকে মনে হয় যে আওরঙ্গজেব তাঁর শাসনের শুরুতেই জিজিয়ার পুনরায় প্রচলনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও, "কয়েকটি রাজনৈতিক প্রয়োজনের ফলে বিষয়টি মুলতুবি রাখেন"।

২০ আথার আলির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যেখানে ১৬৫৮-৭৮-এর মধ্যে মোট অভিজাতবর্গের মধ্যে অ-মুসলিম অভিজাতরা ছিল ২১·৬%, সেখানে আওরঙ্গজেবের শাসনের শেষ দশকে তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩১·৬%-এ। **দ্য মুঘল নোবিলিটি আণ্ডার আওরঙ্গজেব**, পৃঃ ৩১।

করার জন্য শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তির উল্লেখ করেন। আবুল ফজল আইন-ই আকবরীতে রেওয়া-ই রোসি ("জীবিকার উপায় রক্ষা") শীর্ষক অংশে লিখেছেন, "যেহেতু মানবচরিত্রে অগণিত বৈচিত্র্য আছে এবং প্রতিদিন আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিক্ষেপ বৃদ্ধি পায়, এবং মদমত্ত লালসা দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, এবং চিন্তাহীন ক্রোধ তার লাগাম ছিঁড়ে ফেলে, যেখানে এই অসম্মানজনক পিশাচ পীড়িত শূন্যতায় বন্ধুত্ব দুর্লভ, এবং ন্যায়বিচার দৃষ্টির অগোচর, সেই প্রকার অনিশ্চিতির জগতের জন্য প্রকৃতপক্ষে স্বৈরতন্ত্র ব্যতীত কোনো প্রতিষেধক নেই। আর প্রশাসনে এই দাওয়াই অর্জন করা যায় কেবল ন্যায়বান রাজাদের মহিমার মধ্যে। যদি একজন বিচক্ষণ শাসকের আশা ও ভীতির অনুমোদন ব্যতীত একটি গৃহ বা এলাকার প্রশাসন সম্ভব না হয়, তবে এই বিশ্বজোড়া ভীমরুলের চাকের গোলযোগকে সর্বশক্তিধর ক্ষমতার উপশাসকের কর্তৃত্ব ছাড়া কিভাবেই নিস্তব্ধ করা যাবে? কোনো কোনো নির্জনবাসী মনে করেছে যে তা দৈব প্রক্রিয়ায় সম্ভব। কিন্তু কি করে এরকম ক্ষেত্রে জনগণের সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম রক্ষা করা যাবে? সার্বভৌম রাজার সাহায্য ছাড়া একটি সুশৃংখল প্রশাসন চালু করা কখনোই সম্ভব হয় নি।" তিনি আরো বলেন যে "সার্বভৌমিকতার পাওনা (পারাঞ্জ-ই জাহানবাণী) এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জীবনধারণের উপাদানের আবর্তন নির্ভর করছে বিচক্ষণ শাসকের ন্যায়বিচার ও বিবেকবুদ্ধিপূর্ণ প্রজাদের ন্যায়পরায়ণতার উপর।"(২১)

এম. আথার আলি সঙ্গতভাবে মন্তব্য করেছেন যে আবুল ফজল যে কথা বলে রেওয়া-ই রোজির বর্ণনা করেন তা হবসের সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব মনে করিয়ে দেয়।(২২) কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে রাজা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্য পালন করার জন্য মূল্য পাওয়ার অধিকার অর্জন করা হয়ত প্রাচীন ভারতের তাত্ত্বিকদের কাছ থেকে ধার করা তত্ত্ব। নারদ যেখানে ব্যাখ্যা করেন যে কৃষিপণ্যে রাজার ভাগ হল জনগণকে রক্ষা

২১ আইন-ই আকবরী, নাভাল কিশোর, পৃঃ ২০১-২০৫। তুলনীয়, জ্যারেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১-৫৫, ৫৮-৫৯।

২২ আথার আলি, 'থিয়োরীস অভ সভারেনটি ইন ইসলামিক থট ইন ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ১৯৮২-র সম্মেলনের বিবরণীতে প্রকাশিত।

করার জন্য তাঁর 'বেতন', সেখানে যেমন এই চিন্তা খুব স্পষ্টভাবে উপস্থিত। ইউ. এন. ঘোষালের মতে এই চিন্তা বৌদ্ধ লেখকদের রচনায় আরো দৃঢ়ভাবে উপস্থিত। একথা প্রমাণিত হয় আর্যদেবের চতুহস্তকতে একটি অনুচ্ছেদে, যেখানে রাজার সঙ্গে এক কাল্পনিক আলোচনাকালে লেখক বলে ওঠেন : "তুমি কি করে গর্ববোধ কর—তুমি, যে নিছক ব্যাপক জনতার দাস ('গণদাস); যার খাদ্য জোটে এক-ষষ্ঠাংশ (প্রজাদের খাদ্য শস্যের) ভাগ মাত্র ?"(২৩)

ভূমিকর রাজার 'বেতন', এই প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বটিকে খুব উপর উপর দেখলেও এর সঙ্গে আবুল ফজলের "পারাঞ্জ-ই জাহানবাণী" তত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। একই ভাবে, বলা যায় যে আবুল ফজল সমাজকে যে চারটি পেশাদার গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছিলেন, (যোদ্ধা, কারিগর ও ব্যবসায়ী, শিক্ষিত, এবং কৃষক ও শ্রমজীবি,) এবং তাঁর নির্দেশ, যে "রাজার পক্ষে তাদের প্রত্যেককে যথাযথ স্থানে রাখা বাধ্যতামূলক",(২৪) এবং প্রাচীন ভারতীয় তাত্ত্বিকদের সৃষ্ট রাজকীয় কর্তব্য, অর্থাৎ বর্ণধর্ম বলবৎ রাখার কথা মনে করিয়ে দেয়।

এই পর্যন্ত এসে এমনকি সাহস করে বলা যায় যে আবুল ফজল যে তাঁর সার্বভৌমিকতা তত্ত্বে, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে অনেক উপাদান মিশ্রণ করছিলেন. তা একটি নিঃসঙ্গ বা আকস্মিক ঘটনা ছিল না। তা ছিল, মুসলিম শাসক গোষ্ঠীসমূহের প্রাধান্যে মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাজনীতির মধ্যে লোককথা এবং প্রাচীন ভারতের জ্ঞানী তাত্ত্বিকদের রচনায় প্রাপ্য রাষ্ট্রবিদ্যা ও সার্বভৌমিকতা সংক্রান্ত বহু অভিজ্ঞান ও তত্ত্বের পুনরুজ্জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। খুবই মুসলিম আধিপত্যাধীন একটি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রেও ঐ ধরনের প্রথা ও তত্ত্ব কিভাবে মাথা তুলত তার একটি উদাহরণ দেওয়া যায় ইসলাম শাহ শূরের রাজত্বকালে চালু করা হয়েছিল এমন একটি প্রথার উল্লেখ করে। বাদাউনীর রচনা অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রদেশে উচ্চপদস্থ অভিজাতদের প্রতি সপ্তাহে রাজার "জুতো ও তূণ"কে সম্মান প্রদর্শন করতে হত। তাঁদের ঐগুলি দেওয়া হত রাজশক্তির দৈহিক উপস্থিতির প্রতীক

২৩ তুলনীয়, ইউ. এন. ঘোষাল, দ্রঃ দ্য ক্লাসিকাল এজ, সম্পাদনা আর. সি. মজুমদার, পৃঃ ৩৪৫-৪৬।

২৪ ব্লকম্যান, আইন-ই আকবরী, অনু. পৃঃ ৪।

রূপে।(২৫) এই প্রথা যে চিন্তার প্রয়োগ, তা হল, যে রাজা শাসন করছেন, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের কোনো বস্তু রাজশক্তির সংযুক্ত সম্মান ও কর্তৃত্বের অংশীদার বলে মনে করা উচিত, এবং সেটিকে তাঁর দৈহিক উপস্থিতির প্রতীক হিসাবে দেখা যায়। এই চিন্তা সম্পূর্ণভাবে ইসলামিক তত্ত্ব বহির্ভূত। অন্যদিকে, এর সঙ্গে রামায়ণে উপস্থিত চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই রকম আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় সৈয়দ বংশ শাসিত বঙ্গরাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে বাবরের মন্তব্য থেকে। তিনি লিখেছেন, "বঙ্গদেশের একটি বিস্ময়কর প্রথা হল যে পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার বিরল। রাজকীয় পদটি স্থায়ী—এবং বাঙালীরা রাজপদটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে—বাঙালীরা বলে, 'আমরা সিংহাসনের প্রতি বিশ্বস্ত, যিনি সিংহাসনে আসীন, আমরা তাঁকেই অনুগতভাবে মেনে চলি।"(২৬) একটি বস্তুকে, একটি সিংহাসনকে রাজকীয় শক্তিতে বিভূষিত করার এই চিন্তাকে যে বাবর বিস্ময়কর মনে করবেন তা বোধগম্য। ভারতের বাইরে ইসলামিক ঐতিহ্যে তার কোনো ন্যায়সঙ্গত স্থান নেই। কিন্তু বাবরের এই বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে হিন্দু লোকবিশ্বাস থেকে ধার নেওয়া এই তত্ত্বটি ক্রমে ক্রমে মুসলিম বংশ শাসিত রাষ্ট্রগুলিতেও গৃহীত হচ্ছিল। বাঙালীরা রাজার প্রতি অনুগত হওয়ার পরিবর্তে সিংহাসনের প্রতি অনুগত হওয়ার বাবর উল্লিখিত ঘটনা *সিংহাসন বাত্তিসির* গল্পগুলির প্রারম্ভের ক্ষুদ্র কাহিনীটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়, যাতে বলা হয়েছিল যে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন যে ঢিপির নীচে ছিল, সেই ঢিপিতে যে বসত সে-ই তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও ন্যায়পরায়ণতা, এই দুটি রাজকীয় ক্ষমতা অর্জন করত।(২৭)

তবে একথা অনস্বীকার্য যে দিল্লীর সুলতানতন্ত্র ও মুঘল সাম্রাজ্য, উভয় রাষ্ট্রেই দেশের অধিকাংশ এলাকায় শরিয়ত সাবজনীন দেওয়ানী আইন রূপে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একদিকে রাষ্ট্রের পরিচালক নীতি হিসাবে শরিয়তের ব্যবহার এবং অন্যদিকে সামান্য সংস্করণ সহ দেওয়ানী

---

২৫ *মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫।

২৬ *বাবরনামা*, অনুবাদ, এ. এস. বিভারিজ, পুনর্মুদ্রণ, লণ্ডন ১৯৬৯, পৃঃ ৩৮২-৮৩।

২৭ দ্রষ্টব্য, ফ্র্যাঙ্কলিন ইগারটন, *বিক্রমস্ অ্যাডভেঞ্চারস*, ২ খণ্ড, হারভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ১৯২৬।

মামলায় ন্যায় বিচারের পদ্ধতিকে সুশৃংখল করার জন্য শরিয়তকে কিছু আইনের সমাবেশ হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ করতে হবে। মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রগুলিকে শরিয়ত বলবৎ করার প্রসঙ্গে বাস্তবে একটি দ্বিমুখী বিকাশ দেখা যায়। একদিকে, সাধারণ প্রবণতা ছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ব্যবহারের সঙ্গে হিন্দু দলপতিদের সক্রিয় সংযোগের অননুমোদনকারী ধারাগুলিকে অগ্রাহ্য করা বা পরিবর্তন করা। অন্যদিকে, একইসঙ্গে, হিন্দু নেতাদের এক বড় অংশ সহ শাসক শ্রেণীর সবকটি অংশই কার্যত শরিয়তকে একটি ব্যবহারযোগ্য দেওয়ানী আইনব্যবস্থা বলে মেনে নেয়।

সাধারণভাবে একথা স্বীকৃত হয় যে একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকে ধরে রাখার জন্য শরিয়ত একটি কার্যকর আইনী ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মুঘল সাম্রাজ্যের অ-মুসলিম উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলির কয়েকটিতেও শরিয়ত সাধারণ আইন সংহিতারূপে ব্যবহৃত হত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে পাঞ্জাবে রণজিৎ সিং প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটিতে কাজীর আদালত ছিল, এবং ঐ আদালত কেবল মুসলিমদের নয়, অ-মুসলিমদের মামলারও বিচার করত।(২৮) এ থেকে মনে করা যেতে পারে, যে হয়ত মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির আপাতঃভাবে "ধর্মীয় শাসন" সংক্রান্ত বৈচিত্র্যগুলিও ভারতীয় ঐতিহ্যের থেকে ততটা দূরবর্তী ছিল না, যতটা অনেক সময়ে মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে শাহ নওয়াজ খানের একটি উক্তির কথা মনে করা যেতে পারে, যে কাজীদের "পথপ্রদর্শন করে দেশপাণ্ডেদের নথি আর জমিদারদের মুখের কথা।"(২৯) এই উক্তি দেখায়, মুঘল শাসনে শরিয়তের ক্রিয়ামূলক প্রবণতা কি ছিল, যার ফলে তা অ-মুসলিম নেতাদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথের মতে "আইন প্রণয়ন করে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করা যে রাষ্ট্রের ক্ষমতার মধ্যে", এই "বিপ্লবী নীতি" ভারতে প্রবর্তন

২৮ দ্রষ্টব্য, ব্যারণ চার্লস হুগেল, **ট্রাভেল্‌স্ ইন কাশ্মীর অ্যাণ্ড দ্য পাঞ্জাব,** ১৯৭০, পৃঃ ৩১৭, সেখানে উল্লিখিত আছে যে রণজিৎ সিং জেনারাল আভিতাবিলকে লাহোরের কাজী ও প্রশাসক রূপে নিয়োগ করেছিলেন।

২৯ **মাসির-উল-উমারা,** ১ম খণ্ড, কলকাতা, পৃঃ ২৩৯।

করার কৃতিত্ব ইংরেজদের। তিনি সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ ছিল হিন্দুধর্মের একটি প্রবণতা, যে তার সমস্যাবলী সমাধান করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু তিনি যখন দৃঢ়ভাবে বলেন যে "সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গে আইন প্রণয়নের অধিকার সর্বপ্রথম বৃটিশ যুগে কায়েম করা হয়েছিল", তখন তিনি খুব শক্তি জমিতে দাঁড়িয়ে নেই। স্মিথের অনুমান, যে প্রাক্-বৃটিশ শাসকদের কোনো "আইন প্রণয়নকারী ক্ষমতা" ছিল না, সমপরিমাণে অ-গ্রহণযোগ্য।(৩০) বস্তুত, মধ্যযুগের ভারতীয় শাসকরা হিন্দু এবং মুসলিমদের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথার সংস্কারের জন্য জাওয়াবিত সৃষ্টি করার প্রমাণের প্রায় শেষ নেই। মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রগুলি যে সময়ে সময়ে মুসলিম এবং অ-মুসলিম, উভয়েরই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অংশগ্রহণ করত, তা মনে করার জন্যও যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কখনো কখনো মুসলিম শাসকরা বিভিন্ন হিন্দু জাতি (caste) বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ তাদের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী মেটানোর জন্যও সালিসি করতেন।

সতীদাহ প্রথা নিয়ন্ত্রণে মুসলিম রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বেশ দ্রুত এসেছিল। ইবন বতুতার কাছ থেকে জানা গেছে যে তুঘলকদের শাসনকালে কোনো সতীদাহের পরিকল্পনা থাকলে সংশ্লিষ্ট নারীর আত্মীয়রা আইনত স্থানীয় শিকদারকে খবর পাঠাতে বাধ্য ছিল, এবং শিকদার তার একজন প্রতিনিধিকে ঘটনাস্থলে পাঠাত, যাতে বলপ্রয়োগ করা না যায়।(৩১) আপাতঃভাবে মনে হয়, গোটা সুলতানী যুগেই এই ধরনের আইন বলবৎ ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এই আইন কতটা প্রয়োগ করা হত তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আকবর যখন বিবাহ পূর্ণ নিষ্পাদিত হয় নি এমন তরুণী বিধবাদের দাহ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন,(৩২) তখন তিনি অন্তত তুঘলক আমল থেকে বিদ্যমান একটি জাবিতার সম্প্রসারণ করছিলেন মাত্র।

---

৩০ ইণ্ডিয়া অ্যাস এ সেক্যুলার স্টেট, পৃঃ ২২৬-৩১, ৩০৪।

৩১ ইবন বতুতা—হাবিবুল্লা, ফাউণ্ডেশন অভ মুসলিম রুল ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৩২৬ এ উদ্ধৃত। এর সঙ্গে গিবের অনুবাদ তুলনীয়, কারণ সেখানে উল্লেখ করা নেই যে সতীদাহের সময়ে শিকদারের প্রতিনিধি থাকার কথা ছিল। ডেনিসন বস অ্যাণ্ড আইলিন পাওয়ার সম্পাদক, ট্রাভেলস ইন এশিয়া অ্যাণ্ড আফ্রিকা, লণ্ডন ১৯৬৯, পৃঃ ১৯১-৯২।

৩২ বাদাউনী, মুন্তাখাবত তাওয়ারিখ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৬।

এইরকম একটি আইন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এমনকি, আওরঙ্গজেবের শাসনকালেও বিধবাদের সতীদাহে বলপ্রয়োগের অভিযোগে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের ঘটনার কথা জানা যায়।(৩৩) হিন্দু ধর্মের উপর মুসলিম রাষ্ট্রের "হস্তক্ষেপের" এই দিকটি জিজিয়া কর চাপিয়ে দেওয়া বা পৌত্তলিকতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার মত পদক্ষেপের সঙ্গে মূলগতভাবে ভিন্ন ছিল। সতীদাহ বিরোধী আইনটির চরিত্র ছিল সংস্কারবাদী, এবং এর পিছনে হিন্দুদের অপমান করার বা ইসলাম ধর্মান্তকরণের কোনো বাসনা ছিল না। আরো মনে হয় যে অন্তত দোয়াব অঞ্চলে, যেখানে প্রশাসন বেশী দক্ষ ছিল, যেখানে রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল।(৩৪)

ভারতীয় ইসলাম প্রসঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রের সংস্কারবাদী আগ্রহ আরো বেশী ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণ প্রবণতা ছিল কোরাণ ও সুন্নাহের গোঁড়া ব্যাখ্যার অগোচর সমস্ত আচার ব্যবহার দমন করা। ভারতে সাধারণ মানুষের ইসলাম ধর্মের চিরদিনই একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল। তা হল, কবরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, উরস ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মেয়েদের অংশগ্রহণ, এবং অনেকগুলি পূজাপদ্ধতি, আচার ও সামাজিক প্রথার চল। গোঁড়া মুসলিমরা চিরকাল এগুলিকে অপছন্দ করতেন। উলেমা সবসময়েই রাষ্ট্রের মাধ্যমে এই ধরণের বিদাত অপসারণের চেষ্টা করতেন। ফিরোজ তুঘলক তাঁর স্মৃতি-চারণে যে পদক্ষেপগুলি বিবৃত করেন,(৩৫) এবং আওরঙ্গজেব সঙ্গীত ও আমোদপ্রমোদের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন,(৩৬) তা একই শ্রেণীভুক্ত। কখনো কখনো, শরিয়তের নীতি খণ্ডনকারী কিছু জাওয়াবিতও বলপ্রয়োগ করে চাপিয়ে দেওয়া হত। মুসলিম সামাজিক রীতিকে সংস্কার করার উদ্দেশ্যে আকবর প্রণীত কিছু জাওয়াবিত, যথা

---

৩৩ রামপুরে রক্ষিত ওয়াগা-ই সরকার রণথম্ভোর ওয়া আজমীর পুঁথিটিতে এ ধরণের বহু ঘটনা উল্লিখিত আছে।

৩৪ বৃটিশ শক্তি যতদিনে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার মধ্যেই গাঙ্গেয় উপত্যকায় সতীদাহের ঘটনা নগণ্য হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে, এর ব্যাপক প্রচলন ছিল বঙ্গদেশ ও রাজপুতানায়। ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথ, ইণ্ডিয়া অ্যাস এ সেক্যুলার স্টেট, পৃঃ ২১৭।

৩৫ ফুতুজাত-ই ফিরুজ শাহী, সম্পাদক, শেখ আবদুর রশিদ, ১৯৬৪, পৃঃ ৮-৯।

৩৬ খাফি খান, মুন্তাখাব উল-লুবাব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৩-১৪।

বাল্যবিবাহ, নিকটাত্মীয়দের বিবাহ ইত্যাদির প্রতি অননুমোদনপূর্বক বাধা প্রকাশ করা, (৩৭) বা কমবয়স্ক ছেলেদের সুন্নৎ করা, অনেক ক্ষেত্রে শরিয়তের ধারার বিরোধী ছিল। বস্তুত, আকবর প্রায় বহুবিবাহ নিষেধ করার কাছে এসেছিলেন। তিনি এর ব্যতিক্রম করতে রাজী ছিলেন কেবল স্ত্রী উত্তরাধিকারীর জন্ম দিতে ব্যর্থ হলে।(৩৮) গোহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা এবং সপ্তাহের নির্দিষ্ট কিছুদিনে কোনো ধরনের প্রাণীহত্যা নিষেধমূলক নিয়মাবলী ছিল একই রকম জাওয়াবিত যা আকবরের পরও বেশ কিছুকাল বলবৎ ছিল।(৩৯)

হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় মুসলিম রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের সর্বপ্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় তুঘলক আমল থেকে। ১৩৮৫ বিক্রম (১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ) সালের একটি লিপি, যা মধ্যপ্রদেশের বাতিহাগড়ে পাওয়া গেছে, তা মুহম্মদ বিন তুঘলকের নির্দেশে গো-মঠ নির্মাণের কথা জানায়। লিপিটির বক্তব্য অনুযায়ী নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেছিলেন খাজা জালালুদ্দিন, যিনি তাঁর কর্মচারী ধানৌকে প্রতিষ্ঠানটির একজন প্রশাসকরূপে নিয়োগ করেন।(৪০) সমসাময়িক একটি জৈন রচনা অনুযায়ী মুহম্মদ বিন তুঘলক শত্রুঞ্জয় মন্দির পরিদর্শন করেন এবং "জৈন সংঘের একজন নেতার উপযোগী আরাধনামূলক কাজ করেন"।(৪১) এই প্রমাণ দেখায় যে অবস্থাটা ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া

---

৩৭ আবুল ফজল, **আইন-ই আকবরী**, ১ম খণ্ড, ব্লকম্যান অনুদিত পৃঃ, ২৮৭-৮৮।

৩৮ **আইন-ই আকবরী**, ৩য় খণ্ড, নাভাল কিশোর, পৃঃ ১৯০, এবং জ্যারেট কর্তৃক অনুদিত, জে. এন. সরকার কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৪৮, পৃঃ ৪৪৯।

৩৯ **মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ**, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০১, ২০৩, ৩২১-১২। এর সঙ্গে দ্রষ্টব্য **তাঝকিরা-ই পীর হাসু তেলি** যেখানে অস্পষ্টভাবে বলা আছে যে গোহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা 'জাহাঙ্গীরের শাসনকালেও বলবৎ ছিল।

৪০ হীরালাল, **ডেস্ক্রিপ্টিভ লিস্টস অফ ইনস্ক্রিপশনস ইন সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস অ্যাণ্ড বেরার**, নাগপুর, ১৯১৬, পৃঃ ৫০, মাহদি হাসান, **তুঘলক ডাইনাস্টি**, ১৯৬৩, পৃঃ ৩৩৪-৩৫-এ উদ্ধৃত।

৪১ এম. বি. জাভেরী, **কম্প্যারেটিভ অ্যাণ্ড ক্রিটিক্যাল স্টাডি অভ মন্ত্রশাস্ত্র**, পৃঃ ২৮, মাহদি হাসান, **তুঘলক ডাইনাস্টি**, পৃঃ ৩২১-এ উদ্ধৃত।

কোম্পানীর প্রশাসনের গোড়ার দিকের মত। আপাতঃভাবে, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ "প্যাগোডার অপবিত্র ও সম্মানহানিকর ধর্মোপাসনা"(৪২) থেকে সরে রাখতে অসুবিধা বোধ করত। অর্থাৎ, রাষ্ট্র ও হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহের সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণকারী প্রাচীন রীতিগুলি মুসলিম রাজবংশগুলির যুগেও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

এই ধরণের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় মুঘল যুগের তথ্যপ্রমাণ থেকে। গোঁড়ামির সঙ্গে ১৫৭৯ সালে তাঁর বিচ্ছেদের পর, তাঁর প্রজাদের বিভিন্ন ধর্ম ও গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র বিচারক যে তিনি, আকবর নিজের এই ভাবমূর্তি প্রক্ষেপ করতে খুব সচেষ্ট ছিলেন।(৪৩) হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আকবর এমন কতক-গুলি কর্তব্য গ্রহণ করেছিলেন যা ভারতে মুসলিম রাষ্ট্রের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ছিল। কতকগুলি গোষ্ঠীতে বিদ্যমান প্রথা অনুযায়ী একটি জাতির মধ্যে ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীদের আপেক্ষিক অবস্থান সম্পর্কে তিনি রায় দিতেন। উদাহরণ-স্বরূপ, মধ্যপ্রদেশের ব্রাহ্মণরা সগর্বে বলেন যে আকবর তাদের সমস্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে "সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ" ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেছিলেন।(৪৪)

"হিন্দুস্তানের একেশ্বরবাদীদের, এবং বিশেষত কাশ্মীর প্রদেশে বসবাস-কারী তাঁর উপাসকদের হৃদয়কে একত্রে বন্ধন করার উদ্দেশ্যে" কাশ্মীরে একটি

---

৪২ এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য, রমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, 'দ্য স্টেট পেট্রনেজ টু হিন্দু অ্যাণ্ড মুসলিম রিলিজিয়নস, **বেঙ্গল : পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেসেণ্ট**, ৫৬শ খণ্ড, জানুয়ারী—জুন, ১৯৩৯, পৃঃ ২৬। এখানে কোম্পানীর মাদ্রাজস্থ সরকারের কাছে কিছু যাজক সহ প্রায় দু'শ বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারী কর্তৃক পেশ করা একটি মেমোর‍্যাণ্ডাম থেকে কিছু অংশ পুনর্মুদ্রিত আছে। এই মেমোর‍্যাণ্ডামটি **দ্য কোর্ট অফ ডিরেক্টরস ডেসপ্যাচ**, অক্টোবর ১৮৩৭-এ উল্লিখিত আছে।

৪৩ **মাজারের** আবুল ফজল কৃত সংক্ষিপ্তকরণে ইচ্ছাকৃত ভাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে আকবরকে কেবল গোঁড়া মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রবণতার মধ্যে সালিসি দেওয়া হয়নি, বিভিন্ন ধর্ম ও গোষ্ঠীর মধ্যে সালিসিরও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। দ্রষ্টব্য, **আকবরনামা** ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৯-৭০। **মাজার** এর মূল বয়ানের জন্য দ্রষ্টব্য, বাদাউনী, **মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ** ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭১।

৪৪ দেবরাজ চানানা, 'দ্য স্যান্সক্রিটিস্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান সোসাইটি', **এনকোয়্যারি**, নব পর্যায়, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৯৬৫, পৃঃ ৫৪।

মন্দির স্থাপনের জন্যও আকবরকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়।(৪৫) এই মন্দিরের জন্য আবুল ফজল যে পারসিক লিপি রচনা করেন তার আঙ্গিক এবং তার বিষয়বস্তু, উভয়েই অশোকের লিপিগুলির কথা পাঠকের স্মরণে আনে। ১৫৬৬ সালে, যখন আকবর গোঁড়া উলেমার প্রভাবাধীন ছিলেন, তখনকার একটি তথ্য ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনে মুঘল কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণের ছবি তুলে ধরে। ঐ বছর তিনি যখন পাঞ্জাব থেকে ফিরছিলেন তখন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী যোগী ও সন্ন্যাসীদের প্রধানরা তাঁর কাছে আসেন। তাঁদের মধ্যে বিতর্কের বিষরবস্তু কুরুক্ষেত্রের প্রধান মন্দিরের কাছে একটি স্থানে, যেখান থেকে ভিক্ষালব্ধ আয় বেশী হত, সেখানে কোন গোষ্ঠীর অধিকার থাকবে। আকবর মনে করেছিলেন যে সন্ন্যাসীদের দাবীর অধিকতর যৌক্তিকতা ছিল, কিন্তু তিনি কোনো রায় দেওয়া থেকে বিরত থাকেন কারণ উভয় গোষ্ঠীই আসলে চেয়েছিল যে তাদের মধ্যে একটি লড়াইয়ে তিনি যেন রেফারীর ভূমিকা পালন করেন। এটা নাকি এরকম বিবাদ মেটাবার পরীক্ষিত পদ্ধতি ছিল। যে লড়াই শুরু হয় তাতে সন্ন্যাসীরা সংখ্যায় কম থাকলেও ভিক্ষুকের বেশধারী রাজকীয় যোদ্ধাদের সাহায্যে তাঁরা যোগীদের বিতাড়িত করেন।(৪৬) মুঘল রাষ্ট্রের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আকবরের মৃত্যুর পরেও বহুদিন থেকে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর আকবরের চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে যান। একটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁর এক রাজপুত সেনাধ্যক্ষ সৃষ্ট একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তির সৌন্দর্যবোধ প্রসঙ্গে বিচারকের ভূমিকা পালন করেন ও মূর্তিটি সরিয়ে দেন।(৪৭)

এ ধরণের বৈশিষ্ট্য কেবল মুসলিম আধিপত্যাধীন রাষ্ট্রগুলিতে আবদ্ধ ছিল না। হিন্দু রাষ্ট্রগুলিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আরো প্রকটভাবে দেখা যেত। হিন্দু শাসকরা হিন্দু ধর্মের প্রতি যে ধরণের তদারকীর ভূমিকা পালন করতেন, ভারতীয় ইসলামের প্রতিও অনুরূপ ভূমিকা পালন করার প্রবণতা দেখান। এই

---

৪৫ মুহম্মদ আসকারি হুসেনী, নুরুল মনশুর ; ব্লকম্যান, কর্তৃক আইন-ই আকবরী, ১ম খণ্ড, অনুবাদ, পৃঃ LIV-LV তে উদ্ধৃত।

৪৬ আবুল ফজল, আকবরনামা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৭ ; বাদাউনী মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৩।

৪৭ সৈয়দ আহমদ খান সম্পাদিত তুজুক-ই জাহাঙ্গীরী, গাজীপুর ও আলিগড়, ১৮৬৩-৬৪, পৃঃ ১২৪।

প্রবণতার একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ হল শাহ রুখ মীর্জার প্রতি কালিকটের রাজার পত্র, যাতে তিনি কালিকটের মসজিদগুলির শুক্রবারের ধর্মোপদেশে তাঁর নাম উল্লিখিত হওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন।(৪৮) একই পর্যায়ে পড়বে মসজিদ ও অন্যান্য মুসলিম প্রতিষ্ঠান যেগুলি স্বরাজ এলাকার মধ্যে পড়ত সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মারাঠা রাষ্ট্রের অর্থদানের নীতি।(৪৯)

এই আলোচনা শেষ করতে গিয়ে আমি ব্যাখ্যা করতে চাই যে মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির "ধর্মনিরপেক্ষ" বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আমার মন্তব্যের অর্থ এই নয় যে উল্লেখযোগ্য পর্বজুড়ে ধর্মের অসহিষ্ণু ও আক্রমণাত্মক ব্যাখ্যা যে ব্যাপক প্রভাব রাখতে পেরেছিল তাকে কমিয়ে দেখানো হচ্ছে। কখনো কখনো একটি বিশেষ ধর্ম প্রচারের জন্যও রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু সেরকম যুগ ছিল অল্পসংখ্যক, অল্পকালব্যাপী, এবং মধ্যযুগের ভারতে তথাকথিত মুসলিম রাজনীতি থেকে তার বিপরীতমুখী প্রবণতাগুলি কখনোই পূর্ণ মাত্রায় অনুপস্থিত ছিল না।

একই সময়ে, এটাও দেখা যাচ্ছে যে মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্র অনেক সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সালিসের ভূমিকা পালন করার প্রবণতা দেখাত। রাষ্ট্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা সংস্কার করারও একটা ঝোঁক দেখায়। সময়ে সময়ে, মধ্যযুগের ভারতে রাষ্ট্র কেবল কর্তৃত্বপূর্ণ গোষ্ঠীদের নয়, বরং কম প্রভাবশালী গোষ্ঠীদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণে অংশগ্রহণ করত। মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরি-

---

৪৮ কামাল আল-দিন আবদুল রাজ্জাক (বৃটিশ লাইব্রেরী, অব ১২৯১, এফ, ২০৪ বি), আজিজ আহমেদ, **স্টাডিস্ ইন ইসলামিক কালচার ইন দ্য ইণ্ডিয়ান এনভায়রনমেণ্ট**, পৃঃ ২০।

৪৯ এ ধরনের অনেক অনুদান ছিল। বিশেষভাবে না খুঁজে এলোমেলো একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যায় ১৭৪৬-৪৭ সালের একটি সনদ থেকে। ঐ সনদে কসবা থানার মহাগিরি পাখাড়ি গ্রামে সদ্য নির্মিত একটি মসজিদের চিরাগবাত্তি ও অন্যান্য কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেড় বিঘা জমি দান করা হয়। দ্রষ্টব্য, **দ্য পেশওয়াস ডায়েরী**, ২য় খণ্ড, দলিল নং ১৭১, পৃঃ ১০১। (এই দলিলের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি ডঃ মহেন্দ্র পাল সিংয়ের কাছে ঋণী।)

প্রেক্ষিতেই কয়েকটি দিক থেকে একথা স্বীকার করা উচিত যে ঐ দিক থেকে আধুনিক ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা হল অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিকাশমান, সাংস্কৃতিকভাবে বহুধাবিভক্ত, শাসকশ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রবিদ্যা সংক্রান্ত চিন্তার সম্প্রসারণ।*

ভাষান্তর : কুণাল চট্টোপাধ্যায়

---

* মূল প্রবন্ধটি, ইংরেজিতে (Medirval Indian Notions of Statecraft in Retrospect) পাঠ করেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইকতিদার আলম খান, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে (কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪) তাঁর প্রধান অতিথির ভাষণ হিসাবে।

জাতীয়তাবাদ, ধনতন্ত্র, ঔপনিবেশিকতা : সম্পর্কের জটিলতা

বরুণ দে

সম্প্রতি একটি লেখায় ভারতে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন জাতীয়তাবাদের গুণাগুণ বোঝাতে গিয়ে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় এইভাবে 'পাশ্চাত্য ধরণের' জাতীয়তাবাদের মূলরূপ নির্দেশ করেছেন : "জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা সংঘটিত একটি শহুরে ব্যাপার। এই ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল সুগঠিত বাণিজ্যিক এবং ক্রম-সম্প্রসারণশীল শিল্প অর্থনীতির ফলে, এবং এর নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে মোটামুটি মিল ছিল। এর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রায় একরকম।"

তিনি আবার আমাদের দেশে উদ্ভূত আরেক ধরণের জাতীয়তাবাদের কথাও উল্লেখ করেছেন যেটি বুর্জোয়া (পাশ্চাত্য ধারণায়) শ্রেণী বা এক ধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা উৎপন্ন হয় নি। বিদেশী-জাতীয়তাবাদী তত্ত্বটির পক্ষে ভারতের মাটিতে শিকড় গেড়ে বসা সম্ভব হয়েছিল কতকগুলি কারণে। ডঃ রায়ের ভাষায় "প্রথমত ঊনিশ শতকের ভারত ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতির উপনিবেশের স্রোতে ভেসেছিল এবং দ্বিতীয়ত ভারতের ভৌগলিক ঐক্য ব্রিটিশরা এক কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার এবং এক প্রশাসনিক পদ্ধতির অধীনে এনেছিল ; এবং তৃতীয়ত এই বিবর্তনের সময়ে ভারতের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল নিম্নস্তরের যদিও তা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শূন্যতা পূরণে সমর্থ ছিল না।"(১)

এই বক্তব্যটিকে আরো মার্জিত এবং সম্প্রসারিত করলে দ্বিবিধ জাতীয়তা-বাদের যে-কোনটিরই উৎপত্তি, চেহারা এবং ফলাফল নিয়ে আরো বিস্তৃততর ধারণা লাভ করা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই জাতিত্ব (Nationhood) কিভাবে গড়ে ওঠে এবং উভয়ের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ বিরোধের চরিত্র কেমন সেই ধারণাও স্পষ্টতর হয়। প্রথমে, অধ্যাপক রায় যাকে 'পাশ্চাত্য ধরনের' বলেছেন, সেই

টাইপের মধ্যে বিরোধের জন্ম ও ফলাফলের বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট করা যেতে পারে। তারপর স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জাতীয়তাবাদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক (যা আবার উপনিবেশিকতার মধ্যেই গড়ে উঠেছে) বিষয়ে সার্বিক ধারণা করা সহজ হবে। এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদ একজাতি এক-রাষ্ট্রের আদি তত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রমে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় নিজেই ধন-তান্ত্রিক এবং ঔপনিবেশিক চরিত্র লাভ করেছে এবং অপরকে শোষণ করে পুষ্টিলাভ করেছে।

উপনিবেশ-বিরোধী কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে ইতিমধ্যে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, যা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বা ভারতীয় (জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পর্ক) প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।(২) এই প্রবন্ধের প্রাথমিক খসড়ায় আমি জাতীয়তাবাদের 'প্রথম' এবং 'দ্বিতীয়' ধারা হিসেবে জাতীয়তাবাদী অগ্রগতির ইতিহাস বর্ণনা করেছিলাম। প্রথমটি ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী এবং শেষপর্যন্ত ঔপনিবেশিকতাবাদী; দ্বিতীয় ধারাটি ঔপনিবেশিক শোষণে দুর্বল পুঁজির উপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু চরিত্রে উপনিবেশবিরোধী। কথা দুটি পৃথিবীতে পুঁজিবাদের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অসমানভাব বোঝাতে আদৌ ব্যবহৃত হয় নি, যা আমার সহকর্মী ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন (দ্রঃ তাঁর 'বেঙ্গল : রাইজ অ্যাণ্ড গ্রোথ অভ এ ন্যাশানালিটি', সোসাল সায়েন্টিস্ট, আগস্ট, ১৯৭৫, সংখ্যা ৩৭)। বর্তমান প্রবন্ধে পশ্চিম ইয়োরোপীয় জাতিত্ব, জাতীয়তাবাদ, জাতি এবং ঔপ-নিবেশিক সম্প্রসারণবাদের নানাস্তর বিষয়ে ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক ধারণা ও তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং সম্পর্কের জটিলতা আলোচনা করা হ'ল।(৩)

১. জাতীয়তার (Nationality) বর্ণনা

সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নিরূপণের আগে এর প্রাথমিক ভিত্তি জাতীয়তার সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। নতুবা জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র অশরীরী আত্মা বলে মনে হবে, যার আদর্শ আছে সামাজিক উপাদান নেই। মনে হবে মতবাদ আছে অথচ মৌল পদার্থ নেই।

একথা সত্যি যে এইসব মতবাদ অনেক সময় দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক তত্ত্বগুলির শক্তি বাড়িয়েছে। যেমন বিশ শতকের গোড়ার দিকে ফ্রান্সের

Action Francaise, যা ফরাসী জাতির মনে এক ধরণের ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করেছিল, ফলে কিছু ফরাসীকে জাতির প্রতি আনুগত্যহীন বলে তাড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। (৪) জাতীয়তাবাদের জঙ্গী এবং উগ্ররূপ ফ্যাসিবাদের ভিত্তি ছিল হিটলারের নগ্ন জাতিবিদ্বেষ। (৫) গোষ্ঠীগত সামাজিক চেতনার প্রতি আনুগত্যের উচ্চস্তরকে জাতীয়তাবাদ বলা একই ধরনের যুক্তির পুনরাবৃত্তি. কারণ এই ধরনের আদর্শ প্রায়শই মিথ্যা গরিমার (ও চেতনার) দ্বারা তৈরী হয়, যা জাতির ভেতরকার পশ্চাদমুখী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দ্বারা সৃষ্ট। ফলে এই শক্তি জাতিকে ব্যাপক মানবসমাজকে বিতাড়ন কিংবা গণহত্যার পথে নিয়ে যায়। যে কোনো ভারতীয় পাঠক-পাঠিকাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের 'ভারতীয়করণ' শ্লোগানের মধ্যে মুসলমানদের অ-ভারতীয় বলা লক্ষ্য করবেন। এই ধরনের জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত জাতিত্বকেই ধ্বংস করে।

জাতিভাব বাড়তে বাড়তে আদর্শ বা তত্ত্বে পরিণত হওয়ার আগে, বহু লোকের একই ধরনের ব্যবহার মিলে মিশে যায় এবং বহু লোকের সামাজিক ব্যবহারই মিলে গিয়ে জাতীয়তায় পরিণত হয়। এভাবেই ইংরেজ, স্কটিশ এবং ওয়েলস্ জাতিয়তা ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদে মিশেছে বা আমেরিকায় (যেখানে নানা ভিন্ন জাতির লোক বাস্তুত্যাগ করে একত্রিত) নতুন জাতিত্বের সৃষ্টি করেছে। অথবা পিটার দ্য গ্রেট কিংবা মেইজি রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যদি রাশিয়ায় জারতন্ত্র বা জাপানে নিপ্পনের নামে জাতি-রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে থাকে, সেখানে যে জাতীয় চেতনা এই সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে তা সম্ভব হত না যদি না সাধারণ মানুষরা তা গ্রহণ করত। কতকগুলি নির্দিষ্ট মূল্যবোধ বা শক্তির গণচেতনার দ্বারা গৃহীত হওয়াই জাতীয়তার সৃষ্টি করে। এর উদ্ভব এবং অস্তিত্ব পুঁজিবাদের যুগের আগেও ছিল, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের আগেও।

এথেন্স কিংবা পরবর্তীকালে রোমের সিটি-স্টেটগুলির উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যখন এগুলি প্রাক-সাম্রাজ্য বা সাম্রাজ্যের রূপ নিয়েছিল তখন কি সেগুলি জাতীয়তার নামান্তর? ম্যারাথনের সময়ে কিংবা পেরিক্লিসের যুগে আমরা এথেন্সে একাধিক ধরনের নাগরিকশ্রেণী লক্ষ্য করি, যারা ভিন্ন জাতির। এথেন্সের বাইরের অন্যান্য সকলের আদি বাসিন্দারা (উদাহরণস্বরূপ Metics-দের কথাই বলা যায়) বরাবরই ছিল

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। ভিন্ন জাতির সামাজিক বৈষম্য রাজনৈতিক সঙ্কটেরও যে সৃষ্টি করত, তা থুকিডিডিসের 'পেলোপনেশীয় যুদ্ধ' পড়লেই বোঝা যায়। বস্তুত এথেনীয় জাতীয়তা সিটি-স্টেটগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ডেলীয় যুক্তরাষ্ট্রের সকলেই সমান সুবিধা পেত না। সীমাবদ্ধ এথেনীয় জাতীয়তার মধ্যেই এথেন্সের পতনের বীজ লুকানো ছিল।(৬)

ইটালী রোমান প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে কখনোই সংযুক্ত হয় নি। রোমের সেনেটর, কনসাল এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ এক সুবিধাভোগী শাসক-শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল এই এলিট শ্রেণী ইটালীর অন্যান্য অঞ্চলের এলিট শ্রেণীর চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায় উচ্চতর ছিল; এদের রোমান আভিজাত্যের স্মৃতি অন্যান্য শহরের লোকেদের পৌরপ্রশাসনের স্মৃতির ঐতিহ্য থেকে ছিল আলাদা। স্যার রোনাল্ড সীম তাঁর বইতে এমন ভিন্ন পারিবারিক ঐতিহ্যের কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। আর ম্যাটিংলি লিখেছেন: "রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্য ও বিভেদের ভিন্ন আদর্শ সুন্দরভাবে সমতা বজায় রেখেছিল...এই ঐক্য অনেকদূর পর্যন্ত অটুট ছিল। সকলের উপরে মাত্র এক সম্রাট, এক সৈন্যবাহিনী, এক পৌরশাসন, এক ধর্ম। কিন্তু কখনো এক জাতিত্ব বা এক সংস্কৃতি বলা যাবে না"।(৭) রোমান জাতীয়তার মধ্যে স্মৃতি এবং ঐতিহ্য, নানা ধরণের লোকগাথা, এক ভাষা, মিলে মিশে আছে কিন্তু সকল জাতির সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগ ছিল একথা বলা যায় না বা জাতির রাষ্ট্রনৈতিক চেহারালাভ হয় নি।

সামন্ততন্ত্রের যুগেও একই রকম পরিস্থিতি। উদাহরণস্বরূপ চীন দেশের কথা বলা যায়। চৈনিক রাজতন্ত্রের যুগে—হ্যান যুগ থেকে মাঞ্চু রাজবংশ পর্যন্ত—নানা সম্প্রদায়ের যৌথ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কিছু কথা শোনা যেত ঠিকই কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকশ্রেণী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে (যেমন দক্ষিণ চৈনিক, মাঞ্চুরিয়ান, য়ূনানী প্রভৃতি) শাসন করত এবং এই বিভিন্ন গোষ্ঠী কখনোই মিলে যায় নি। তাছাড়া তাওবাদী-কনফুশীয় স্ববিরোধও গোষ্ঠী-চেতনায় ভিন্নতা এনেছিল। রাজতন্ত্রের যুগে ভৌগলিক ঐক্য স্থাপিত হলেও সারা চীনব্যাপী রাষ্ট্রীয় বা জাতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি।(৮) চৈনিক জাতিত্বের সূত্রপাত উনিশ শতকের তুং-চি পুনঃপ্রবর্তনের পর এবং উপনিবেশবাদ প্রবেশের পর জাতীয় বাজার সৃষ্টির সময়। এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায় সেই সময় যখন কুয়োমিংটাং দল জাতীয় বুর্জোয়া মুক্তি আন্দোলন সফল

করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছিল (১৯১১-৪৯)। বর্তমানে যে নিখিল চৈনিক জাতীয়তাবাদ দেখা যায় তা বস্তুতপক্ষে গণ প্রজাতন্ত্রের কৃতিত্ব।(৯)

কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষদের অতীতাশ্রয়ী স্মৃতি ও ঐতিহ্য এবং সুযোগ-সুবিধা যা সাম্প্রদায়িক উপাদান কিংবা ভৌগলিক সীমানা দ্বারা বদ্ধ, তাই জাতীয়তার সৃষ্টি করে। শুধু মাত্র রাষ্ট্রীয় শাসন, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, এমনকি ভাষাগত একতা (যাতে স্ট্যালিন জাতীয়তা এবং জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নিরূপণের সময় জোর দিয়েছিলেন) জাতীয়তা বা জাতি গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জাতিবোধ বা জাতিত্ব জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, বরং রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ এবং তা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মনোভাবের মধ্যে এর জন্ম হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, জাতীয়তাবাদেরও উৎপত্তি হয় যা স্বাধীনতা সংগ্রামের সৃষ্টি করে—কখনো মুক্তিযুদ্ধের পথে, কখনো সাংবিধানিক বিবর্তনের ধীর পথে। কিন্তু কোনো ধরণের জাতীয় আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীচেতনা (যা সাধারণ দল বা বর্ণচেতনার চেয়ে উচ্চস্তরের) দেখা যেতে পারে। আদিম সামাজিক বিভাগ এবং জাতীয়তাবাদ বা জাতিত্বের মাঝামাঝি এই চেতনাটিকে আমরা জাতীয়তা বলতে পারি।

২. একটি মার্কসবাদী বিতর্ক এবং একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইতিহাসের কোন পর্যায়ে জাতীয়তার থেকে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়? সম্প্রতি ভারতের কিছু মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। Social Scientist পত্রিকার (আগস্ট, ১৯৭৫) একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল 'ভারতের জাতীয় প্রশ্ন' (The National Question in India); সেখানে দুটি ভিন্ন মতামত পাশাপাশি স্থান পেয়েছে।

অধ্যাপক ইরফান হাবিব তার মূল্যবান এবং সঠিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দেখিয়েছেন যে মধ্যযুগের ভারতের পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী উৎপাদন বলা যাবে না।(১০) কিন্তু তারপর তিনি ঢুকেছেন অন্য বিতর্কে। স্ট্যালিনের মত অনুসারে তিনি বলেছেন যে সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং ধনতন্ত্রের উৎপত্তির মধ্যে যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া তাতেই জাতির জন্ম; বিশেষত বুর্জোয়াশ্রেণী জাতীয় বা দেশীয় বাজার সৃষ্টির যে চেষ্টা করে তা

খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বাজার থেকে বুর্জোয়াশ্রেণী জাতিত্বের স্বাদ পায়।(১১) এর পর হাবিব প্রশ্ন তুলেছেন 'ভারত কি তখন একটি জাতি?' এবং স্বয়ং উত্তর দিয়েছেন "মার্কসবাদীদের বিনা দ্বিধায় এই প্রশ্নের নঞর্থক উত্তর দেওয়া উচিত। ভারত একটি দেশ ঠিকই কিন্তু জাতি অবশ্যই ছিল না, কারণ এই দেশ সার্বিক ভাষা কিংবা সংস্কৃতি কোনোটারই প্রয়োজন মেটায় নি। আসলে এটি ছিল ভিন্ন ভাষাতে এবং আলাদা সংস্কৃতিতে অসংখ্য উঠতি জাতীয়তার একটি দেশ"।(১২) তাঁর মতে ভারতে শিল্পবিপ্লব তখনো সম্পূর্ণ হয় নি এবং যদিও কিছু মার্কসবাদী লেখক বলার চেষ্টা করেছেন যে ভারতে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগেই জাতি গঠন প্রচেষ্টা হয়েছে, তাঁর মতে এটি ঠিক নয়।(১৩) অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বাঙালি, মারাঠী, পাখতুন কিংবা কেরালার আঞ্চলিক জাতীয়তার উদ্ভব সম্ভাবনাকে এবং সেই সম্ভাবনা মুঘল সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্রতিহত হওয়ার ব্যাপারটি উপেক্ষা করে হাবিব বলেছেন : "মোট কথা, যেহেতু উঠতি বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের কোনো অস্তিত্বই আমরা পাই না, সুতরাং প্রাক্-বিটিশ যুগে জাতীয়তার উদ্ভবের কোনো ভিত্তিই নেই।"(১৪) ভাষাগত ঐক্য না থাকার ব্যাপারে তিনি খুব জোর দিয়েছেন(১৫) এবং প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের ভারতকে প্রাক্-শিল্পবিপ্লবের পশ্চিম ইয়োরোপের সঙ্গে তুলনা করে, তিনি মন্তব্য করেছেন যে পরবর্তী রাজনৈতিক ফলাফল পশ্চিম ইয়োরোপের মতোই, যার মধ্যে রয়েছে জাতীয়তার উদ্ভব।(১৬)

অন্যমত তুলে ধরেছেন ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। হাবিবের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন "পশ্চিম ইয়োরোপে ধনতন্ত্রের যুগেই জাতিরাষ্ট্রের উৎপত্তি। আদিতে এর উৎপত্তি সামন্ততন্ত্রের পর যখন উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা এবং দেশীয় বাজার দখল করতে চেয়েছিল"(১৭), তখন এই সব বুর্জোয়া জাতি-রাষ্ট্রগুলির ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির ও শিল্পবিপ্লবের দুটি ধারা বা পথ তিনি উল্লেখ করেছেন। একদিকে ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, সুইৎসারল্যাণ্ডে যেমন হয়েছিল—শিল্প উৎপাদনের ছোট ছোট ইউনিটগুলির ভিত্তিতে শিল্পায়ন এবং কৃষি উদ্বৃত্তের শক্তিশালী পন্থা হিসাবে খাজনা আদায়ের অবলুপ্তির মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং অসামরিক সমাজকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে, যেমন জার্মানী কিংবা জাপানে শিল্পবিপ্লবের পথে রাষ্ট্র স্বয়ং উৎপাদনের অগ্রগতিতে এগিয়ে এসেছিল। ফলে

সেখানে বুর্জোয়াশ্রেণী অসামরিক সমাজের উপর থেকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি।(১৮) ডঃ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, এই দ্বিতীয় পদ্ধতির ধনতান্ত্রিক অগ্রগতিতে বুর্জোয়া শ্রেণীকে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক যুগের সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের আদর্শগত কাঠামোর উপরে নির্ভরশীল থাকতে হয়েছিল।(১৯) এখানেই চট্টোপাধ্যায় হাবিবের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে বলছেন যে, ভাষাই জাতীয়তা গঠনের একমাত্র উপাদান নয়।

বস্তুতপক্ষে, ভাষা, সাহিত্যিক এবং নান্দনিক ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, পোষাক, উৎসব সব মিলেই কোনো জাতীয়তার সাংস্কৃতিক পরিচয়। কখনও কখনও ঐক্যবদ্ধ সামন্তরাজ্য কিংবা সংঘটিত ধর্মীয় ঐতিহ্য এই জাতীয়তাকে জোরদার করে। এই জোরের ফলে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক যুগের কাঠামোর পরিবর্তন সত্ত্বেও জাতীয়তা টিকে থাকে এবং পরে, জাতীয়তাবাদী আদর্শের নানা শাখায় মিলে যায়।(২০) এই ধরনের জনগণ (people) ও জাতীয়তার (nationality) সঙ্গে জাতির (nation) পার্থক্য ফ্রেডরিষ এঙ্গেলস্, The Commonwealth পত্রিকার তিনটি প্রবন্ধে (মার্চ-মে, ১৮৬৬) উল্লেখ করেছিলেন, সেকথা ডঃ চট্টোপাধ্যায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। "সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় এবং জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি" শীর্ষক আর একটি লেখাতেও এঙ্গেলস এ কথা বলেছেন যা, 'The Peasant War in Germany' গ্রন্থের ১৯৭৪ খ্রীঃ মস্কো সংস্করণে যুক্ত হয়েছে।(২১) তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে "দুর্ভাগ্যবশতঃ স্ট্যালিন এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি 'জাতির' ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন যেগুলি আসলে জাতীয়তাক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর ফলে, পূর্ব ইউরোপের জাতীয় প্রশ্নগুলির আলোচনার সময়ে তাকে অনেকরকম তাত্ত্বিক ধারণার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।"(২২)

ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা এইখানে যে, তিনি জাতিয়তাকে একপন্থার (যা কম প্রগতিশীল এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত) ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির টানাপোড়েনের ফল হিসেবে দেখিয়েছেন। কিন্তু অপরপন্থার ধনতান্ত্রিক অগ্রগতিতেও ইতিহাসের কালগত প্রভাব আমরা সেইসব দেশের জাতীয় চরিত্রে লক্ষ্য করি। জাতীয়তাকে জাতি সৃষ্টির আগের অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করে ডঃ চট্টোপাধ্যায়, জাতীয়তা থেকে জাতিত্বে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের গঠনমূলক চরিত্রকে উপেক্ষা করেছেন। আসলে, ধনতন্ত্রের আগে শুধু জাতীয়তার হতে পারে এমন নয় 'জাতিত্ব'ও সৃষ্টি হতে পারে।

৩. সামন্ততন্ত্র; জাতি-ভাব এবং নিরঙ্কুশ রাজত্বের যুগের স্ববিরোধ

মার্কসবাদীদের কাছে একথা স্পষ্ট যে ধনতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে এক যুগ-সন্ধিক্ষণে—একদিকে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের যুগে নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র যা জাতিত্বকে ধরে রেখেছিল এবং অন্যদিকে, উঠতি বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, অর্থনীতি এবং আইনব্যবস্থার বিপর্যয় এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া। কিন্তু ধনতন্ত্রের প্রসার ছাড়াও আর যেসব কারণে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবিকাশ সামন্ততন্ত্রের যুগে সম্ভব হয়েছিল, তার মধ্যে সামন্তরাজ্যের শেষদিককার বিশেষ জাতীয় আদর্শ অন্যতম। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে যখন বুর্জোয়া (শহুরে বাণিজ্যিক অর্থে) ধারা কেবল পশ্চিম ইউরোপের শক্তিশালী সামন্ত প্রথার আবেষ্টনীর মধ্যে বিরাজমান ছিল, ইংরেজ এবং ফরাসী জনগণের মধ্যে তখন প্রথম জাতিচেতনার সূত্রপাত হয়। তৃতীয় এডওয়ার্ডের সময় থেকেই বৃটিশ রাজধানী লণ্ডন শহরের বণিক শ্রেণীর হাতে (যারা ছিল বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যমণি) সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক সংকটের সুযোগে মধ্য-যুগের সিটি কর্পোরেশনগুলির প্রভাব বাড়ে। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও সামন্ততন্ত্রের অবসানের পর অভিজাত শ্রেণী ছাড়াও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় লক্ষ্য করা যায়।(২৩) ইংলণ্ডে গোলাপের যুদ্ধ অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি লাভের দ্বন্দ্ব বলা যায়। এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত সামন্ততন্ত্রের যুগে(২৪) এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর লুঠতরাজ এবং বাড়তি শোষণের মুনাফা ক্ষুদ্র অভিজাত গোষ্ঠীর এবং বাণিজ্যিক পুঁজির সৃষ্টি করেছিল। ফলে আত্মঘাতী গোষ্ঠীযুদ্ধের পুনঃপ্রকাশ দেখি। পঞ্চদশ শতাব্দীর সম্রাটদের সামন্ততন্ত্রের এই বিকৃত রূপকে (bastard forms)(২৫) নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী ছিল। ব্যক্তিগত সৈন্য মোতায়েন করা—যা ছিল বড়ো সামন্তপ্রভুদের রেওয়াজ—তা বিশেষ আইন মোতাবেক খর্ব করা হয় এবং তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে রাজদ্রোহমূলক সামন্ত বিদ্রোহগুলিকেও কঠোরভাবে দমন করা হয় (যেমন প্রথম এলিজাবেথের যুগের এসেক্স বিদ্রোহ)। শক্তি-সাম্যের ওঠানামার পৌর-শাসনাধীন শহুরে শ্রেণীর মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

এভাবে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বৃদ্ধি ঘটে এবং

গৃহযুদ্ধের ফলে তার পরাজয় হলেও পতন হয় নি। স্টুয়ার্ট, অরেঞ্জ এবং হ্যানোভার রাজবংশ ক্রমাগতই প্রথমে অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে এবং পরে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্ক পাতিয়েছিল। অন্তত ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ এবং পিটের ভারত আইন পর্যন্ত নিরঙ্কুশ শাসন সংসদীয় আধা-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাছে মাথা নত করে নি। বুর্জোয়া শ্রেণী কখনোই পুরোপুরি ক্ষমতাশালী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে নি। সামন্ততন্ত্রের সামাজিক ভগ্নাবশেষের সঙ্গে এই শ্রেণী ধীরে ধীরে আপোষ করছে। তবু টিউডর নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগেই ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রথম রেখাপাত করেছে। শেক্‌সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি (যেমন জুলিয়াস সীজার, রিচার্ড দ্য সেকেণ্ড, হেনরি দ্য ফিফ্‌টথ্‌ ইত্যাদি) বা স্পেনসারের 'ফেয়ারি কুইন' থেকেই তা বোঝা যায়। টিউওর-স্টুয়ার্ট যুগের একটি ধ্রুব সত্য এই যে বুর্জোয়া শ্রেণী ইংরেজ ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু এই সঙ্গে স্কট জাতির এবং শ্রেণী-সচেতন গলজাতীয় কৃষকশ্রেণীর স্বতন্ত্র সত্তার কথা প্রায়ই আমরা ভুলে যাই। শুধু ইংরেজ জাতীয়তা নয়, ইংরেজ জাতীয়তাবাদ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের প্রাথমিক বিকাশের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তার সহগামী। অনেকেই জাতীয়তা এবং জাতীয়তাবাদের অস্তিত্বের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসেবে পুঁজিবাদের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একই জিনিস, অ-মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে করেছেন অধ্যাপক রায়।

সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতাগুলির দুর্বলতার এবং বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রের বিকাশই শুধু হয় নি, বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী মানসিকতার ও সৃষ্টি হয় যার পরিব্যাপ্তি নিয়ে অনেক সাম্প্রতিক গবেষণা হচ্ছে।(২৬) এর ফলে যে শুধুমাত্র অভিজাতশ্রেণীর একাংশই প্রভাবিত হয়েছিল তাই নয়, কারিগর ও কৃষকসম্প্রদায় যাদের সঙ্গে পূর্বোক্ত শ্রেণীর ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল তারাও প্রভাবিত হয়েছে। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে এক ইংরেজ পাদ্রী সমাজের নীচের তলায় শিক্ষার এই প্রসারকে ভালো চোখে দেখেননি, কারণ পূর্বোক্ত চেতনার ফলে তারা "অ-ধার্মিকতার নীতিতে নিজেদের আদর্শবদ্ধ করেছিল"(২৭)—যে নীতি ঊনিশ শতকের গণতান্ত্রিক চরমপন্থা বা র‍্যাডিক্যাল নীতিতে পরিণত হয়েছিল। ক্রিস্টোফার হিল তাঁর 'ইনটেলেকচুয়াল অরিজিনস অফ দ্য ইংলিশ রেভল্যুশান' বইতে স্বীকার করেছেন যে তাঁর 'নীরস তত্ত্ব' এবং 'যান্ত্রিক নাস্তিকতার' মধ্যে আরো সূক্ষ্মভাবে পার্থক্যীকরণ করা উচিত ছিল।

সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার যে আদর্শের অভিঘাত পড়েছিল তা নানা শাখা-প্রশাখা থেকে এসে মিলে ছিল, যেমন অ্যালকেমি বা অপ-রসায়ন, জ্যোতিষ এবং যাদুবিদ্যা। এই তত্ত্ব ধীরে ধীরে যুক্তিবাদী হয়ে প্রাক্-বিজ্ঞানের নানা বিশ্বতত্ত্বে রূপায়িত হয়—যা করেছিলেন বেকন, কোমেনিয়াস, স্যামূয়েল হার্টলি এবং অন্যান্যরা। এই বিশ্বতত্ত্ব বা কসমোলজী আঠার-উনিশ শতকে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্গাতা। (২৮)

কিন্তু শুধু 'যান্ত্রিক তত্ত্বের'(২৯) প্রভাবেই ইংরেজ জাতির মধ্যে যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসার ঘটিয়েছিল এবং জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাবৃদ্ধি করেছিল। সর্বজনগ্রাহ্য ইংরিজি ভাষা যা আজ প্রচলিত, তা টিউডর যুগেই সূত্রপাত। শাসকশ্রেণী জাতি-রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থ যেভাবে তুলে ধরেছিল, জনসাধারণ তা বুঝতে সমর্থ হয়েছিল। আর এসবই হয়েছিল সে সময়, যখন বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের সবে সূত্রপাত হয়েছে আর শিল্প-পুঁজিবাদ ভবিষ্যতের গর্ভে।

জাতীয়তাবাদ হচ্ছে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস এবং ধনতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের উৎপত্তি এই দুই অবস্থার মধ্যে সংযোজক। যেখানে জাতীয়তা ধনতন্ত্রের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে সেখানে জাতির প্রথম কিংবা দ্বিতীয় পদ্ধতির ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির শক্তি লাভ করেছে। আর যেখানে ধনতন্ত্র বিকশিত হয় নি, সেখানে জনগণের যৌথ ইচ্ছাশক্তি কৃষি-প্রান্তর এবং খামারের স্বার্থ দেখেছে যেমন জারতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে কসাকদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। এতে 'নিরুপায় জাতীয়তা' বা stranded nationalities বলা যায়। একই রকম উদাহরণ' ইটালরী ঐক্যের আগেকার ইটালীর জাতীয়তা, কিংবা আরো কাছের উদাহরণ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ভারতের জাতীয় আন্দোলনে প্রবেশ করার আগে মারাঠা জাতীয়তা অথবা ভারতের অংশবিশেষ হওয়ার পূর্বেকার খাসি, নাগা, মিজো কিংবা সিকিমবাসীদের অবস্থা।

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগের শেষদিকে জাতির ভিতরকার নানা শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ বেধেছিল সম্পত্তির অধিকার এবং উচ্চ-নীচ সম্পর্ক নিয়ে। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের ইংল্যাণ্ডে শ্রেণীভুক্তিকরণ এবং আদর্শ বিভেদ বৈপ্লবিক আকার নিয়েছিল, যখন গৃহযুদ্ধের সময় থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী অনুগত অভিজাততন্ত্রের সাহায্যে রাজার উপর প্রাধান্য স্থাপন করতে শুরু করে। বুর্জোয়া নীতি-আদর্শ ছাড়াও নীচু শ্রেণীর চরমপন্থার কথা প্রথম শোনা যায়

লেভেলারস (Levellers বা Diggers), র‍্যানটাবস এবং আদি কোয়েকারদের লেখায়-পুস্তিকায়। ফ্রান্সে বিপ্লবী বা ধনতান্ত্রিকতার সূত্রপাত আরো একশো বছর পরে। সতের শতকে ফ্রান্সে যে অভিজাত এবং বনিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব চলছিল তার কোনো বৈপ্লবিক ভিত্তি নেই। আমরা যাকে জাতীয়তাবাদ বলছি, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে চেতনার বৃদ্ধি, তা কিন্তু এই শ্রেণী-বিরোধের মধ্যেই উৎপত্তি এবং সতের-আঠারো শতকে তার আংশিক সমাধান।

এটা ছিল সেই সময়, যখন পশ্চিম ইয়োরোপের বুর্জোয়া শ্রেণী নানা পৌর বা বেসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে (civil institutions) উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং জাতীয়তা চেতনা বৃদ্ধি পেতে তা বুর্জোয়া সংস্কৃতির সঙ্গে সমার্থক মনে করেছিল।(৩০) এই একাত্মবোধ পশ্চিম ইয়োরোপে শিল্প-পুঁজিবাদের সাফল্যের অন্যতম উপাদান।

শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের একাত্মতার বিষয়ে স্ট্যালিনের লেখার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আগে,(৩১) আমরা ১৮৫৪ খ্রী: 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' কাগজে কাল'মার্কসের প্রবন্ধগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে পারি— যেখানে স্পেনের জাতীয় ঐক্যের অভাবের দিকে মার্কস অঙ্গুলিনির্দেশ করছেন। তিনি বলছেন যে স্পেনীয়, কিংবা এশীয় সামাজিক গঠন পর্যায়ে, রাষ্ট্রই সামাজিক কাঠামোর দ্বারা আটকে ছিল—সমাজের উপরিকাঠামোতে জাতীয়চেতনা দৃশ্যমান ছিল না এবং এই চেতনা সামাজিক ঐক্যের দুর্বলতায় সীমাবদ্ধ ছিল।(৩২) পশ্চিম ইয়োরোপের পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় নি এমন সমাজগুলির এই দুর্বলতা মার্কস লক্ষ্য করেছিলেন নিরঙ্কুশ রাজত্বের যুগে বুর্জোয়া শ্রেণীর সহাবস্থান এবং প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে ইয়োরোপীয় জাতীয় ক্ষমতার মিলন প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে। ইয়োরোপের নিরঙ্কুশ রাজত্ব প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

"পরস্পরবিরোধী সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীগুলির (অভিজাততন্ত্র এবং শহর-গুলি) পতনের পর ষোড়শ শতাব্দীতে বৃহৎ রাজতন্ত্রগুলি গঠিত হয় এবং নানাস্থানে তাদের উত্থান হয়। ইয়োরোপের দেশগুলিতে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র জ্ঞান বিকশিত করার কেন্দ্রীয় শক্তি এবং সামাজিক ঐক্যের প্রবর্তক রূপে দেখা দেয়...এগুলি ছিল একটি ল্যাবরেটরী, যেখানে শহরগুলি মধ্য-

যুগের স্থানীয় স্বয়াত্তশাসন এবং সার্বভৌমত্বকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষায় এবং সভ্য সমাজের নিয়মে পরিণত করেছিল।"(৩৩)

যখন আলপস থেকে ব্রিটিশ চ্যানেল পর্যন্ত নিরঙ্কুশ রাজত্বের ঘটা, সেই সময় মধ্যযুগের স্পেনে প্রাক্-নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগের অভিজাততন্ত্র এবং নাগরিক গোষ্ঠীতন্ত্রের 'ঐতিহাসিক স্বাধীনতা' বৃদ্ধি পেয়েছিল। পূর্বোল্লিখিত মার্কসের রচনাটি মার্কসবাদীরা সাধারণত উপেক্ষা করেছেন, যেটিতে তার রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের গঠনশীল সম্পর্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞানমূলক ধারনার পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কস দেখিয়েছেন যে, সামন্ততান্ত্রিক স্পেন দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রমাণ করে যে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের রেশ স্পেনীয় অর্থনীতির মন্থর প্রবণতাকে 'অধিকতর নির্ধারণ'(৩৪) করতে পেরেছিল।

সামন্তপ্রথার পতন অনেক ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ রাজত্বের সংগঠনে সাহায্য করেছে। কিন্তু নানা জাতির পার্থক্য থেকে বোঝা যায় যে সব ধরনের নিরঙ্কুশ রাজত্ব সমান ফলপ্রসূ ছিল না। ব্রিটেনের সংসদীয় অগ্রগতি কিংবা অপেক্ষাকৃত ধীরে অগ্রসরমান বুরবোঁ কিংবা বিপ্লবী / নেপোলিয়নীয় ফ্রান্স সব জায়গায় ছাপ ফেলে নি। স্পেনে পতনের মন্থরতা লক্ষণীয় ও তেমনি ইটালী কিংবা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী হ্যাপস্‌বার্গ স্বৈরাচার যতই 'জ্ঞানদীপ্ত' হোক, সীমাবদ্ধ ছিল, ফলে তার পতন হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ সম্বন্ধে ও "জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের সীমাবদ্ধতা" নিয়ে আর. আর. পামার যে মন্তব্য করেছেন, তা যথোপযুক্ত :

"হাঙ্গেরীর সাম্প্রতিক মার্কসবাদী গবেষণায় 'আমাদের বুর্জোয়া জাতীয় বিপ্লবকে রোধ করার জন্য' হ্যাপস্‌বার্গ রাজতন্ত্রকে দোষারোপ করেছে। এই লেখকদের মতে 'জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার' সামন্ততন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যই হয়েছিল এবং এই মতান্ধ ঘোষণা জারি করেছিল যে 'নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রই হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সর্বোচ্চ ধাপ।' দ্রঃ Etudes des delegues Hongrois an Xe Congres International des Sciences. Historiques a Rome (Budapest, 1955), 18, 19, 73। এইসব লেখকদের মতে হ্যাপস্‌বার্গ রাজারা ঔপনিবেশিক শোষণকারী। এবং অভিজাতগোষ্ঠী নয়, আপামর জনগণের থেকেই জাতীয় স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়।...মারিয়া থেরেসা, যোসেফ এবং লিওপোল্ড 'সামন্ততান্ত্রিক সর্বোচ্চ শ্রেণী'র প্রতিনিধি—পুরোপুরি সামন্ততন্ত্র তারা না চাইলেও তা বাদ দিতে পারেন নি।"(৩৫)

ইতিহাসে দীর্ঘ যুগ অনেক দেখা যায়, যেমন, দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আমরা দেখি, যেখানে সামন্ত যুগের পতন তার নিজস্ব মন্থরতার শৈবালদামে জড়িয়ে গিয়ে আটকে গিয়েছিল।

একই রকম উদাহরণস্বরূপ, ভারতের মত বিশাল এবং বহু আঞ্চলিক এলাকায় বিভক্ত দেশে মুঘল নিরঙ্কুশ রাজত্বের সূত্রপাত আদি সামন্ততান্ত্রিক বা প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক আঞ্চলিক সৃজনের রাজনৈতিক ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে উঠলেও তা আবশ্যিকভাবে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে নি। মুঘল যুগের নিরঙ্কুশ চরিত্র সম্পর্কে এবং প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির সম্ভাবনার ঘাটতি সম্বন্ধে ইরফান হাবিবের মূল্যবান প্রত্যক্ষণ তথ্য এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে।(৩৬)

৪. প্রাক্-ধনতন্ত্র থেকে পরিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ :

উৎপাদন সম্পর্কের আদিরূপ থেকে আধুনিকতায় রূপান্তরের ঐতিহাসিক অগ্রগতি বিষয়ে কার্ল মার্কস বস্তুতঃ একাধিক পথনির্দেশ করেছেন। এই মত শুধুমাত্র এরিক হবস্‌বাম (যার সঙ্গে পরে আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন অধ্যাপক হাবিব)(৩৭) এর নয়, উপরন্তু ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ, প্রয়াত ডি. ডি. কোশাম্বী, এবং প্রয়াত অধ্যাপক সুশোভন সরকারের মত(৩৮) প্রবীন ভারতীয় মার্কসবাদীদেরও। পশ্চিম ইউরোপের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বহিরাবরণ ভাঙার ক্ষমতা সামাজিক শক্তিগুলির শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছিল,(৩৯) যার ফলে জাতীয়তা থেকে জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের প্রগতিশীল উপাদান সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের এই শক্তি স্পেন কিংবা ইটালী কিংবা রাজশাসনাধীন রাশিয়া কিংবা তুরস্ক কিংবা ভারতবর্ষের মতো দেশে দেখা যায় না। এসব যায়গায় মাত্রাতিরিক্ত নিশ্চলতা মধ্যযুগের রাষ্ট্রগঠনকে পরিবর্তনের স্রোতের বাইরে উত্তোলিত করেছিল, এই স্থবিরতার চড়ায় আটকে থাকা শক্তিই সামাজিক বিরোধের সৃষ্টি করেছিল।(৪০)

মার্কস যাকে হালকাভাবে 'এশিয়াটিক' তকমা এঁটেছেন অথবা যে তকমা তিনি ইসলামীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে ইসলামীয় অবদান বলে মনে করেছেন, তা দুর্ভাগ্যজনক।(৪১) এশিয়াটিক

গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে অবশ্য পরবর্তী মার্কসবাদী চিন্তা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য কেননা বিলম্বিত সামাজিক পরিবর্তনের বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে বিচার করার ব্যাপারে এর দান আছে যেখানে বিলম্বিত পরিবর্তনের কারণ নির্ধারিত ছিল এবং ঔপনিবেশিকতা আরোপিত হওয়ার ঐতিহাসিক কারণেই অর্থনৈতিক পশ্চাদমুখিনতা সৃষ্টি হয়েছিল।

এইসব ক্ষেত্রে, ইয়োরোপের বাইরে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক পন্থা ততোটা শ্রেণী-বৈষম্যের ও স্ববিরোধের পরিবর্ধন|পরিবর্তন ছিল না, যতোটা ছিল আত্মকলহের ফলে নিশ্চলতা। এই নিশ্চলতা অনেকসময়ই ছিল জাতি, বর্ণ বা পেশাগত গোষ্ঠীর সামাজিক ভাগাভাগির দেশজ ঐতিহ্যের ফলে উৎপন্ন। একথা অবশ্যই সত্যি যে ভারতের নীচু জাতের লোকেরা এবং শিকার-নির্ভর-শীল বণ্যস্বভাব থেকে কৃষিকার্যে উঠে আসা উপজাতির মানুষরাই বরাবর কৃষির ক্ষেত্রে কায়িক শ্রম করে এসেছে। (৪২) এদেরই কৃষিভিত্তিক শ্রেণী-কাঠামোতে গ্রাম্য-সর্বহারা করে রাখা হয়েছে (যেমন চামার, কুর্মি, বাগদী, বাউরী, নাদার, মাহার, পাড়িয়া ইত্যাদি। কিন্তু একথাও সত্যি যে এই অবস্থা ছিল আসলে আচার-সর্বস্বতা, জাতিত্ব, বৃত্তিগত কঠোরতা, গ্রামে বস-বাসের ব্যাপারে ভেদাভেদ, কর্মের সংস্থান, কারিগর শ্রেণীর নীচু মর্যাদা (ব্যবসায়ীদের তুলনায়) কিংবা ব্যবসায়ীদের নীচু মর্যাদা (যাজক এবং ক্ষত্রিয়ের তুলনায়)—ইত্যাদি সমস্ত মিলে গঠিত অধিকাঠামোর (super structure) বিস্তৃত আদর্শের ভিত্তিমাত্র। এইসব মিলে জাতি-ভেদ প্রথার এক মিথ্যা চেতনার জন্ম হয়েছিল, অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস যাকে 'সংস্কৃতায়ণ' (Sanskritization) আখ্যা দিয়েছেন। (৪৩) ভারতীয় নিম্ন জাতির ক্ষেত্রে এই ভ্রান্ত চেতনা এক বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল যে সংস্কৃতায়ণের কৃত্রিম মেলবন্ধন ছাড়া সামাজিক স্তরবিন্যাসে উপরের দিকে ওঠা অসম্ভব। তারা কখনোই একথা বলেন নি যে এই চেতনা কৃত্রিম ও সীমাবদ্ধ সমন্বয় মাত্র।

এভাবে জাতিভেদ প্রথার মধ্যে উপরে ওঠার ভ্রান্ত চেতনাই ভারতীয় সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনার পরিণতিকে রুখে দিয়েছে। ফলে বিরোধ হিন্দু অথবা মুসলমান সমাজে ধর্মীয় এবং আদর্শগত গোষ্ঠী লড়াইয়ের আকার নিয়েছে—এই বিরোধ নানা বিষয়ে যেমন বহু ঈশ্বরবাদ বা লোকাচার যা উঁচুনীচু ভেদাভেদ সমন্বিত সমাজে ভূস্বামী পুরোহিত শ্রেণী তৈরী

করেছিল (পাঞ্জাব এবং গুজরাটের বল্লভাচারী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি যেমন) অথবা একেশ্বরবাদ এবং/কিংবা ভক্তি আন্দোলন, যা কোনো বিশেষ সময়ে সমাজের নীচের তলার মানুষেরা করেছে (যেমন পাঞ্জাবে শিখধর্ম, অথবা ব্রাহ্ম সমাজ, অথবা গুজরাটের রাধাসোয়ামী সৎসঙ্গ)।(৪৪) সম্ভবত এই কারণে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় আলিগড়ে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশনে মন্তব্য করেছেন যে, ঐতিহ্যগত ভারতীয় সমাজের যেখানেই সামাজিক প্রতিবাদী আন্দোলন হয়েছে সর্বদাই সেগুলি যে সমাজকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।(৪৫)

পশ্চিম ইয়োরেপের সমাজগুলি ছাড়া অন্যত্র, প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের সম্পর্কের নানা স্থানীয় সাংগঠনিক রূপ পশ্চিম ইয়োরোপের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের থেকে এই সমাজগুলিকে পৃথক করেছে। যে পার্থক্য খুব ধীরভাবে সতেরো এবং আঠারো শতকে দূর হয়েছিল।(৪৬) বিশেষ ধরনের তথাকথিত 'পাশ্চাত্য' ধরণের শ্রেণীসংগ্রামের থেকে কোনো সহজাত ঐক্য নেই অথবা তথাকথিত সামাজিক 'অপরিবর্তনীয়তা'র থেকেও— কেবল শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতির ব্যাপারে ধীর গতির ব্যাপ্তি লক্ষ করা যায়।

পূর্বোক্ত রূপগুলি বা ধারাগুলি কেবলমাত্র আল্‌গা ধরণের রাষ্ট্র-গঠন পদ্ধতির দ্বারা একত্রে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।(৪৭) সামন্ততন্ত্রের যুগে ব্যাপক ছিল এমন স্থানীয় সংগঠনগুলির উপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ বা ঐ ধরণের সামাজিক কর্তৃত্ব অথবা একতা সম্ভব হয় নি পূর্বোক্ত আলগা ভাবের ফলে। বিশেষ উৎপাদন প্রণালীর বিশেষ উপমহাদেশীয় অঞ্চলে আবির্ভাব না হওয়া অথবা নানা আঞ্চলিক উৎপাদনের ছড়ানো রূপের মধ্যে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা অর্থই (রাজনৈতিক-সমাজতাত্ত্বিক বিচারে) কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যিক নির্দেশের দ্বারা তার নানা জাতীয়তাকে নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে দেওয়া। এর মধ্যে শহর-গ্রামের মধ্যে বিচ্ছিন্ন আত্মীয়তাও বিদ্যমান ছিল এবং গ্রাম ও বাজারের উপর অযথা নিয়ন্ত্রণ। এই ধরণের মধ্যযুগের শেষপর্বের রাজনির্দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুঘল ব্যবস্থা এবং তার আঠারো-ঊনিশ শতকের উত্তরসূরী, Safavid Parsia এবং তার আঠারো-ঊনিশ শতকের উত্তরাধিকারী, কিংবা অটোমান তুরস্ক কিংবা মাঞ্চু সাম্রাজ্য এবং এই নির্দেশগুলির জন্য কিছুটা বিধিবহির্ভূত এবং ব্যক্তিনিয়ন্ত্রিত

নমনীয়তা প্রয়োজন ছিল। শাসনতান্ত্রিক সমস্যার মাত্রা এত বড়ো যে আমলাতান্ত্রিক প্রথা তার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল—ম্যাকস্ ওয়েবার যাকে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিবর্তনের আদর্শ বলেছেন। কিন্তু তার নিজের উনিশ শতকের জার্মানীতে বাস্তবে তিনি যা আশা করেছিলেন তার বহু দূরের ব্যাপার ঘটেছিল।

এইগুলিই হল ব্যাপকতর কারণ অথবা ঐতিহাসিক পার্থক্য যা আমরা পশ্চিম ইয়োরোপের সামন্ততন্ত্র থেকে গোড়ার আধুনিক নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সাম্রাজ্যের স্বেচ্ছাচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গ্রাম-ভিত্তিক আলাদা ধরণের সামাজিক ঐক্যের মধ্যে লক্ষ্য করি। দলত্যাগী মার্কসবাদী এবং দার্শনিক সমাজতান্ত্রিকের ভেকধারী কার্ল উইটফোগেল যখন বলেন যে মার্কস 'এশিয় স্বৈরাচার' শীর্ষক একটি বিশেষ ঐতিহাসিক শ্রেণী বোঝাতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি দ্বিতীয় ধরণের সমাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচয় দেন। অপরপক্ষে, (৪৯) মার্কস তার চিঠিপত্রে এবং সাংবাদিক ধর্মী রচনায়, 'স্বৈরাচার' শব্দটিকে নিরঙ্কুশ রাজত্বের অন্য ঐতিহাসিক রূপ বোঝাতেই ব্যবহার করেছেন এবং প্রাক্-ধনতান্ত্রিক যুগের ঐসব অঞ্চলের অধিকতর খামখেয়ালীপনা দেখিয়েছেন। তাঁর প্রায় লেখাতেই, এমনকি অকিঞ্চিৎকর রচনাতেও মার্কস সর্বদা ইয়োরোপের বাইরে ধনতন্ত্রের উৎপত্তি যে হয় নি সেকথা বলেছেন এবং বলেছেন যে নিরঙ্কুশ রাজত্বের যুগে এর উৎপত্তি, পশ্চিম ইয়োরোপে।

৫. পশ্চিম ইয়োরোপীয় জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ঃ

ধনতন্ত্রের মতো, পশ্চিম ইয়োরোপের জাতীয়তাবাদ বিশ্ব ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তুলনারহিত ব্যাপার নয়। সামন্ততন্ত্র থেকে আধুনিক নিরঙ্কুশ রাজত্বের গোড়ার দিকে উত্তরণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের এটা ফসলমাত্র। এই বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম ছিল—সমুদ্রপার হয়ে অন্যত্র রাজ্য বিস্তারে এবং বিদেশী দেশ ও জনগণকে পদানত করায় গর্ববোধ। এই হিংস্র মনোবৃত্তি অবশ্য পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলিতে উৎপন্ন ভিন্ন পর্যায়ের জাতীয়তাবাদের মধ্যে ছিল না। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্কের চরিত্রের পার্থক্য বুঝতে হলে আমরা কতকগুলি দৃষ্টান্তের দিকে তাকাতে পারি।

পর্তুগাল, যে দেশ মাত্র সম্প্রতি সমাজতান্ত্রিক উপনিবেশিকতার দীর্ঘদিনের অপ্রীতিকর পরিণাম থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেছে, সেটি পশ্চিম ইয়োরোপের অন্যতম প্রাচীন জাতি-রাষ্ট্র। যে সব দেশ সবচেয়ে আগে নিজেদের ধীবর সমাজ, বণিকগোষ্ঠী এবং অভিজাততন্ত্রের প্রয়োজনে সমুদ্রপারের নতুন ব্যবসা-সম্ভাবনায় বিকল্প ভূখণ্ড খুঁজেছিল এরা তাদের অন্যতম। পরিকল্পিতভাবে এর রাজবংশ সাম্রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেছিল। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের চিত্র সবচাইতে চমৎকার বর্ণিত হয়েছে Camoens এর Lusiads বইতে,(৫০) যার সম্বন্ধে অধ্যাপক বকসার লিখেছেন: "It was during the sixty years 'Spanish Captivity' that the Lusiadas of Luisde Camoes attained the status of a national epic."

ব্রাগাঙ্কা শাসকবর্গ যারা সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগালকে স্পেনীয় অধীনতা থেকে মুক্ত করেছিল, তাদের সময়ে জাতীয়তাবাদ এত উগ্র আকার ধারণ করে যে Dr. Antonio Sonsa de Macedo, যিনি গোড়ার যুগের ব্রাগাঙ্কা জাতীয়তাবাদের জনক, লিখেছিলেন (১৬৩১ খ্রীঃ স্প্যানিশ রাজত্বকালে) যে Camecusকে দ্বিতীয় হোমার বা ভার্জিল না বলে, হোমার বা ভার্জিলকেই প্রথম Camecus বলা উচিত। প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্ত কাজই পর্তুগীজরা করেছিল, এমনকি অ-খৃষ্টান নাস্তিকদের হত্যা করা পর্যন্ত।(৫১) গোয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা ব্রাজিলে পর্তুগীজ জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ এই সেদিন অবধি পড়ন্ত সামন্তবাদের নগ্ন চেহারা দেখিয়েছে —দুর্বলের বিরুদ্ধে অত্যাচার করে। ঔপনিবেশিক শোষণ অনেকটা দুর্বল ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি। এই দুর্বলতা হয়েছিল বাণিজ্যিক মুনাফাকে সঠিক পরিমাণে কৃষি এবং মেষপালন নির্ভরশীল অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করার জন্য।(৫২) গোয়া, ইণ্ডিজ, মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা এবং ব্রাজিল লুণ্ঠন করেই পর্তুগালের জাতীয় অস্তিত্ব টিকে ছিল, স্বদেশে আধা-সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাদমুখিনতা সত্ত্বেও। পর্তুগীজদের আবার অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নেপোলিয়নীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে পর্তুগালের প্রতিরোধ ওয়েলিংটনের বাহিনীর ফলে সম্ভব হয়েছিল।(৫৩) এখানে জাতীয়তাবাদ, বাণিজ্যিক বিদেশী ঔপনিবেশবাদের সঙ্গে মিশে গেলে আদি বুর্জোয়াশ্রেণীর

ধনতন্ত্রের থেকে বিশেষ সাহায্য পায় নি। তাই এর চরিত্র আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং উগ্র।

ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে ধনতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের যে তাত্ত্বিক যোগসূত্র সম্প্রতি স্থাপন করা হচ্ছে তার কারণ ব্রিটেন এবং হল্যাণ্ডকে বিশেষ আদর্শ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বের মধ্যে নেদারল্যাণ্ডস ও ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক বাজার এবং কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অংশে পরিণত হয়েছিল।(৫৪) কিন্তু ব্রিটেনের দৃষ্টান্ত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার সঠিক সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে না, বিশেষত যদি পর্তুগালের মতো দেশ এবং ব্রিটেনের মতো বাড়ন্ত জাতীয় ধনতন্ত্রের কথা ধরা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটেনে ধনতান্ত্রিক ভূস্বামী শ্রেণী এবং বাণিজ্যিক বুর্জোয়াশ্রেণী কমনস্ সভা থেকে ক্রমাগত ক্ষমতা বাড়িয়েছিল—ওয়ালপোল, টাউনসেণ্ড, পিট, বেকফোর্ড প্রভৃতিরা ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোষ করেছিল, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং সাম্রাজ্যের মুনাফা ভাগাভাগির ব্যাপারে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি ছিল একদিকে লর্ড'স্-সভা এবং পুরানো সম্ভ্রান্তশ্রেণী, যেমন কার্টারেট, পেলহ্যাম, রকিংহ্যামরা, এবং অন্যদিকে, স্কটিশ সম্ভ্রান্তশ্রেণী এবং বণিকগণ। এই ক্ষয় দেশীয় অভিজাতশ্রেণীর জমির আত্মসাৎ প্রবণতাকে সহযোগিতা করেছিল।(৫৫)

ব্রিটিশ জাতীয় আপোষের মধ্যে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্তি অন্তর্গত, যেমন রাজা এবং লর্ড'সসভার উপর অধিকতর বুর্জোয়া কমনস্ সভার নিশ্চিত প্রাধান্যের সূচনা, মন্ত্রিসভামূলক সরকারের সূত্রপাতও উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, ম্যাঞ্চেস্টার এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর শিল্পবিপ্লবের পর থেকে ব্যক্তিগত স্বাধীন ব্যবসায়ের নামে বহির্বাণিজ্যের একচেটিয়া কোম্পানীগুলির (যেমন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোং) সনদ-অধিকার খর্ব করাও উল্লেখযোগ্য।(৫৬) প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল জমিদার এবং ভূস্বামীদের হাতে, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল কিন্তু ব্যবসা ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার লাভের বিধি ভূস্বামীদের অন্যান্য কনিষ্ঠ পুত্রদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পরিণত করত। যেহেতু জমির মালিক হওয়া বিশেষ সামাজিক লক্ষণ বলে গণ্য হত, তাই মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারা ধনী, তারা ভূস্বামী সম্ভ্রান্তশ্রেণীতে রূপান্তরিত হতেন।

এই উন্নয়ন হয় জমি কিনে অথবা বৈবাহিক সূত্রে(৫৭) সম্ভব হত অথবা যে-সব দামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে, যেখানে নতুন জাতীয় শাসকশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা পড়ত। এই রূপান্তর একটা সামন্ততান্ত্রিক রেশ ধরে রেখেছিল—সামাজিক খরচ, শাসকশ্রেণীর বৃত্তি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্ভব হত ব্যবসা-লগ্নী অথবা বাণিজ্যিক কৃষি ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে উদ্বৃত্তের বর্দ্ধিত পরিমাণ থেকে। শক্তির এই নিরপেক্ষতা আপোষের সামাজিক চরিত্র প্রতিফলিত করে, যার ফলে ধনতন্ত্র ক্রমশ ঔপনিবেশিকতার উপর নির্ভরশীল হয় এবং পুঁজিবাদ ব্রিটিশ জাতীয়তার উপর সামাজিক প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে।(৫৯)

অন্যদিকে জার-শাসনাধীন রাশিয়াতে সাইবেরিয়ার এবং মধ্য এশিয়ার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ রাশিয়াতে বিলম্বিত পুঁজিবাদের সূত্রপাতের আগেই শুরু হয়, ১৯১৭তে রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত আগে। ইউক্রেনিয় এবং কসাক কৃষিবিদ্রোহ দমন, উরাল অঞ্চলের কৃষকদের ধ্বংসকারী শোষণ, মধ্য এশিয়ায় ঊনিশ শতকে গরচাকভের সময়ে সম্প্রসারণবাদ—সমস্তই মানুষ এবং জমির অনুপাতকে রাশিয়াতে সুবিধেজনক ভাগ করার প্রচেষ্টা। এই ধরণের প্রচেষ্টা এবং তার ফল আমরা ঊনিশ শতকের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডাতেও দেখি। কিন্তু আমেরিকায় পশ্চিমী ইয়োরোপীয় বসবাসকারীদের সীমান্তে সম্প্রসারণ ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হয়েছিল, জার শাসনাধীন রাশিয়াতে সীমানা বৃদ্ধির সঙ্গে উঠতি পুঁজিবাদের কোনো গঠনমূলক সম্পর্ক ছিল না। এখানে দুর্বল পুঁজিবাদ একদিকে ফ্রান্স এবং অন্যান্য পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির সামাজিক উদ্বৃত্তের বিনিয়োগ অথচ নীচের তলায় কোন বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব না থাকার ফলে যেমন ঘটেছিল, তেমনি অভিজাতশ্রেণীর জমি পরিচালনায় ব্যর্থতা এবং দারিদ্রকরণের ফলেও হয়েছিল। ফলে দ্বিতীয় ধরণের ধনতান্ত্রিক অগ্রগতি অর্থাৎ কৃষি এবং কিছু পরিমাণে শিল্প অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ গঠনে রাষ্ট্র এগিয়ে এসেছিল।(৬০) জারের রাশিয়ার জাতীয়তাবাদ যা আমরা পুশকিন, হারজেন বা ডস্টয়েভস্কির লেখায় পাই অথবা স্লাভরা দু'একটি জাতির মধ্যে, তা কিন্তু জার শাসনাধীন রাশিয়ার পুঁজিবাদের ফলে জন্ম নেয় নি। এক অর্থে, যে শক্তির ফলে জারের যুগের সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি হয়, এটি তারই প্রতিফলন। ব্রিটেন নিশ্চয়ই জাতীয়তাবাদ এবং

উঠতি ধনতন্ত্রের পারস্পরিক বিদ্যমান থাকা ও সাহায্য করার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু অন্যান্য জাতীয় রাষ্ট্রে ভিন্ন পরিস্থিতি—যেখানে সামন্ত-তন্ত্রের শেষ শক্তি অথবা প্রাক্-ধনতান্ত্রিক রূপ ও উৎপাদন পদ্ধতি ঊনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল যার বৃদ্ধি হয়েছিল বহির্দেশীয় সম্প্রসারণ বা সাম্রাজ্যবাদের কাঁধে ভর দিয়ে অথবা ধনতন্ত্রের সঙ্গে তার তেমন যোগ ছিল না। মাত্র কয়েকটি দেশেই জাতীয়তাবাদ ছিল ধনতান্ত্রিক বৃদ্ধির ফসল। মোট কথা, সাম্রাজ্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদ পরস্পরের সাহায্যকারী শক্তি—বর্দ্ধিত মানব শক্তির এবং দ্বিতীয় স্তরের কারিগরীবিদ্যার আদর্শ ও নির্গমপথ হিসেবে এবং সামাজিক প্রচেষ্টার শক্তি এবং নিরাপত্তার ধারক-বাহক হিসেবে।

এই ব্যাপারটি আদি যুগের রোম্যান্টিক কবিতায় এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। উপনিবেশবাদী ধনতন্ত্র এবং উগ্রজাতীয়তাবাদের প্রবণতা লক্ষণীয় টমাস ক্যামবেলের কবিতায় :

'Britannia needs no bulwarks, no towers along the steep,
Her march is o'er the occean wave, her home
is on the deep."(৬১)

একই ধরনের আবেগ দেখা যায় হেনরি দ্য নেভিগেটার, ক্যামোয়েন এবং ব্রাগাঞ্জার পর্তুগালেও ; ঊনিশ শতকের কোলবার্টের ফ্রান্সে এবং ক্যাথারিনের রাশিয়াতে। ক্যাথারিনের সময়কার সম্ভ্রান্তশ্রেণীর ভূমিবিস্তারের চেতনা, আবার একই সঙ্গে কসাক কৃষক বিদ্রোহ (যেমন এমিলিন পুগাচভ বিদ্রোহ), অনেকটা আধুনিক জাতীয়তাবাদী চেতনায় সিঞ্চিত করে পুশকিন তার উপন্যাস 'ক্যাপটেনস্ ডটার'এ ফুটিয়ে তুলেছেন যেমন ওয়াল্টার স্কট নিম্নভূমির স্কটিশদের সদ্য শুরু হওয়া জাতীয়তাবাদ এবং উচ্চভূমির স্কটিশ উপজাতির সামন্ততন্ত্রের মধ্যে টানাপোড়েন চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন 'রব রয়' উপন্যাসে।(৬২) পশ্চিম ইয়োরোপের জাতীয়তাবাদকে অধিকাঠামোগত আদর্শ (superstructural ideology) হিসেবে বিশ্লেষণ না করে শুধু সর্বত্র একই বস্তুর অভিন্নরূপ আধুনিক পৃথিবীতে ঘটেছে বলা মার্কসের পক্ষে উচিত হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই, কারো পক্ষে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভিত্তির জন্য একই ধরণের প্রাধান্য বিস্তারক আদর্শ অপরিহার্য ভাবা সম্ভব হয় নি। কিন্তু কোনো বিশেষ ভিত্তির উপর নির্ভরশীল আদর্শের বিশেষ

অবস্থা সম্পর্কে যে কোন লোকের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যেমন, উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখেছি যে পর্তুগীজ কিংবা জারিস্ট রাশিয়ার জাতীয়তাবাদ ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদের রূপ থেকে স্বতন্ত্র, সম্ভবত তাদের প্রাক্-ধনতান্ত্রিক এবং দুর্বল ধনতান্ত্রিক ভিত্তির জন্য (একই পদ্ধতিতে ১৯৭০ এর দশকে ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদ বিসদৃশ এবং ভঙ্গুর, কারণ ঔপনিবেশিক শক্তির অভাবে ব্রিটিশ ধনতন্ত্র পঙ্গু হয়ে পড়েছে)।

জাতীয়তাবাদী যুগের ভিন্ন প্রান্তে, পর্তুগাল এবং রাজতন্ত্রের বিস্তারনীতি তাদের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের ঢুকে থাকার মতো জমি বা অনুবাত দিয়েছিল যথেষ্ট। এটাই জারের রাশিয়াকে সেই অবস্থায় এনে ফেলেছিল যাকে লেনিন ১৮৯০ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত প্রভৃত রচনায় 'আধা-এশিয়' (semi-Asiatic) চরিত্রের বলেছেন।

এই কারণেই, একটা পদ্ধতি ঠিক করা প্রয়োজন, যাতে এইসব ক্ষেত্রে শুধু জাতীয়তাবাদের ধনতন্ত্রের উপর নির্ভরশীলতা ছাড়া, ইয়োরোপীয় জাতীয়তাবাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতাকে সাহায্যের বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া যায়। এই প্রবণতা যা অ-ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির উপর উগ্রভাবে ঝাপিয়ে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছিল এবং ইয়োরোপীয় ধনতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে তার রূপ ঐসব সংস্কৃতির উপর চাপিয়ে দিয়েছিল।

৬. সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা এবং তার বিরোধাভাস—উপনিবেশবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ

সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একটি শক্তি-পরিচালনা যা রাষ্ট্রশক্তি গঠিত হওয়ার পর যে কোনো ঐতিহাসিক সময়ে লক্ষ করা যায়। ইয়োরোপীয় রাজ্যগুলিতে যে ধরনের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল তার সঙ্গে এটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু নিছক সম্প্রসারণবাদ বা উগ্র-স্বাদেশিকতার সঙ্গে অর্থনৈতিক-প্রেরণা-সঞ্জাত ধনতন্ত্রের একটি কালানুক্রমিক পার্থক্য আছে। শেষোক্ত ধরণের সাম্রাজ্যবাদকে, যা উৎপাদন প্রণালীর দিক থেকে ইয়োরোপীয় পুঁজিবাদের বহির্জগতে সম্প্রসারণ মাত্র, ঔপনিবেশিকতা বলা হয়।

খুব সহজভাবে বলতে গেলে, কিভাবে ঔপনিবেশিকতার উৎপত্তি হয় এবং কিভাবেই বা এর বৃদ্ধি হয়? প্রাথমিকভাবে, ব্যাপারটি যেসব দেশ সামাজিক

ঐক্য এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করছে অনেকটা, অথচ আত্মনির্ভরশীল নয়, তাদের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি এবং ব্যবহারের প্রয়োজন ও পক্ষপাতের আনুপাতিক সাযুজ্যের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিম ইয়োরোপের উপকূলে এই ধরণের জাতির দেখা পাই পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে। এই সময় মৎসজীবী সমাজের সঙ্গে আটলাণ্টিকের যোগ ভারতীয় বাণিজ্য পথের সন্ধানের প্রেরণা দেয়। এদের আদি কার্যাবলীর মধ্যে ধর্মীয় উদ্দেশ্য লক্ষ করি ক্যাথলিক জাতিগুলির ক্ষেত্রে এবং প্রোটেস্টান্ট জাতিগুলির ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ রপ্তানী বাণিজ্যের উদ্দেশ্য লক্ষ করি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে, ঐসব অঞ্চলের উচ্চ এবং মধ্যশ্রেণীর একচেটিয়া উদ্বৃত্তের ভোগকারী শ্রেণীর কাছে গ্রীষ্মমণ্ডল থেকে বিলাসবহুল দ্রব্য (যেমন মশলা, কাপড় এবং ক্রীতদাস) আমদানী যুক্ত হয়। রাজনৈতিক অবস্থার বিপাকে পলায়নমান ব্যক্তিরাও উপনিবেশগুলিতে আশ্রয় খুঁজে পায়-বিশেষত উত্তর আমেরিকায় এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজে, যেখানে তাঁরা আগে চলে-যাওয়া অভিজাত বংশীয়দের উত্তরসূরীদের সঙ্গে মিশে যায়। রাষ্ট্র-বহির্ভূত অধিকার সমন্বিত প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বাস্তুত্যাগীদের উপনিবেশগুলি আভ্যন্তরীণ রফতানিকারক, স্থান ও গুদাম এবং মুনাফা লাভের যায়গা এই তিনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী বাণিজ্যের ক্রিয়াকৌশলের স্থায়ী বাজারে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ বাণিজ্যের একটি উপমা হিসেবে ত্রিকোণাকৃতি পদ্ধতি, ব্রিস্টল, পশ্চিম আফ্রিকার দাসব্যবসা এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চিনির মধ্যে লক্ষ করি। অনুরূপ একটি উনিশ শতকীয় উপমা—একদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আফিম ক্যান্টনে এবং চীনের চা লণ্ডনে বিক্রয় এবং যেখানে শেষ পর্যায়ে চায়ের শ্রেণী-বিভাজন এবং মুনাফা লাভ। এই ক্রিয়াকৌশলের কাঠামোর আবার নানাস্তর ছিল।

নেপোলিয়ন এবং তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ পদ্ধতি প্রবর্তনের আগেই, বাণিজ্যিক ঔপনিবেশিকতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে চাষবাসের অর্থনীতির অপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এশিয়ার-আফ্রিকার এবং আমেরিকার দূরবর্তী বাণিজ্যগুলিকে শোষণ করার দিকে দৃষ্টি দেয়। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটেনের শক্তিসাম্যের ভিত্তি হিসেবে আমদানি-রফতানির কেন্দ্রগুলিকে ইয়োরোপের অন্যত্র সরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। স্কাণ্ডানেভিয়া, রাশিয়া, পর্তুগাল, দক্ষিণ স্পেন, ইটালী এবং তুর্কী সাম্রাজ্য ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে

ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিল এবং ফলে অকেজো ফরাসী রাজ-নির্দেশনামা ও তার রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি সহ্য করে নি।

কিন্তু ওয়াটারলুর যুদ্ধের পরবর্তী ব্রিটেনের শিল্পপ্রাচুর্য পৃথিবীব্যাপী ঔপনিবেশিক সাম্প্রসারণবাদের বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টি করল। বস্ত্র কিম্বা লৌহজাত পণ্যাদির উৎপাদনের হার অত্যন্ত বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। নতুন শক্তিচালিত তাঁত এবং অন্যান্য যন্ত্রাদির প্রচুর পরিমাণে মূলধন সঞ্চয় সম্ভব করেছিল। 'ব্যক্তিগত-ব্যবসা' নীতির সমর্থনকারীরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বৃহত্তর স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এই গোষ্ঠী যারা ম্যাঞ্চেষ্টার দলের পূর্বসুরী. তারা চেয়েছিল অধিকতর শুল্ক সংরক্ষণ, মূলধন বিনিয়োগ এবং নিম্ন কাঠামোর (infra-structure) সৃষ্টি। কারণ, তারা চেয়েছিল বাড়তি পণ্য রপ্তানির এবং ফলতঃ, শ্রমনীতির চুক্তি-নামা, চাষে লাগানোর জন্য অনগ্রসর-সম্প্রদায় সংগ্রহ এবং কর্মস্থলের আইনানুগ বন্দোবস্ত (বাস্তবিক, ক্রীতদাসত্বের অর্থনৈতিক বিকল্প)।(৬৩) অন্যদিকে, মূল নিজদেশের (metro-politan)পুঁজিবাদের বৃদ্ধিকল্পে অধিক পরিমাণে তুলা, নীল কিম্বা পাট প্রভৃতি কাঁচামাল সংগ্রহ, এবং যার নিয়মিত আমদানীর ফলে (সংরক্ষিত শুল্কের সুযোগে) বৃটেনে যন্ত্রে তৈরী বৃটিশ পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে। বৃটিশ পুঁজিবাদী স্বার্থে এইসব জিনিস অধিকতর রাজকীয় সংরক্ষণ দাবি করেছিল যাতে, অধিকতর বৃটিশ মূলধন বিনিযোগ হয় এবং উপনিবেশগুলিতে (যেমন ভারতবর্ষ) নিম্ন কাঠামো সৃষ্টি হতে পারে।৬৪ নব্য বৃটিশ সাম্রাজ্য হয়ে দাড়াল বৃটিশ বাণিজ্যিক জাতীয়তাবাদের রক্ষণাবেক্ষণের কেন্দ্র, যার সঙ্গে বৃহত্তর শহরগুলির মুনাফা লাভের অঞ্চল মিশে গিয়েছিল। ধনতন্ত্রের যুগের ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদের ঔপনিবেশিক উপাদান ছিল এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রিয়াকলাপ যা বৃটিশ এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এবং বৃটিশ নৌবাহিনীর দ্বারা সংরক্ষিত ছিল ও যার সীমানা হংকং এবং তাসমানিয়া থেকে ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই পদ্ধতির চেতনা এবং প্রতিযোগিতা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, কারিগরি বিদ্যা এবং ব্যবসার অগ্রগতিকে ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। অনুরূপ অগ্রগতি সংক্রামিত হয়েছিল ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানীতে এবং আরও পরবর্তীকালে ভিন্নরূপে ইটালী এবং

জাপানে। এইসব দেশের বিলম্বিত শিল্প পুঁজিবাদের প্রথম ধনতান্ত্রিক জাতিগুলির চেয়ে কম শোষণযোগ্য অনাবাদী জমি এবং অগঠিত বাজার ছিল। তাছাড়া তারা, এশিয়ার এবং আফ্রিকার দুর্বলতর ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে অধিক সচেতন বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে, পারস্য কিম্বা চীন কিম্বা মরোক্কো কিম্বা তুরস্কের সশস্ত্র সংগ্রাম অথবা রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন কার্যসূচী উল্লেখযোগ্য। ফলে বিলম্বিত পুঁজিবাদকে অনেক বেশী সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং স্বৈরাচারী হতে হয়েছিল। গোড়ার দিকের উপনিবেশগুলির চাইতে তাদের উপনিবেশ বৃদ্ধি বজায় রাখতে অনেক বেশী পরিমাণ নিরঙ্কুশ নীতি গ্রহণ করতে হয়েছিল, প্রথম এবং দ্বিতীয় ধরণের ধণতন্ত্রের পার্থক্য থেকেই বিশ্ব-ঔপনিবেশকতার অগ্রগতির প্রক্রিয়া পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথম অথবা ব্রিটিশ পদ্ধতির ধনতন্ত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বেসামরিক-সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সীমাবদ্ধ জামিন দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় অথবা প্রাশিয়ার ধরণের অগ্রগতির অর্থই ছিল ঔপনিবেশিক সমাজ এবং অর্থনীতিতে স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ, যার ফলে সার্বিক স্ববিরোধিতার উৎপত্তি। যেমন, আরব ভূখণ্ডে অটোমান তুর্কী শাসনে দীর্ঘকালীন কৃত্রিম আধুনিকীকরণ কিম্বা আধুনিক নামিবিয়াতে, যা এককালে, জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে ছিল এবং পরে দক্ষিণ আফ্রিকার সামন্তরাজ্যে পরিণত হয়েছিল অথবা, জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকারের সময় এবং তাইওয়ানে। দ্বিতীয় পদ্ধতির ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র সূত্রপাত হয়েছিল শহুরে শাসকশ্রেণীর দ্বারা যাদের দেশীয় অগ্রগতির ভিত্তি ছিল প্রথম পদ্ধতির ধনতন্ত্র। ভারতে ব্রিটিশ স্বৈরাচারের তীব্রতম সময়গুলি (যেমন, ১৮২০র দশক অথবা ১৮৫৯-৬২, অথবা ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিক) অথবা ওলন্দাজ নীতির পাশাপাশি ওলন্দাজ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশীয় অর্থনীতি এবং সমাজকে ধরলে উদাহরণ পাওয়া যাবে।(৬৫) যেকোনো পদ্ধতিতেই বিলম্বে যারা এসেছে তারা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে পূর্ববর্তী অগ্রগতির সঙ্গে যা অধিকতর সহজ পরিস্থিতিতে ঘটেছিল। ফলে তাদের সাফল্য তখনই সম্ভব যদি তারা আরও উগ্র পন্থা গ্রহণ করে, কারণ, তাহলে, পৃথিবীর সম্পদ ভাগাভাগিতে এবং ব্যবসায় তারা প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে। পদকের অন্যদিকের চিত্র ছিল, এর ফলে উপনিবেশের জনগণ এই অগ্রগতি কিভাবে

গ্রহণ করেছিল সেই ছবিটা। প্রাচীন ধরণের সাম্রাজ্যবাদ ছিল অর্থ এবং পণ্য লুঠ মাত্র (সাম্রাজ্যবাদীর রাষ্ট্রের প্রয়োজনে)—গবাদি পশু, মণিমুক্তা অথবা সোনারূপার লোভে(৬৬)—একই সঙ্গে অনুগত শাসক অভিজাত শ্রেণী তৈরী করা, যাদের উপর পরবর্তী কর আদায়ে নির্ভর করা যায়। নতুন ধনতান্ত্রিক ঔপনিবেশিকতায় প্রধান প্রয়োজন ছিল বাজার তৈরী করা এবং কাঁচামাল দূরবর্তী অঞ্চল থেকে শহরের বাণিজ্যকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃষ্টি করা। আবার, উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যগুলি শহর থেকে দূরবর্তী বাজারে নিয়ে যাওয়া এবং একদল সহযোগী দালাল, বিক্রয় প্রতিনিধি এবং এইসব কাজ দেখানোর জন্য অনুগত কর্মচারী মোতায়েন রাখা। এইসব মিলে ঔপনিবেশিক অঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৃদ্ধি হয়। আন্তর্জাতিক মানের ধনতন্ত্রের এরা ফসল। কিন্তু এই শ্রেণী বুর্জোয়া প্রাধান্যের সম্পূর্ণ ফললাভে ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের স্বার্থ ঔপনিবেশিকদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমার্থক ছিল না। গ্রাম্‌শির (Gramsci) ভাষায়, এই ধরণের মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাদের প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষমতা থাকে না, তারা অধস্তন বুদ্ধিজীবিদের (Subaltern intelligentsia) প্রতিনিধি(৬৭)। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি শ্রেণী এই ধরণের স্তাবক Eliteদের পছন্দ করেনি এবং সমতাবাদী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। এই আন্দোলনগুলিই জাতীয় আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সমাজতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং যে আন্দোলনগুলি ছিল আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী অসাম্যের ঔপনিবেশিক ধারার বিরুদ্ধে। যেমন সাম্রাজ্যবাদ, শুধুমাত্র অনুগত সম্ভ্রান্ত শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল, ঔপনিবেশিকতা তেমনি একটি অধস্তন বা নিম্নবর্গীয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধি-জীবি সমাজের জন্ম দেয় যাদের আদর্শের উপর তীব্র আঘাত তাদের উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।(৬৮)

এই প্রবণতা ভারতবর্ষে লক্ষণীয় নয়। এই স্তরের অমূর্ত অবস্থায় তা বিশেষ কোনো দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দক্ষিণ আমেরিকার জাতীয়তা-বাদ যা 'Bolivar ও O'Higgin's এবং Martiর যুগে দেখি তা স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রাক্-ধনতন্ত্রের বিরোধী শক্তি। আরব জাতীয়তাবাদ মূলত ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যবাদ এবং পরে বৃটিশ, ফরাসী এবং ইস্‌রাইলীয়, উপ-নিবেশিকতার বিরোধী। এই উপনিবেশিকতা সেইসব রাজ্যে দেখা যায় যেগুলি অটোমান সাম্রাজ্যের উত্তরসূরী এবং পরবর্তীকালে ইউরোপীয় এবং

মার্কিন শক্তির উপর নির্ভরশীল।(৭০) আফ্রিকার রাজনৈতিক দলগুলির এবং আন্দোলনের আদি জাতীয়তাবাদ ছিল আফ্রিকায় বিভিন্ন ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তির উপনিবেশিকতার নানা ধারার এবং আফ্রিকা ভাগাভাগির বিরুদ্ধে জেহাদ্।(৭১) ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদ ছিল ওলন্দাজ কৃষি পদ্ধতির বিরুদ্ধে অভিব্যক্তি।(৭২) প্রতিটির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্বতন্ত্র, যেমন, আন্দোলন ভেদে বা অঞ্চল ভেদে পার্থক্য। তৎসত্ত্বেও, এই ধরণের প্রতিটি জাতীয়তাবাদ প্রথম অথবা দ্বিতীয় পদ্ধতির পুঁজিবাদের জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ক্রিয়া। তাছাড়া, এই ধরণের (উপনিবেশ-বিরোধী) জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সেইসব দেশে, যেখানে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব সামান্য। সুতরাং এই ধরণের জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা পরিমাপ করা যায় না।

৭. উপনিবেশ-বিরোধী আদর্শের বিরুদ্ধে নয়া-ঔপনিবেশিকদের সমালোচনার প্রত্যুত্তরে সমালোচনা

রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক তত্ত্ব বিষয়ে এবং রাজনৈতিক ইতিহাস যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনগুলিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের এবং তার ফলাফল বিষয়ে লিখিত হয়েছে, সেখানে পশ্চিম ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের রূপ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদের মধ্যে প্রায়শই পার্থক্য দেখানো হয়েছে। শেষোক্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদকে মূল আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে সমালোচনা করা হয়েছে। অনেকটা পিতার সঙ্গে অবাধ্য পুত্রের দ্বন্দ্বের মত সৌখিন তত্ত্ব খাড়া করে তারা গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর (যা একটি মাত্র উপাদান) বেশী জোর দিয়েছেন অথচ, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি উপেক্ষা করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনগুলির কার্যকলাপ বিচারের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে ইউরোপীয় উদারতাবাদকে।

আমেরিকার রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব এবং আধুনিকীকরণের সমাজতত্ত্বের নয়া-উপনিবেশবাদী প্রতিক্রিয়া সম্প্রতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।(৭৩) আমরা সংক্ষেপে সাধারণভাবে উপনিবেশ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আদর্শের চরিত্র বিষয়ে, এবং বিশেষভাবে, ভারতবর্ষে তার সামাজিক ভিত্তির চরিত্র বিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানের ধারণার কিছু নমুনা আলোচনা করতে পারি।

অক্সফোর্ডের রাজনৈতিক তত্ত্বের বিখ্যাত ইতিহাসকার জন প্লামেনাজ উদার বুদ্ধিজীবি দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন ১৯৬০ সালে লেখা তার Alien Rule and Self-Government গ্রন্থে। পাশ্চাত্যের রক্ষণশীল রাজনৈতিক তত্ত্বের ভাষায় তিনি বলেছেন যে পশ্চিম ইউরোপীয় বিদেশী শাসনই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, কেবলমাত্র সেইসব মিলে যেখানে পাশ্চাত্য শ্রেণীর বিদেশী শাসন বলবৎ ছিল।(৭৪) তাঁর বক্তব্য সর্বতোই কমিউনিস্ট-বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক ব্যক্তিদের দ্বারা পূর্ববর্তী সাম্রাজবাদী প্রভুদের বিতাড়নের কাহিনীর ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। অথচ এই বিতাড়নের ব্যাপারের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তীব্র বিরাগ (এই বিরাগ অবশ্য নয়া-উপনিবেশিকতার মধ্যে সাধারণ ব্যাপার, বিশেষত ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংকটের ব্যর্থতার পর এবং নেহরু, টিটো, নাসের, মাওৎ সেতুং, এবং চৌ এন লাইয়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতিবিদ হিসেবে উত্থানের পর)। প্লামেনাজ কেবলমাত্র আদর্শগত ঘর্ষণে উৎপন্ন তত্ত্বকেই প্রশংসা করেছেন, যা ছিল সাম্রাজ্যবাদী উত্তরাধিকার।(৭৫) তাঁর মতে গণতন্ত্র অনেকটা পশ্চিম দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের মতোই ব্যাপার। প্লামেনাজ অবশ্য স্বীকার করেছেন: "নাৎসী কিংবা ফ্যাসিস্টদের বেলায় অনেক ক্ষেত্রে ভাঁড় কিংবা নিরাশ্রয় কিছু থাকে, যে মানুষ সংস্কৃতির মধ্যেও নাক গলায়, যা অনগ্রসর দেশে কমিউনিস্ট বা জাতীয়তাবাদীদের কাছে কদাচিৎ দেখা যায়।"(৭৬) কিন্তু "জাতীয়তাবাদীরা" ফ্যাসিবাদীদের মতো নয় এবং পশ্চিমী গণতন্ত্রের পাশে দাঁড়িয়েছিল বলে পশ্চিমী উদারশ্রেণীর দ্বারা সর্বাধিক প্রশংসিত হয়েছে। এটি তার মতে অত্যন্ত সঠিক প্রশংসা। কিন্তু বস্তুত তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক তত্ত্ববিদদের মতোই ভুলে গেছেন যে, যেসব দেশের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সেখানকার "অনগ্রসরতা" কোনো সাংস্কৃতিক কিংবা বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক লুঠতরাজের ফসল নয়, পশ্চিমী উপ-নিবেশিকতার রাজনৈতিক নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং সামাজিক বিকৃতির ফলেই তা হয়েছে, যারা ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রও আমদানি করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী রাজনৈতিক সঙ্কটের উদার রাজনৈতিক তাত্ত্বিকেরা তৃতীয় বিশ্বের 'পশ্চিমায়ণ' বা 'আধুনিকীকরণ' সম্বন্ধে যা ভেবেছেন, তা আদৌ সত্যি কিনা তাই সন্দেহ।(৭৭) যে সব দেশ ঔপনিবেশিক যুগের মধ্য দিয়ে পার হয়েছে যেমন ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, ভিয়েৎনাম বা

চিলি, সেখানকার জাতীয়তাবাদকে পশ্চিম ইয়োরোপের মূল আদর্শের কাল্পনিক মডেলের অনুকরণ মনে করা গণ-সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরই অপমান।

যে দশকে প্লামেনাজের বই বের হয়, তারই শেষ দিকে আমরা পাই আন্দ্রে গুণ্ডার ফ্র্যাঙ্ক লিখিত Capitalism and Underdevelopment : Historical Studies of Chile and Brazil. এই লেখক এক আন্তর্জাতিকতাবাদী বিপ্লবী অর্থনীতিবিদ, আমেরিকায় শিক্ষিত। ফ্র্যাঙ্কের মতে বর্ধিত পুঁজিবাদই হচ্ছে আধুনিক জাতীয় অগ্রগতির সর্বাপেক্ষা বড় বাধা, যার ফলে অনগ্রসর দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী প্রবণতা রুদ্ধ হয়েছে, বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকায়। ফ্র্যাঙ্কের একপেশে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির উপর জোর দেওয়া প্লামেনাজের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। তিনি বিশ্বাস করেন যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ভাঙ্গা-গড়া বা বস্তুত তাদের সমস্ত অর্থনৈতিক অগ্রগতিই পূর্বতন উপনিবেশ-সৃষ্টিকারী বা বর্তমানের নয়া-উপনিবেশিকতাবাদী অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। এভাবেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কেন ব্রাজিল বা চিলির মতো দেশে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব বিশ্ব পুঁজিবাদের মন্দার সুযোগ নিয়ে সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করেছে উপনিবেশিকতা-বিরোধী নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে যখন নয়া-উপনিবেশিকতার পিছনে ব্যবসায়ীসমাজ সবলভাবে সাহায্য করেছে। এই অতি-বাম তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত প্লামেনাজের সমগোত্রীয় হয়ে দাঁড়ায় যদি এমন অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করা হয় যে উপনিবেশ-বিরোধী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ধনতন্ত্রবাদের নিজের অসাম্যের জন্য পুরানোপন্থী ধনতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের পরগাছায় পরিণত হয়, যা পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণও করে না অথচ ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ অধীনেও চলে যায় না।

ফ্র্যাঙ্ক সোভিয়েট সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষা মেনে নিয়েছেন যে, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এমন একটি শ্রেণী যারা অনগ্রসর সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে উদার নেতৃত্ব গ্রহণ করে, কিন্তু তিনি এই সোভিয়েট রাজনৈতিক ধারণা গ্রহণ করেন নি যে, এই বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ স্বার্থেই নয়া-উপনিবেশিকতার এমন একটি স্ব-বিরোধী পথে যায় যা তৃতীয় বিশ্বে চলমান দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের কারিগরী এবং মূলধন গঠনের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করে। তিনি বিশ্বাস করেন না যে এই পথ গরীব সর্বহারা শ্রেণীর নানা আঞ্চলিক উপাদানের বিপ্লবী শিক্ষার

ক্রম-বিকাশকে দীর্ঘায়ত করে। কারণ, তিনি চিকাগোর অর্থনীতির শিক্ষকদের স্বত প্রণোদিত উদারতাবাদও বাতিল করে দেন। এবং স্বজ্ঞানতঃ বুর্জোয়া শব্দটির আগে 'জাতীয়' শব্দটি ব্যবহার করেন।(৭৮) তার ব্যাখ্যা বস্তুতঃ তথ্যের বিপরীত কথা বলেছে। ঘটনা এই যে, নয়া-উপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনগুলি (যেমন, চিলির Allende সরকার), যেগুলি মুখ্যতঃ শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন পেয়েছে এবং যাদের উপর ফ্র্যাঙ্ক নিজেও অনেক আশা পোষণ করেছেন, তারা এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় বিশ্ব-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে সংহত করার ব্যাপারে, বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এই কারণেই, Allende সরকারকে সেনট্রাল ইনট্যালিজেন্স এজেন্সি মারফত মার্কিন সরকার পতন ঘটিয়েছিল এবং সি. আই. এ'কে সাহায্য করেছিল চিলির সামরিক বাহিনী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং অন্যান্য স্বার্থান্বেষী মহল। একদিকে ফ্র্যাঙ্ক খুব জোরের সঙ্গে বিশ্ব পুঁজিবাদের উপর নির্ভরশীল উপনিবেশগুলির বুর্জোয়া শ্রেণীর পরগাছা অংশকে সমালোচনা করেছেন, অথচ, তার একপেশে যুক্তি নতুন জাতিগুলির বিকল্প ব্যবস্থার জন্য সংগ্রামের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করেছে। সি. আই. এ ধরনের গুপ্তচর কর্মকে প্রতিহত করা যায়, তার জন্য নৈরাশ্যবাদী ভবিষ্যৎ বাণীর প্রয়োজন হয় না।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের একালের এক সৌখিন ঐতিহাসিক এর সীমাবদ্ধতাকে বেশী জোর দিয়েছেন, অথচ, এর প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্যগুলি দেখেননি। অনিল শীলের 'Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the Later Nineteenth Century,' বইতে প্লামেনাজের বুর্জোয়া যুক্তির পরিপক্কতা না থাকলেও একই কথা জাঁকজমকের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বলা হয়েছে। কথাটি এই যে, ঔপনিবেশিক অঞ্চলে জাতীয়তাবাদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ (উল্লেখযোগ্য যে, প্লামেনাজের মত শীলও উপনিবেশিকতা বলছেন না) কর্তৃক ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সংগঠন প্রবর্তিত হয়েছিল তার সংস্কার সম্ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কিম্বা তাদের পূর্বসূরীদের আঞ্চলিক ঝগড়া বিবাদকে অতিরিক্ত গুরুত্ব

দিয়েছেন। শীল একথা বুঝতে চাননি যে, উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং কৃষকসমাজের কাছে, ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পাবনা এবং দাক্ষিণাত্য হাঙ্গামা এবং মারাঠা জাতীয়তাবাদের যুগে, বিকল্প পথের নতুন সম্ভাবনাকে খুলে দিয়েছিল। ষাটের দশকের মার্কিন সমাজতাত্ত্বিকদের সৌখিন প্রভাবে শীল লেখেন :

If Imperialism and nationalism have striven so tepidly against eath other, part of the reason is that the aims for which they have worked had much in common. Each with its own type of incertitude, each with grave limitations on its power, has set about modernizing the societies under its control, nationalism has sought to conserve the standing of some of those elites which imperialism had earlier raised up or confirmed, at various times, both have worked to win the support of the same allies. In India they have sometimes achieved similar results as well ; each in its own fashion sharpened the rivalries that were already stirring in the country, each grappled with the countervailing forces thrown up...by the mobilisation of further ranges of its population."

ব্যবহারিক স্টাইলে এই তুলনা করার অর্থই হচ্ছে এটা দেখানো যে সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদ-বিরোধিতা প্রকৃতপক্ষে তুলনাযোগ্য এবং একই নিরিখে বিচার্য্য। প্লামানেজ-এর কাছে যা খাঁটি বলে মনে হয়েছে, আবশ্যিক ভাবে তাই শীলের কাছে ব্যবহার বিজ্ঞানের ভেল্কিবাজি রূপে দেখা দিয়েছে। ঐতিহাসিক তুলনা এবং বিরোধের বিচার করা যেতেই পারে, তবে তা, গভীর বিষয়ভিত্তিক হওয়া উচিত, উপরিকাঠামোর আস্তরনের ভাসা ভাসা আলোচনার দ্বারা নয়।

ইতিহাসগত বিচারে উপনিবেশবাদ বিরোধিতার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং পরবর্তী কালের আশা আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় জাতীয়তার গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, বিশেষতঃ ঊনিশ শতকে। এই জাতীয়তাবোধ আবার ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং স্বাধীন সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামের যৌথ অভিব্যক্তি। বাস্তবিক পক্ষে উপনিবেশিকতাবাদ বিরোধিতা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাধীন পুঁজিবাদের দাবি অপেক্ষা অধিকতর বড় আদর্শ। যদিও অনুরূপ দাবি বাধ্যতামূলকভাবে

সমাজের অন্যান্য স্তর এবং শ্রেণীর (যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে) হাত থেকে নেতৃত্ব নিয়ে নেয়।

ব্রিটিশ প্রভুদের বিরুদ্ধে ১৭৬৩ খ্রীঃ মীরকাশেমের বিদ্রোহ, ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে দুই শতাব্দীব্যাপী নানা কৃষক অভ্যুত্থান, ১৮৪৮-৪৯ এর দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ অথবা, সিপাহী বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭-৫৯-এর ভারতীয় বিদ্রোহ—এই সমস্তই স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐ জাতীয় উপাদান। (৮০) এগুলি অবশ্য অনেক সময়েই স্থানীয় সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির পতনোন্মুখ অবস্থার আভ্যন্তরীণ স্ব-বিরোধ, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বাণিজ্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনে পুঁজিবাদী উপনিবেশিকতাবাদের ভারতীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ করা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চেতনার বিকাশ। এই সমস্ত ঘটনাবলী অনেক সময়ে স্থানীয় চিন্তায় প্রভাব ফেলেছে(৮১), এবং কোনো কোনো অঞ্চলে প্রতিবাদকারীদের উত্তরাধিকারীগণকে বিংশ: শতকের গোড়ার দিকে কংগ্রেস-চালিত গণ-আন্দোলনে যোগ দিতে প্রেরণা জুগিয়েছে। এই সমস্ত আন্দোলনগুলি একত্রিত হয়ে জাতীয়তার এক নতুন রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে ক্রমশঃ সাহায্য করেছে—যেমন, বিংশ শতাব্দীর ভারতের জাতীয় আন্দোলন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের জন্য রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে।

এই ধরনের উপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের বর্ণনা অবশ্যই পশ্চিমী সমাজতত্ত্বের কচকচি এবং তার সঙ্গী 'আধুনিকতা' 'রক্ষণশীলতা', 'এলিট শ্রেণীর উৎপত্তি', 'সহযোগিতা', 'সীমাবদ্ধ লক্ষ্য' ইত্যাদি গালভরা বুলির (যা, পশ্চিমী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশের সমর্থক) ধারার সঙ্গে মেলেনা। একথা সত্যি যে সাম্প্রতিক এক প্রবন্ধে শীল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক ভূমিকা বিষয়ে আরো কায়দা করে লিখেছেন :

"The suggestion that Government prepared its own destruction by fostering an intellectual elite is not relevant. Graduates and professional men in thc presidencies undoubtedly had a large part in the politics of province and nation. But they were not quite as important as they once appeared. Some of the suggestions...in the *Emergence of Indian Nationalism*...have dropped through the trapdoor of historiography,"

শেষ রূপকের মাধ্যমে যাই বলতে চেষ্টা করুন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে ডঃ শীলের ধারণার মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক বুলির ছড়াছড়ি দেখা যায়. শেষোক্ত প্রবন্ধটিও ব্যতিক্রম নয়। তিনি এখনো বিশ্বাস করেন যে সাম্রাজ্যবাদ জাতীয়তাবাদের মতোই ঐক্য এবং ভেদ উভয় শক্তি, জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিক পর্য্যায়ের আলগা রাজনীতির হালকা জোড় মাত্র এবং দুটোরই শক্তি সমাজ এবং উভয়েই শক্তি এবং পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষমতাদখলে তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী। এই ধরনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপনিবেশিকতা বিরোধিতাকে সাম্রাজ্যবাদের নেকনজরে নিয়ে নিয়েছে, যা নয়া-ঔপনিবেশিকতার ধ্বজাধারী ব্যক্তিরা তাদের আদর্শগত সংগ্রামে মরীয়া হয়ে শেষ অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করেছে।

কারণ, একথা ভুললে চলবে না যে গ্যালাঘার-শীল যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক উৎস সম্বন্ধে উদার সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা করেছেন তার একটি আদর্শগত কারণ আছে। যে জাতীয়তাবাদ চরিত্রে নিশ্চিত উপনিবেশিকতা-বিরোধী(৮৩) তার স্বাধীন সত্ত্বা ও যাথার্থ্য যেন অস্বীকার করতেই হবে—অনেক বুদ্ধি কসরত করে দেখাতে হবে যে, এই জাতীয়তাবাদ দ্বিতীয় প্রজন্মের ক্ষমতা না পাওয়া হতাশ লোকেদের শয়তানি। নতুবা, ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যে উপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধীতার উদ্ভবের প্রকৃত কারণগুলি খুঁজে বের করার প্রয়োজন ছিল। ভারতের কৃষি উৎপাদনের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং এর দ্বারা ভারতের দেশীয় বাজারকে রুদ্ধ করা, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে ক্রমাগত পরিমাপ নির্ধারণ এবং উদ্বৃত্ত শস্যের উপর কর বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় সম্পত্তির বহির্গমন, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ভারতের পুঁজিবাদী প্রসারের জন্য দেশীয় প্রচেষ্টার পথরোধ(৮৫) (এই প্রচেষ্টা যতই দুর্বল এবং ক্ষয়িষ্ণু থাক না কেন), শাসক শ্রেণী কর্তৃক ভারতীয় মধ্যবিত্তদের অন্ততঃ শ্বেতকায়দের সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক সাম্য অর্জন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বর্ণ-বিদ্বেষ(৮৬)—এই সমস্তই ভারতীয় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উদ্যোগকে শ্বেতকায়-প্রভাবিত সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া হোত।(৮৭)

এইসব ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে যোগ ও বিচার নয়া ঔপনিবেশিক আদর্শের অন্তর্গত নয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং উপনিবেশের সম্পর্কের বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা, সেই অর্থ বহন করে, যা, প্লামেনাজের বুদ্ধিজিজ্ঞাসা এবং শীলের বাস্তবধর্মিতা সমানভাবে বোঝাতে চেয়েছে। সাধারণভাবে

ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদ বিষয়ে, এবং বিশেষভাবে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিষয়ে তাদের বিবরণ একদিকে পশ্চিম ইউরোপের জাতীয়তাবাদের থেকে তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদকে পৃথক করে এবং শেষোক্ত শ্রেণীর জাতীয়তাবাদের মধ্যে উপনিবেশ বিরোধী উপাদানকে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত করে। পশ্চিম ইউরোপের জাতীয়তাবাদী কিম্বা ধনতান্ত্রিক আন্দোলন যেভাবে পরিণত হয়েছে তার থেকে উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যে পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে তা সম্পূর্ণ আলাদা। উপনিবেশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শ্রেণী-ভূমিকার বিবর্তন আলোচনা করা যেতে পারে, যদিও তা স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়।

—মূল ইংরেজী থেকে ভাষান্তর : গৌতম নিয়োগী

প্রসঙ্গ ও সূত্রনির্দেশ :

১. নীহাররঞ্জন রায়, ন্যাশানালইজম ইন ইণ্ডিয়া (স্যার সৈয়দ বক্তৃতা, ১৯৭২), আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, সৈয়দ হল প্রকাশনা নং ৪, ১৯৭৩, পৃঃ ৯-১২।

২. এই প্রবন্ধের প্রাথমিক খসড়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেবরাজ চানানা বক্তৃতা হিসেবে প্রদত্ত (১৯৭৫)। বক্তৃতার বিষয় ছিল : "দ্য ডায়েলেকটিক্যাল রিলেশনশিপ বিটুইন ইম্পিরিয়ালইজম অ্যাণ্ড ন্যাশানালইজম।" প্রবন্ধটির পরবর্তী মার্জিতরূপ সৃষ্টির কাজে সাহায্যের জন্য আমি অধ্যাপক অশোক সেন, ডঃ অমিয় কুমার বাগচী, ডঃ অনিরুদ্ধ রায় এবং অধ্যাপক রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

৩. এই ধরণের বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য অশোক সেন, "মার্কস, ওয়েবার অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া টুডে", ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ৭ বর্ষ, ৫-৭, ফেব্রু, ১৯৭২। তাছাড়া, দ্রঃ বরুণ দে, "এ হিস্টোরিক্যাল ক্রিটিক অফ রেনেশাঁস অ্যানালগস্ ফর নাইনটিনথ সেঞ্চুরি ইণ্ডিয়া", দ্রঃ পারস্পেকটিভ ইন সোস্যাল সায়েন্সস (অকস্‌ফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ১৯৭৮)

৪. ডি. ডবলু, ব্রোগান, দ্য ডেভল্যাপমেণ্ট অফ মডার্ণ ফ্রান্স (লণ্ডন, ১৯৬৩) পৃ ৩২৭-৮২। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ৩৫২, ৩৬৮ পৃষ্ঠাগুলির ১নং পাদটীকা।

৫. ই. নোলটে, থ্রি ফেসেস অফ ফ্যাসিজম্‌ : অ্যাকশন ফ্রঁস্যাসো, ইটালিয়ান ফ্যাসিজম, ন্যাশানাল সোসালইজম (অনুদিত, নিউইয়র্ক, ১৯৬৯ সং) চতুর্থ খণ্ড, ৩-৪ অংশ ।

৬. উইল ডুরাণ্ট, দ্য স্টোরি অফ সিভিলাইজেশন (নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৯) পৃ ২৪৮ এবং ১৭ অধ্যায়, ষষ্ঠভাগ, ২য় অংশ । অপিচ, জর্জ টমসন, ইস্কিলস অ্যাণ্ড এথেন্স : এ স্টাডি ইন দ্য সোসাল অরিজিনস্‌ অফ ড্রামা (লণ্ডন, পুনর্মুদ্রন, ১৯৬৬) পৃ ৩২৬-২৮ ।

৭. ই. বাডিরান, রোমান ইম্পিরিয়ালইজম্‌ ইন দ্য লেট রিপাবলিক (প্রিটোরিয়া, দঃ আফ্রিকা, ১৯৬৭), পৃ ৮১ । রোনাল্ড সাইম, দ্য রোমান রেভোলিউশন (অকস্‌ফোর্ড, ১৯৬১), ২-৯ অধ্যায় । হ্যারল্ড ম্যাটিংলি, রোমান ইমপিরিয়াল সিভিলাইজেশন (লণ্ডন, ১৯৫৭), পৃ ৫৮-৫৯ এবং ২-৩ অধ্যায় ।

৮. ডবলু এবারহার্ড, এ হিস্টরি অফ চায়না (লণ্ডন, ২য় সং ১৯৬০) পৃ ২৩৩-৩৪, ২৩৮-৪০ এবং এইচ. ম্যাকেলিভি, দ্য মডার্ণ হিস্ট্রি অফ চায়না (লণ্ডন, ১৯৬৭) পৃ ২৩-২৬ । এই দুটিতে চীনে জাতীয়তা গঠন এবং তার ব্যর্থতা বিষয়ে আলোচনা আছে ।

৯. চীনের চ্যাং জি-ই (Chang Chih-i)-র প্রতিতুলনা দিয়ে ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এই ধরণের জাতীয়তার সঙ্গে জাতিত্বের পার্থক্য বিষয়ে । দ্রঃ "এ ডিস্‌কাশন অন দ্য ন্যাশানাল কোয়েশ্চেন ইন দ্য চাইনীজ রেভোলিউশন অ্যাণ্ড অফ অ্যাকচুয়েল ন্যাশানালিটিজ পলিসি", জর্জ মোসলি (সম্পাদিত), দ্য পার্টি অ্যাণ্ড দ্য ন্যাশানাল কোশ্চেন ইন চায়না (এম. আই. টি, ম্যাসাচু, ১৯৬৬) পৃ ২৬-১৫৯ ।

১০. ইরফান হাবিব, 'দ্য এমারজেন্স অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালইটিস", সোশাল সায়েন্টিস্ট, অগাস্ট, ১৯৭৫, পৃ ১৭ ।

১১. ঐ, পৃ ১৫ ।

১২. ঐ, পৃ ১৬ ।

১৩. ঐ ।

১৪. ঐ, পৃ ১৮ ।

১৫. ঐ, পৃ ১৪ । জাতীয়তা বা জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে ভাষাকে বেছে নেওয়া হয়েছে স্ট্যালিনের 'মার্কসইজম অ্যাণ্ড ন্যাশানাল কোয়েশ্চেন' (১৯১৩) বই থেকে ।

১৬. হাবিব, পৃ ১৭ ।

১৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "বেঙ্গল : রাইজ অ্যাণ্ড গ্রোথ অফ এ ন্যাশানালিটি", সোশাল সায়েন্টিস্ট, আগস্ট, ১৯৭১, পৃ ৬৭ । অপিচ দ্রষ্টব্য, অশোক সেন, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ।

১৮. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৮।

১৯. ঐ

২০. ঐ, পৃ ৬৮-৬৯।

২১. ঐ পাদটীকা ৩।

২২. চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত আর রোসভলস্কি, "ওয়ার্কার অ্যাণ্ড ফাদারল্যাণ্ড : এ নোট অব এ প্যাসেজ ইন দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো", সায়েন্স অ্যাণ্ড সোসাইটি, ২৯, ১৯৬৫, পৃ ৩৫০-৩৭।

২৩. মরিস ডব, স্টাডিজ ইন দ্য ডেভেল্যাপমেন্ট অফ ক্যাপিটালইজম, ৩য় সং, লণ্ডন, ১৯৫২, পৃ ১২০-২২।

২৪. ঐ, পৃ ৪৫, ৫২, ৬৫।

২৫. "Bastard feudalism" ইংলণ্ডীয় সামন্ততন্ত্রের পতনোন্মুখ অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কথাটি অকস্‌ফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজের অধ্যাপক ম্যাকফারলেন বক্তৃতায় বলতেন (১৯৫৬ সালে আমি যখন ঐ কলেজের ছাত্র ছিলাম)।

২৬. ক্রিস্টোফার হিল, ইনটেলেকচুয়াল অরিজিনস্ অফ দ্য ইংলিশ রেভলুসন, লণ্ডন, ১৯৭১। এইচ. আর. ট্রেভর রোপার, রিলিজান, দ্য রিফরমেশন অ্যাণ্ড সোশাল চেঞ্জ অ্যাণ্ড আদার এসেস (লণ্ডন, ২য় সং, ১৯৭২), ২-৪ অধ্যায়ে অবশ্য উল্টো মত আছে। এই বিতর্কের জন্য দ্রষ্টব্য চার্লস ওয়েবস্টার (সম্পা) দ্য, ইনটালেকচুয়াল রেভলিউশন অফ দ্য সেভেনটিনথ্ সেঞ্চুরি (পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট সিরিজ, লণ্ডন, ১৯৭২)।

২৭. ক্রিস্টোফার হিল, দ্য ওয়ার্ল্ড টারন্‌ড আপসাইড ডাউন : র‍্যাডিক্যাল আইডিয়াস্ অফ দ্য ইংলিশ রেভলুশন (২য় সং, পেঙ্গুইন, ১৯৭৪), পৃ ২৯৫।

২৮. ঐ, পৃ ২৯৩।

২৯. ঐ, ২৯৫।

৩০. সাধারণের সুবিধার্থে আমি 'Civil Institution' কথাটি ব্যবহার করেছি, নতুবা আমি 'Civil Society' কথাটিই বেশী পছন্দ করি। এ বিষয়ে আরো মতামতের জন্য দ্রষ্টব্য, সিলেকশনস্ ফ্রম দ্য প্রিজন নোটবুকস্ অফ অ্যান্টোনিও গ্রামশি, (কুইনটিন হোর এবং জি. নোয়েল, স্মিথ সম্পাদিত), নিউইয়র্ক, ১৯৭১।

৩১. হাবিব, পূর্বোক্ত, পাদটীকা ১৫।

৩২. মার্কসের মতের পদ্ধতিগত অর্থের আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য, বরুণ দে, "এ হিস্টোরিক্যাল ক্রিটিক অফ রেনেশাঁস অ্যানালগস্" ইত্যাদি, পূর্বোক্ত।

৩৩. কার্ল মার্কস, "রেভোলিউশানারী স্পেন ওয়ান", দ্রঃ কার্ল মার্কস :

হিস্টোরিক্যাল রাইটিংস (দু'খণ্ড) (সম্পাদনা ক্লীমেন্স দত্ত, বোম্বাই, তারিখ নেই), ২য় খণ্ড, পৃ ৭৬৯।

৩৪. As I use it the term "historical overdetermination" is simply shorthand for excessive weightage of factors which determine immediate, i.e., short-range happenings, thus stultifying possibllities of logically working out dialectics implicit in the previous formation, from which transformation is taking place or was possible. It has **not** any relevance with the abstruse philosophy of Louis Althusser, **For Marx** (বেন ব্রুস্টার অনূদিত, প্যানথিঅন বুকস্, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৯) সপ্তম অধ্যায়ে।

৩৫. আর. আর. পামার, দ্য এজ অফ ডেমোক্র্যাটিক রেভোলিউশান…১৭৬০-১৮০০, প্রথম খণ্ড (ও. ইউ. পি, ১৯৫৯), পৃ ৩৯৭। তাছাড়া, আর.হের এর দ্য এইটটিনথ্ সেঞ্চুরি রেভোলিউশান ইন স্পেন (প্রিন্সটন, ১৯৫৮) ব্যবহার করে পামার দেখিয়েছেন (পৃ ৩৯৮) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের কোনো সামাজিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল না।

৩৬. ইরফান হাবিব, "অ্যান একজামিনেশন অফ উইটফোগেলস্ থিয়োরী অফ 'ওরিয়েন্টাল ডেসপটিজম'", দ্রঃ স্টাডিজ ইন এশিয়ান হিস্ট্রি (এশিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের প্রতিবেদন, সম্পাদন : কে. এস. লাল, নতুন দিল্লী, ১৯৬৯), পৃ ৩৭৮-৯২। তাছাড়া দ্রষ্টব্য ইরফান হাবিবের "পোটেনসিয়ালিটিজ অফ ক্যাপিটালিস্ট ডেভেল্যাপমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া", এনকোয়ারী, শীত সংখ্যা, ১৯৭১, নব পর্যায়, ৩য় খণ্ড।

৩৭. এরিক হবস্‌বম, "প্রি ক্যাপিটালিস্ট ফরমেশনস্", পূর্বোক্ত, পৃ ৬০-৬৪। ইরফান হাবিব, "প্রবলেমস্ অফ মার্কসিস্ট হিস্টোরিক্যাল অ্যানালিসিস্", সায়েন্স অ্যাণ্ড হিউম্যান প্রোগ্রেসঃএসেস ইন অনার অফ দ্য লেট প্রোফেসর ডি ডি কোশাম্বী (বোম্বে, ১৯৭৪) প্রবন্ধে ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠায় দেখিয়েছেন যে 'এশীয় স্বতন্ত্রতা' বিষয়ে হবস্‌বম যে তত্ত্ব পুনরুদ্ধার করেছেন, তা মার্কসের আদিযুগের রচনা। সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকরাই এই তত্ত্বটি উদ্ধার করেছেন, এশীয় বিপ্লবী তরঙ্গ যখন তুঙ্গে, তখন বিপ্লবীদের ব্যঙ্গ করতে। হাবিব বলেন, "১৯৫৭ সালে উইট-ফোগেল মার্কস একদা দুর্ভাগ্যবশত যে তত্ত্বটি উদ্ধার করেন তার সবিস্তার ব্যাখ্যা হিসেবে 'ওরিয়েন্টাল ডেসপটিজম' প্রকাশ করেন।" অধ্যাপক হাবিব উইটফোগেলের যে সমালোচনা করেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু উইটফোগেলকে মার্কসের গোড়ার দিকের রচনার সঙ্গে সমগোত্রীয় প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তিনি একটি বিষয় লক্ষ্য করেন নি যে মার্ক'স পরবর্তীকালেও, যেমন দাস ক্যাপিটাল বা এইটিনথ্ ব্রুমের-এ, তুলনা-

প্রতিতুলনার পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া সামন্ততন্ত্র প্রসঙ্গে এঙ্গেলস্ কিছু মন্তব্য (অ্যান্টি ডুরিং) উদ্ধৃত করে যেমন তিনি দেখিয়েছেন (পৃ ৩৬-৩৭) যে মার্কসের লেখায় অ-পাশ্চাত্য তুলনা বেশি নেই, তা-ও ঠিক নয়। বরং তথ্য তার উল্টো কথাই বলে। দ্রঃ আমার 'এ হিস্টোরিক্যাল ক্রিটিক' ইত্যাদি, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৩৮. ই. এম. এস. নামবুদ্রিপাদ, দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইন কেরালা, পি পি এইচ, বোম্বাই, ১৯৫২ ; ডি. ডি. কোশাম্বী, এন ইনট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অফ ইণ্ডিয়ান হিস্টরি (বোম্বাই, ১৯৫৬) ; এস. সি. সরকার, "দ্য হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচ ইন মার্কস্," দ্রঃ দাস ক্যাপিটাল সেণ্টেনারী ভল্যুম : এ সিম্পোসিয়াম (সম্পাদনা মোহিত সেন এবং এম. বি. রাও, পি. পি. এইচ, নতুন দিল্লী, ১৯৬৮) পৃ ৪৩।

৩৯. হাবিব নিজেই তাঁর নিজের তত্ত্বকে ছাড়িয়ে গেছেন, যখন তিনি বলেন the last word on...the international applicability of the pattern (Primitive Communism—Slavery—Feudalism—Capitalism) was said by Stalin in his classic essay on Dialectical and Historical materialism, 1938 (দ্রঃ হাবিব, "প্রবলেমস্ অফ" ইত্যাদি, পৃ ৪০) ভারতীয় ঐতিহাসিক বিবর্তন বিষয়ে স্ট্যালিনের উপর নির্ভরশীল না হয়ে তার নিজস্ব ব্যাখ্যা অনেক বেশি সঠিক।

৪০. মার্কস্ এ-বিষয়ে বেশি কথা বলেন নি। ভারতীয় ক্ষেত্রে চমৎকার তথ্য উদ্ধার করেছেন হিরোশি ফুকাজাওয়া, "স্টেট অ্যাণ্ড কাস্ট সিস্টেম (জাতি) ইন দ্য এইটটিন্থ সেঞ্চুরি মারাঠা কিংডম", দ্রঃ Hitotsu bashi Journal of Economics, ৯ বর্ষ, ১ সংখ্যা, জুন ১৯৬৮, পৃ ৫৪।

৪১. কার্ল মার্কস, নোটস্ অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি, রাশিয়ান সং ১৯৪৭ (অনুদিত) থেকে পশ্চিম ইয়োরোপের বাইরে ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার ইসলামকেন্দ্রিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মার্কস আরো কতিপয় বিষয় অন্য-নির্ভরতার জন্য সঠিক ধরতে পারেন নি। কিন্তু তাই বলে শফিক নাগভী যেভাবে মধ্যযুগের ভারত সম্বন্ধে মার্কসের অজ্ঞতা দেখিয়েছেন (মার্কস অন প্রি-ব্রিটিশ সোসাইটি অ্যাণ্ড ইকনমি", ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিউ, ৯ বর্ষ, সংখ্যা ৪, ডিসেম্বর, ১৯৭২) তা আদৌ ঠিক নয়।

৪২. উত্তর প্রদেশের চান্দালা জাতির খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে (নিম্ন জাতির মানুষদের সঙ্গে কৃষিকার্যের দাস-মজুর শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে) অধ্যাপক ইরফান হাবিব ১৯৬৩ সনে এ-বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৪৩. এম. এন. শ্রীনিবাস, সোসাল চেঞ্জ ইন মডার্ণ ইণ্ডিয়া (দিল্লী, ১৯৭১), প্রথম-তৃতীয় অধ্যায়। শ্রীনিবাসের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি ঔপনিবেশিকতার সাংস্কৃতিক ধারা মেনে নিয়েছেন।

৪৪. অধ্যাপক রায়ের অনুরূপ আন্দোলন বিষয়ে মতামতের জন্য "সোশিও-রিলিজিয়াস মুভমেন্টস অফ প্রোটেস্ট ইন মিডিভ্যাল ইণ্ডিয়া", দ্রঃ ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৩৬ তম অধিবেশনের (আলিগড়, ১৯৭৫) বিবরণী।

৪৫. ডঃ রায়ের ভাষায়ঃ "all that the collective but weak voices of criticism and protest could achieve was a certain amount of liberalization of the official position in certain sectors of the society but no over-all change in the hold of official pattern, nothing to speak of the basic social structure"..."Caste was much more than a mere socio-religious system···it amounted to...the over all producttve organisation which used to regulate the rural agricultural economic life of India through the ages. No collective voice or movement of criticism and protest did ever aim their blows against this productive system, not even criticise it: indeed they could not, since there was no other production system in sight. Once the critical and protestant communities fell into this productive system, they too became props of the very same social structure of which the productive system was but an inherent and essential element." দ্রঃ পূর্বোক্ত ভাষণ। এর সঙ্গে আমি শুধুমাত্র যোগ করতে চাই যে মার্কসবাদী সংজ্ঞায় সামাজিক কাঠামো উৎপাদন-সম্পর্কের একটি উপাদান মাত্র; উৎপাদন সম্পর্ক সামাজিক কাঠামোর অঙ্গ নয়। তাছাড়া দ্রষ্টব্য, সুরেন্দ্র গোপাল, "সোশাল অ্যাটিচুড অফ ইণ্ডিয়ান ট্রেডিং কমিউনিটিজ ইন দ্য সেভেনটিনথ সেঞ্চুরী", এসেস ইন অনার অফ প্রোফেসর এস. সি. সরকার, (পি. পি. এইচ, নতুন দিল্লী, ১৯৭৬), পৃ ১৯৩-৯৯।

৪৬. সামাজিক পরিবর্তন এবং শ্রেণীসংগ্রামের বিলম্বিত পদ্ধতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মতের জন্য দেখা যেতে পারে, এ.আই. চিচেরভ, ইণ্ডিয়ানঃ ইকনমিক ডেভেল্যাপমেন্ট ইন দ্য সিকস্টিনথ—এইটটিনথ সেঞ্চুরিজ, মস্কো, ১৯৭১।

৪৭. নির্মলকুমার বসু, হিন্দু সমাজের গড়ন (বিশ্বভারতী, ১৯৪৯) বইটিতে চিরাচরিত হিন্দু মতকেই মেনে নিয়ে নতুনভাবে বলেছেন যে জাতি

অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের সৃষ্টিকারী ; যে বিন্যাসের সর্বনিম্নস্থানে কৃষি-জীবীদের শ্রেণী সামাজিক ভিত তৈরী করে। তাছাড়া, সুরজিৎ চন্দ্র সিংহ তাঁর "কাস্ট ইন ইণ্ডিয়া : ইটস্ এসেনশিয়াল প্যাটার্ন অফ সোসিও-কালচারাল ইনটিগ্রেশন" প্রবন্ধে (কাস্ট অ্যাণ্ড রেস', কম্প্যারিটিভ অ্যাপ্রোচেস্, সম্পাদনা এ.ডি.রুক অ্যাণ্ড জে. নাইট, লণ্ডন, ১৯৬৭)। দুর্ভাগ্যবশত অধ্যাপক বসুর মতকেই সমর্থন করেছেন তিনি এবং তাঁর সঙ্গে মার্কসের 'এশিয়াটিক' সমাজের যোগসূত্র স্থাপন করে, এইসব সমাজের অপরিবর্তনীয়তার কথা বলেছেন। এই ধরণের যুক্তি ভারতের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমাজের পার্থক্য বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত জোর দেয়, ফলে পার্থক্যের ঐতিহাসিক কারণগুলি অনুসন্ধান করা হয় নি।

৪৮. এই ধরণের অনুসন্ধান, স্বয়ং নির্মলকুমার বসু যে ধরণের অনুসন্ধান করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। এর উদ্ভব করেন সুরজিৎ চন্দ্র সিংহ ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে। দ্রষ্টব্য, স্টেট ফরমেশন অ্যাণ্ড ট্রাইবাল মিথ ইন রাজপুত সেনট্রাল ইণ্ডিয়া", ম্যান ইন ইণ্ডিয়া, ৪২, ১ সংখ্যা, পৃ ৩৫-৮০।

৪৯. কে, এ. উইটফোগেল, ওরিয়েন্টাল ডেসপাটিজম, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৯। ইচ্ছে করেই নিজ প্রয়োজনে মার্কসের চিন্তার অংশ-বিশেষ উদ্ধার করেছেন। এর যাথার্থ্য ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন ইরফান হাবিব তাঁর স্টাডিজ ইন এশিয়ান হিস্ট্রিতে প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধে।

৫০ লুইজ ভাজ দ্য ক্যামোয়েনস্ দ্য লুসিয়াডস্ (পেঙ্গুইন, অনুবাদ, উইলিয়াম অ্যাটকিনসন), ১৯৫২।

৫১. সি. আর. বকসার, দ্য পোর্তুগীজ সী বোর্ন এম্পায়ার, ১৪১৫-১৮২৫ (পেঙ্গুইন, ১৯৭৩), পৃ ৩৭৭-৭৮।

৫২. পর্তুগাল সম্পর্কে ইংরাজিতে যে-সব কাজ হয়েছে সেগুলি এর জাতীয়তা-বাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী উত্থান ও পতনের উপরই জোর দিয়েছে। বস্তুত কেউই পর্তুগালের দুর্বল ধনতন্ত্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আলোচনা করে নি। আমি পর্তুগীজ ভাষায় এ-বিষয়ে ভালো কাজের সন্ধান পেয়েও ভাষাগত কারণে পড়তে পারি নি।

৫৩. ইংল্যাণ্ড-পর্তুগালের মধ্যে প্রভু-মক্কেল সম্পর্ক অনেক ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদী লেখকের লেখাতেই দেখতে পাওয়া যায়।

৫৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, সি. আর. বকসার, দ্য ডাচ সিবার্ন এম্পায়ার ১৬০০-১৮০৬ (পেঙ্গুইন, ১৯৭৩) ; ভায়োলেট বারবার ক্যাপিটালিজম ইন আমস্টারডাম ইন দ্য সেভেনটিনথ্ সেঞ্চুরি

(বালটিমোর, ১৯৫০) এবং আর. আর. পামারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, একাদশ অধ্যায়।

৫৫. জন প্রিবেল, দ্য হাইল্যাণ্ড ক্লিয়ারেন্সেস্ (লণ্ডন, ১৯৬৩) বইতে স্কটিশ সামন্ততন্ত্রের পতন সবিস্তারে দেখানো হয়েছে।

৫৬. ম্যাঞ্চেস্টার গোষ্ঠী গঠনের আদি বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, আরথার রেডফোর্ড, ম্যাঞ্চেস্টার মারচেন্টস্ অ্যাণ্ড ফরেন ট্রেড, প্রথম খণ্ড, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৩। অমলেশ ত্রিপাঠী, ট্রেড অ্যাণ্ড ফিনান্স ইন দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী (কলকাতা, ১৯৫৬) ১৭৯৩ খ্রী চার্টার আইনকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

৫৭. এইচ. জে. হাবাকুক, "ইংলিশ ল্যাণ্ডওনারশিপ, ১৬০০-১৭৪০", ইকনমিক হিস্ট্রি রিভিউ এবং "ম্যারেজ সেটেলমেন্টস্ ইন দ্য এইটটিনথ সেঞ্চুরি", ট্র্যানসাকসানস্ অফ দ্য রয়াল হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, ১৯৫০। অধ্যাপক হাবাকুক প্রচলিত মত ব্যাখ্যা করেছেন। সাম্প্রতিক ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, বি. এ. হোল্ডারনেস্ "দ্য ইংলিশ ল্যাণ্ডমারকেট ইন দ্য এইটটিনথ্ সেঞ্চুরি : কেস্ অফ লিঙ্কনশায়ার", ইকনমিক হিস্ট্রি রিভিউ, নভেম্বর, ১৯৭৪।

৫৮. মার্ক বেনস্-জোনস্, ক্লাইভ অফ ইণ্ডিয়া (লণ্ডন, ১৯৭৪) বইতে ক্লাইভের ব্যক্তিজীবন এবং মানসিকতার চমৎকার বিবরণ ও বিশ্লেষণ আছে।

৫৯. ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর সামাজিক চরিত্রের জটিলতা এবং এই যুগের মানসিকতা ও আদর্শ বিষয়ে সুন্দর মার্কসবাদী আলোচনার জন্য দ্রঃ ই. পি. টমসন, "দ্য পিকিউলিয়ারিটিজ অফ দ্য ইংলিশ", সোশাল রেজিস্টার, লণ্ডন, ১৯৬৫।

৬০. এইচ. সেটন-ওয়াটসন্, দ্য ডিক্লাইন অফ ইম্পিরিয়াল রাশিয়া, ১৮৫৫-১৯১৪। নিউইয়র্ক, ১৯৬১, চতুর্থ অধ্যায়। আর. ই. ক্যামেরণ, ফ্রান্স অ্যাণ্ড দ্য ইকনমিক ডেভেল্যাপমেন্ট অফ ইয়োরোপ (প্রিন্সটন, ১৯৬১), ৯ম, ১৩শ অধ্যায়। আর. পোরটাল, "দ্য ইণ্ডাসট্রিয়ালাইজেশন অফ রাশিয়া, ১৭০০-১৯১৪", দ্য কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ (১৯৬৬), পৃ ৮০১-৭২ ; এম. এস. ফ্যালকাস, দ্য ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেন অফ রাশিয়া, লণ্ডন, ১৯৭২, পৃ ৭০-৭২।

৬১. টি ক্যামবেল, "ইয়েম্যানিনারস্ অফ ইংল্যাণ্ড", পুনর্মুদ্রিত স্যার আরথার কুইলার-কথ্ (সম্পা), দ্য অকস্‌ফোর্ড বুক অফ ইংলিশ ভার্স, অকস্‌ফোর্ড, ১৯১৮, নং ৫৮০, পৃ ৬৭৩।

৬২. 'জনগণের ইতিহাসই কবির বাসভূমি'—বলেছিলেন পুশকিন ১৮২৫ সনে। পুশকিন বা ওয়াল্টার স্কটের লেখাতে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি

প্রাত্যহিক মানবসমাজের ব্যবহারের সঙ্গে মিলে এক নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে।

৬৩. হিউ টিঙ্কার, এ নিউ সিস্টেম অফ স্লেভারি, অকস্‌ফোর্ড, ১৯৭৪।

৬৪. অমলেশ ত্রিপাঠী, ট্রেড অ্যাণ্ড ফিনান্স ইন দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী। (কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যানস্‌, ১৯৫৬) বইটি ব্রিটিশ পণ্য প্রস্তুত-কারকদের গোষ্ঠীর জন্য দ্রষ্টব্য। তাছাড়া বিনয় চৌধুরী, গ্রোথ অফ কমারশিয়াল এগ্রিকালচার ইন বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৬৪; কে. এন. চৌধুরী, 'ভূমিকা', দ্য ইকনমিক ডেভেল্যাপমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডার দ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ক্যামব্রিজ, ১৯৭১। অশোক সেন, "বেঙ্গল ইকনমি অ্যাণ্ড রামমোহন রায়", দ্রঃ—রামমোহন রায় অ্যাণ্ড দ্য প্রসেস অফ মডার্নাইজেশন ইন ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ১৯৭৫। পি. বি. সিনহা, দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য মিনারাল ইণ্ডাস্ট্রিজ অফ বিহার (মজঃফ্‌ফরপুর, ১৯৭৫)।

৬৫. জে. ডি. লেগো, সুকর্ণ: এ পোলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি (পেঙ্গুইন, ১৯৭২)। বইটির গোড়ার দিকের অধ্যায়গুলিতে এই প্রবণতা সূক্ষ্মভাবে লিখিত হয়েছে।

৬৬. জর্জ ডব্লু. সেনসার, "দ্য পলিটিকস্‌ অফ প্লাণ্ডার: দ্য চোলজ্‌ ইন ইলেভেনথ্‌ সেঞ্চুরি সিলোন", জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিজ, ২৫ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, মে, ১৯৭৬। এই প্রবন্ধে প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক ভারতীয় সাম্রাজ্য-বাদের উদ্দেশ্য ভালোভাবে লিখিত হয়েছে কিন্তু লেখক এ-কথা স্মরণ করেন নি যে এই উদ্দেশ্য ও শক্তিগুলি ইয়োরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রেও কাজ করেছিল।

৬৭. 'সাবঅলটার্ণ ইনটেলিজেন্টসিয়া' কথাটি আমার তৈরী। ঔপনিবেশি-কতা-বিরোধী চিন্তার নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অমিয় বাগচী (প্রাইভেট ইনভেস্ট-মেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, কেমব্রিজ, ১৯৭২, শেষ অধ্যায়) মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যাকে 'ডিপেনডেন্ট বুর্জোয়াজি' বলেছেন এই শ্রেণী অনেকটা তাই। বুদ্ধিজীবী কিংবা অর্থনৈতিক প্রসেজকে উভয়ের দুর্বলতা এই যে, যে-কোনো শ্রেণীই উপনিবেশের বিদেশী প্রাধান্য খর্ব করতে পারে নি। যে উপনিবেশিকতাকে তারা বিরোধিতা করতে চেয়েছিল পরে তারই সহযোগী দলে পরিণত হয়। 'সাবঅলটার্ণ' শব্দটির সুপ্রযুক্ত ব্যবহার আন্তোনিও গ্রামশির থেকে নেওয়া।

৬৮. এস. গোপাল, জওহরলাল নেহরু: এ বায়োগ্রাফি, প্রথম খণ্ড (অকস্‌ফোর্ড, ১৯৭৬) গ্রন্থে উনিশ শতকের ভারতের এই অগ্রগতি-জনিত পরিস্থিতি চমৎকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৬৯. নিউ আমেরিকান এনসাইক্লোপিডিয়া বইতে, তৃতীয় খণ্ডে (১৮৫৮) "বলিভার ওয়াই. পন্টে" শীর্ষক রচনাটি হয় মার্কস নতুবা এঙ্গেলসের

লেখা। এতে এইসব অভ্যুত্থানে সামরিক সংগ্রামের তথ্যভিত্তিক আলোচনা আছে। দ্রঃ কার্ল মার্কস, হিস্টোরিক্যাল রাইটিংস্, পূর্বোক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৮৭২-৭৬। তাছাড়া, জি. পেণ্ডল্, এ হিস্টরি অফ ল্যাটিন আমেরিকা, পেঙ্গুইন, ১৯৬৩। সেলসো কুরটাডো, ল্যাটিন আমেরিকা : এ স্টাডি ফ্রম কলোনিয়াল টাইমস্ টু দ্য কিউবান রেভোলুশান, অক্সফোর্ড, ১৯৭০।

৭০. সাম্রাজ্যবাদী / জাতীয়তাবাদী দ্বৈত বিভাজন বিষয়ে দ্রঃ জর্জ আন্তোনিয়, দ্য আরব অ্যাওয়েকনিং, লণ্ডন, ১৯৩৬। জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিগত ভিত্তির জন্য এলবার্ট হুরেনি, অ্যারাবিক থট ইন দ্য লিবারেল এজ এবং সিলভিয়া আমিন, আরব ন্যাশানালইজম অ্যান অ্যানথোলজী, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৬৪ দ্রষ্টব্য।

৭১. ইয়োরোপীয় উপনিবেশবাদ তাদের নিজেদের মত ক'রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে রবিনসন, গ্যালাঘার এবং ডেনী-সম্পাদিত, আফ্রিকা এাণ্ড দ্য ভিকটোরিয়ানস্, পূর্বোক্ত। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের অর্থ-নৈতিক শোষণের চরিত্র আলোচিত হয়েছে সমীর আমিন, নিও কলোনিয়ালইজম ইন ওয়েস্ট আফ্রিকা, পেঙ্গুইণ, ১৯৭৩। তাছাড়া, টমাস হজকিন, "সাম আফ্রিকানস্ অ্যাণ্ড থার্ড ওয়াল্ড' থিয়োরিজ অফ ইম্পিরিয়ালইজম", স্টাডি'জ ইন দ্য থিওরী অফ ইম্পিরিয়ালইজম্, (সম্পাদনা : আর. ওয়েন এবং বি. সাটক্লিফ্, লণ্ডন, ১৯৭২)।

৭২. লেগো, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৭৩. পার্থ চ্যাটার্জী, "মডার্ণ আমেরিকান পোলিটিকাল থিয়োরী উইথ রেফারেন্স টু আণ্ডার ডেভেল্যাপড্ নেশনস্", সোশাল সায়েন্টিস্ট, নং ২৪, জুলাই, ১৯৭৪, পৃ ২৪-৪২।

৭৪. জন প্লামেনাজ, অ্যালিয়েন রুল অ্যাণ্ড সেলফ্-গভর্ণমেন্ট, লণ্ডন, ১৯৬০। পৃ ২, ৫, ৭, ১৪, ১৬-১৭।

৭৫ ঐ, পৃ ৯৫, ৭১-৭২।

৭৬. ঐ, পৃ ১৪১। পাদটীকা ১।

৭৭. এই সূত্রটি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে আমার অন্য প্রবন্ধে। দ্রঃ বরুণ দে, "বেঙ্গল রেনেশাঁস অ্যাণ্ড ব্রিটিশ কলোনিয়ালইজম, ১৮১৫-১৮৫৭", দ্রঃ লণ্ডলের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজের ভল্যুম (সম্পাদনা : সি. এইচ. ফিলিপস্ এবং এম. ডি. ওয়েনরাইট), লণ্ডন, ১৯৭৬।

৭৮. ব্রাজিলের 'জাতীয়' বুর্জোয়া শ্রেণী 'দালাল' বুর্জোয়া শ্রেণীর নব্য ফ্যাসিবাদী মিলিটারী একনায়কতন্ত্রে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে। জাতীয় ধনতন্ত্র বা জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী কখনোই ল্যাটিন আমেরিকায় অনুন্নত অবস্থার বাইরে বের হবার চেষ্টা করে নি। দ্রঃ আন্দ্রে গুণ্ডার

ফ্র্যাঙ্ক, ক্যাপিটালইজম অ্যাণ্ড আণ্ডার ডেভেল্যাপমেণ্ট ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পেলিক্যান, ১৯৭১। যদিও গ্রন্থটি একপেশে, যাতে শোষিত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবী সত্ত্বা একদমই উপেক্ষা করা হয়েছে।

৭৯. অনিল শীল, দ্য এমারজেন্স অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালইজম্, কেমব্রিজ, ১৯৭০, পৃ ৩৫১।

৮০. রুদ্রাংশু মুখার্জী, "দ্য আজিমগড় প্রোক্লামেশন অ্যাণ্ড সাম কোয়েসেনস্ অন দ্য রিভোল্ট অফ ১৮৫৭ ইন দ্য নর্থ ওয়েস্টার্ণ প্রভিন্সেস", দ্রঃ এসেস ইন অনার অফ প্রফেসর এস. সি. সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৮৯-৪৯১।

৮১. আর. এইচ. নিবলেট, দ্য কংগ্রেস রিবেলিয়ান ইন আজিমগড়, আগস্ট অ্যাণ্ড সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ (এলাহাবাদ, ১৯৫৭), পৃ ১।

৮২. অনিল শীল রচিত প্রবন্ধ, "ইম্পিরিয়ালইজম্ অ্যাণ্ড ন্যাশানালইজম ইন ইণ্ডিয়া", দ্রঃ লোকালিটি, প্রভিন্স অ্যাণ্ড নেশন (সম্পাদনা: জন গ্যালাঘার, গর্ডন জনসন, অনিল শীল, কেমব্রিজ, ১৯৭৩), পৃ ৬, পাদটীকা ৪।

৮৩. এই উপনিবেশ-বিরোধী বিষয়বস্তু সবচাইতে পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন বিপান চন্দ্র তাঁর 'মডার্ন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে (নতুন দিল্লী, ১৯৭০)।

৮৪. এই সমস্যা এবং আরো নানাবিধ সমস্যা বিষয়ে চমৎকার বিশ্লেষণের জন্য দ্রঃ ইরফান হাবিব, "কলোনাইজেশান অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি, ১৭৫৭-১৯০০", সোশাল সায়েন্টিস্ট, ৩২ নং, মার্চ, ১৯৭৫, পৃ ২৩-২৫।

৮৫. এফ. আর. হ্যারিস, জামসেটজী নাসেরওয়ানজী টাটা ; এ ক্রনিকল অফ হিজ লাইফ (বোম্বাই, ১৯৫৮) বইতে সরকারের সঙ্গে ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সংঘাতের অনেক উদাহরণ আছে।

৮৬. বরুণ দে, "ব্রজেন্দ্রনাথ দে অ্যাণ্ড জন বীমস্ : দ্য ইন্টার অ্যাকশন অফ প্যাট্রিয়টইজম অ্যাণ্ড প্যাটারনালইজম ইন দ্য আই. সি. এস. অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য ইলবার্ট বিল, ১৮৮৩", বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৬২।

৮৭. এই বিষয়ে অনবদ্য গ্রন্থ অমিয়কুমার বাগচীর 'প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টস্ ইন ইণ্ডিয়া", পূর্বোল্লিখিত। ঐ বইতে ভারতীয় শ্রমজীবীদের এবং ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিভেদপন্থার কথা বলা হয়েছে ; দ্রঃ পৃ ১৫৩ (৬.৩ ভাগ) এবং পৃ ১৬৫-৭০।

[প্রবন্ধটি অনুবাদের ক্ষেত্রে Nation = জাতি, Nationality = জাতীয়তা, Nationhood = জাতিত্ব এবং Nationalism = জাতীয়তাবাদ এইভাবে বাংলা পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। Capitalism = ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ এবং Bourgeoisকে বুর্জোয়া রাখা হয়েছে।—গৌ নি।]

সাম্প্রদায়িকতা ও ইতিহাস চেতনা

অশীন দাশগুপ্ত

সাম্প্রদায়িকতা বলতে বুঝি—এবং চিরকালই বুঝেছি—হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার এই বিশেষ অর্থ কিছুটা কষ্টকল্পিত। সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের বিরোধমাত্রেই সাম্প্রদায়িক। এই সহজ অর্থে প্রাদেশিকতা এবং জাতীয়তাবাদ দুটির মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে। জাতীয়তাবোধ আমরা সকলেই প্রশংসনীয় বলে মনে করি। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা নিন্দার্হ বলেই জানি। ভারতবর্ষকে হিন্দু-রাষ্ট্র বলে মানি না। কিন্তু ভারতবাসীর প্রয়োজনে পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদ সমর্থন করি। ভারতীয় নৌ-বহর সিংহলের রণতরী আটক করলে শ্লাঘা অনুভব করি। এই মেজাজ স্ব-বিরোধী। এর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন সিদ্ধান্ত রয়েছে। কোন কোন সম্প্রদায় ভালো; আমরা তার সমর্থন করি। কোন কোন সম্প্রদায় মন্দ; আমরা তার বিরোধিতা করি। জাতীয়তা যতদিন না সত্যকার আন্তর্জাতিকতায় উন্নীত হচ্ছে ততদিন এই স্ব-বিরোধ থাকবে। অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ভিতরকার সামাজিক চরিত্রও পালটাতে হবে। বহু সম্প্রদায়ের এই দেশ। ভারতীয় জাতীয়তাকে নতুন করে অন্য সমস্ত সম্প্রদায়কে কাছে টানতে হবে। ভারতীয় সমাজের মধ্যে স্থানীয় ও সাংস্কৃতিক সমাজগুলির জায়গা করতে হবে।

এই চেষ্টা নতুন নয়, বহু পুরাতন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দুধর্মই ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তি তৈরী করে। আশাবাদী মাত্রেই অবগত আছেন যে সভ্যমানুষ তার যাত্রাপথে পরিবার এবং গোষ্ঠী থেকে সম্প্রদায়, সম্প্রদায় থেকে জাতি, জাতি থেকে মহাজাতির পথে চলেছে। অনুসন্ধানী মাত্রেই স্বীকার করেন যে প্রতিটি পর্যায়েই বিশেষ ধরণের টানপোড়েন অনিবার্য। ঐতিহাসিকের কর্তব্য সেই জটিলতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা ও সেইমত বর্তমান অবস্থাকে উপস্থাপিত করা।

ভারতবর্ষ নামক বিশাল ভূখণ্ডে প্রাচীনকাল থেকেই বহু জনগোষ্ঠীর বাস। এই গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজস্ব অঞ্চলে, নিজ সমাজ সৃষ্টি করে বাস করতো। গোষ্ঠীমাত্রেই নিজস্ব উপাসনা ছিল এবং বিশিষ্ট শাসনের ব্যবস্থাও ছিল। কোন এক অনির্দিষ্ট কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারে এই গোষ্ঠীসমাজগুলি একত্র হয়েছিল। বিভিন্ন উপাস্য দেবতাকে ব্রাহ্মণেরা সংহত করেছিলেন। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উঠেছিলেন; এঁদেরও ছাপিয়ে নিগুর্ন ব্রহ্মাকেও আবিষ্কার করা হয়। উপাসনায় ব্রহ্মা, সমাজশাসনে ভারতবর্ষের ঐক্যের প্রতীক হন। শঙ্করাচার্য মহাদেশের চার কোণে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তীর্থযাত্রীদের ভারত-পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তী যুগে মরমীয়া সাধকেরা এবং ভক্তিধর্ম প্রচারকেরা ভারতীয় জনতা যাতে হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন না হন তার ব্যবস্থা করেন। হিন্দু ধর্ম হয়তো বিশেষ ব্যক্তির ধর্মান্তরে বিশ্বাস করতো না। কিন্তু অনায়াসেই সম্পূর্ণ সমাজকে হিন্দু উপাসনা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে তুলে আনতো। সতেরো শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর প্রমাণ রয়েছে! তার পরেও বহু অরণ্য-জাতি এভাবেই হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

পরমত সহিষ্ণুতা এই সমাজব্যবস্থার একটি প্রধান চরিত্র লক্ষণ। যে কোন রকম উপাসনাই হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত যদি সেই উপাসনাকে হিন্দু কল্পনার দেবমণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যে কোন সমাজ-ব্যাবস্থা-ই হিন্দু সমাজে আদৃত যদি সেই ব্যবস্থা সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ শাসন মেনে নেয়। অন্যের উপাসনাকে আক্রমণ করা নিষেধ ব্রাহ্মণের নির্দেশ অমান্য করা পাপ। রাজার কর্তব্য এই দুই ব্যাপারে সমাজকে নিশ্চিন্ত করা। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু-মতের সমাজে সংহতির এর চাইতে ভাল ব্যবস্থা আর হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

মুসলমান সমাজ ও খৃষ্টান সমাজকে হিন্দু ভারতবর্ষ কখন-ই আত্মসাৎ করতে পারে নি তার কারণ এই দুটি সমাজ ব্রাহ্মণ শাসন মানে নি এবং এই দুটি সমাজ বড় একটা হিন্দু রাজশক্তির অধীনে বাস করে নি। স্বাধীন ভারতবর্ষে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনতার মধ্যে বাস করে মুসলমান, খৃষ্টান কি শিখ সমাজের স্বাভাবিক কারণেই বিপন্নতা বোধ জেগে উঠতে পারে এবং জেগে উঠেছে। খৃষ্টানরা সংখ্যায় খুব-ই কম হওয়ায় তাদের বিপন্নতা কম নজরে পড়ে, মুসলমানদের মধ্যে খুব বেশী, শিখ বিপন্নতাও

এখন স্পষ্ট। নিজস্ব সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলার এই ভয় ভারতবর্ষের অন্য কিছু জনগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রকট। আসামের আন্দোলন অসমীয়া সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার-ই আন্দোলন। ব্রাহ্মণ শাসন আজ নেই কিন্তু ব্রাহ্মণ শাসনের উত্তরাধিকার রয়েছে। ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি অতি সহিষ্ণু মেজাজে অন্য সমস্ত পৃথক সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নিচ্ছে। রাজশক্তি আজ গণভোট দ্বারা চালিত। সেজন্য সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে গেলে বিশেষ এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠতাও বজায় রাখা প্রয়োজন। আসামের আন্দোলন হিন্দু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নয় কিন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠতা হারানোর ভীতি এই আন্দোলনে তীব্র। শিখ আন্দোলনের মধ্যে দু-রকম ভয়-ই পরিষ্কারভাবে কাজ করছে।

হিন্দু সংস্কৃতির আগ্রাসী চেহারা সাধারণভাবে ভারতবাসীর নজরে আসে না। হিন্দুধর্মের সহিষ্ণুতা এবং উদারতা এই আগ্রাসী মেজাজকে আড়াল করে। অবশ্য কট্টর সাম্প্রদায়িক হিন্দু প্রচুর রয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ এই লোকগুলি নিরূপণ করবেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে যে সংস্কৃতি রচনা করে চলেছেন সেই সাধারণ সংস্কৃতি-ই অ-হিন্দু সংস্কৃতিগুলিকে গ্রাস করবে। এই উপলব্ধি এবং ভীতি কট্টর মুসলমান ও কট্টর শিখের মধ্যে যতটা স্পষ্ট অন্য মানুষের মধ্যে অতটা নয়। আধুনিক মনের হিন্দু মানুষ এই ভীতিটাকে আদপেই বুঝতে পারছেন না।

বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, দ্রুত শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা সাম্প্রদায়িকতার রূপ নিচ্ছে। অন্ততঃ এটি সাম্প্রতিক-কালের সাম্প্রদায়িকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ। ভারতবর্ষের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে এই সাংস্কৃতিক বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী বলেই ভাবা যেতে পারে।

ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে স্বকীয় মর্যাদায় রক্ষা করাই এই বিপদের প্রতিকার। এই কাজ কোন একজন রাজনৈতিক নেতার নয়। এই কাজ রাজনীতি দিয়ে হবার নয়। রাজনীতি সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে, এইমাত্র। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে এই ভার নিতে হবে। আমাদেরই বুঝতে হবে নিকট-প্রতিবেশী কেন বিপন্ন বোধ করেন। সাম্প্রদায়িকতা আসলে একটি মানসিকতা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ যখন বিশেষ বিশেষ ভীতির সৃষ্টি করে তখনই এই ধরণের

মানসিকতা তৈরী হয়। রাজনীতি দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এক ধরনের আশ্বাস দেওয়া চলে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে নির্ভয়, স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরী করা রাজনীতির কাজ নয়।

সমসাময়িক ভারতবর্ষের পরিবেশে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি অন্য সমস্ত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নিচ্ছে, অন্য সমস্ত ধর্ম ও সংস্কৃতি তাদের নিজস্ব অস্তিত্ব হারতে বসেছে, এই ভীতি বর্তমান সাম্প্রদায়িক মেজাজের একটি ভিত্তি। ঐতিহাসিকের কর্তব্য এই মানসিকতা বিশ্লেষণ করা; এই মানসিকতার ঐতিহাসিক সত্য ব্যাখ্যা করা। সেই সঙ্গে এই সত্যও তুলে ধরা যে হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক শক্তি আজ সীমিত, নিঃশেষিত বললেও ভুল হয় না। হিন্দুধর্মকে যারা রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করতে চাইছেন ভারতের রাজনীতিতে তাদের ক্ষমতা সামান্য। গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার পুরানো সমস্যার নতুন চেহারা তৈরী করেছে। স্থানীয় সংস্কৃতির জন্য লড়াই এখন আর শুধুমাত্র হিন্দু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেহারা নেয় না। সাম্প্রদায়িকতা এখন শুধুমাত্র ধর্মীয় সংস্কৃতি রক্ষার উগ্র প্রচেষ্টা নয়। বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় সমাজ এই মুহূর্তে জাতীয় সংহতির ভয়ে ভীত! ভারতীয় জাতীয়তাকে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। সংহতির মধ্যে কেমন করে বৈচিত্র্যকে রাখা যায় সেই বিচার নতুন করে শুরু হবে। ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণ একদিন যে সমাধান দিয়েছিলেন, সেই সমাধান আজ অবান্তর।

ভারতের জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের ধারার গুরুত্ব

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১

এখন থেকে ঠিক ৯০ বছর আগে পূর্ব ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর বিক্ষোভের ব্যাপক চেহারা দেখে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন ভারতের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ ধনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় চটকল সমিতি (আই. জে. এম. এ.)। ১৮৯৫-এর গোড়ার দিকে চটকল ও সূতাকলে শ্রমিক বিক্ষোভের উৎস তদন্ত করার ও যথাযথ দমনমূলক ব্যবস্থা নেবার জন্য তাঁরা অনুরোধ জানান বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে। তাতে সাড়া দিয়ে তৎকালীন ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ প্র্যাট, ৩২টি চটকল, সূতাকল ও অন্যান্য কারখানা ঘুরে এক গুরুত্বপূর্ণ গোপন রিপোর্ট পেশ করেন।(১) তাতে প্র্যাট ১৮৯৩-র শিবপুর ও হাওড়া চটকল ধর্মঘট, ১৮৯৪-র শ্যামনগর চটকল ধর্মঘট এবং ১৮৯৫-র টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, কামারহাটি চাঁপদানি ও বজবজ চটকলে ধর্মঘট ও জঙ্গী বিক্ষোভের উল্লেখ করেন। সর্বত্রই চটকলের ম্যানেজার ও বাবুরা প্র্যাটকে বলেন যে ক্রমেই শ্রমিকদের মেজাজ "গরম হয়ে উঠছে।"(২)

---

১. পুলিশ সুপারভিসন ইন দি রিভারাইন মিউনিসিপ্যালিটিজ জুডিশিয়াল পুলিশ নং ৬-১১, জানুয়ারি ১৮৯৬, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা—রণজিৎ দাশগুপ্ত : পভার্টি অ্যাণ্ড প্রোটেষ্ট : এ স্টাডি অব ক্যালকাটাজ ওয়ার্কিং ক্লাস অ্যাণ্ড লেবারিং পুওর (১৮৭৫-১৯০০), ১৯৮৩

২. ঐ

এর অল্প কয়েক বছর আগে, বোম্বাইএর শ্রমিকশ্রেণীর বিক্ষোভ সম্বন্ধে তদন্ত করে একটি সরকারি কমিশন ১৯৮২তে লেখে :

"বোম্বাই শহরের প্রতিটি সুতাকলে প্রায়ই শ্রমিক ধর্মঘট হয়। বেশীর ভাগ ধর্মঘটেরই কারণ, মিলমালিকরা শ্রমিকদের না জানিয়ে, তাদের বেতন কাটে মাইনে দেবার দিন। কখনও কখনও এইসব শ্রমিক ধর্মঘট চারদিনেরও বেশী চালু থেকেছে।"(৩)

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা—মিল মালিক ও সরকারি আমলা উভয়েই—প্রথম থেকেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই জাগরণ, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভকে গভীর উদ্বেগের চোখেই দেখেছে। ভারতের শিশু বুর্জোয়া শ্রেণীও এ সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ ছিল না। ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ জামশেদজী টাটা, ১৮৮৮-তেই এক প্রবন্ধে লেখেন : "একথা বুঝতে হবে যে বয়স্ক শ্রমিকরা লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছে এবং শিল্পের বিকাশে শ্রমজীবীদের প্রকৃত পরিস্থিতিও যে তারা বুঝতে শুরু করেছে, তার অস্পষ্ট আভাস তাদের চেতনাতে দেখা যাচ্ছে।"(৪)

আর ১৮৯৫-র ঠিক অর্ধশতাব্দী পরে, ১৯৪৫-৪৬-এ, ভারতের সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী বৈপ্লবিক নেতৃত্বে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য বারবার সাধারণ ধর্মঘট করেছে, বিদ্রোহী নৌসেনার সঙ্গে সৌহার্দ্য জানিয়ে রক্তের রাখীবন্ধন করেছে, ছাত্র ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধোত্তর গণ-অভ্যুত্থান ঘটাতে সাহায্য করেছে। তার বিস্তৃত বর্ণনা এই প্রবন্ধকারের অন্য একাধিক রচনাতেই পাওয়া যাবে।(৫)

১৮৯৫ থেকে ১৯৪৫-৪৬ এই ৫০ বছর, দীর্ঘ, জটিল পথ পরিক্রমা করেছে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের শ্রমিক আন্দোলনও, কখনও মূল ধারার সঙ্গে একত্রে, কখনও স্বতন্ত্রভাবে, কখনও বা মূল ধারার খানিকটা বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে।

---

৩. ভি. বি. কার্ণিক : **ষ্ট্রাইকস ইন ইণ্ডিয়া**, বোম্বে, ১৯৬৭, পৃঃ ৬

৪. মরিস. ডি. মরিস : **দ্য এমারজেন্স অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লেবার ফোর্স ইন ইণ্ডিয়া**, পৃঃ ৫৪

৫. গৌতম চট্টোপাধ্যায় : **দ্য অলমোস্ট রিভল্যুশন**, এস. সি. সরকার ফেলিসিটেশন ভল্যুম, দিল্লী, ১৯৭৬

কিন্তু এটা খুবই দুঃখ ও আশ্চর্যের কথা যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের ধারার অবদান ও গুরুত্ব নিয়ে তেমন কোনও সর্বাঙ্গীন আলোচনা কোনও ইতিহাসবিদ এখন পর্যন্ত করেন নি। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদরা শ্রমিক আন্দোলনের ধারাটি নিয়ে কেন আলোচনা করেন নি, তা সহজেই অনুমেয়। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদরাও এই দিকটি সম্বন্ধে একেবারে নীরব থেকেছেন। মার্কসবাদী নানান মতের ইতিহাসবিদও কৃষক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ নিয়ে যতটা আলোচনা করেছেন, তার এক ভগ্নাংশও তাঁরা আলোচনা করেন নি শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে। তথাকথিত নিম্নবর্গের ইতিহাস আলোচনাই নাকি যাঁদের ধ্যানজ্ঞান, তাঁরাও সযত্নে এড়িয়ে গেছেন ভারতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা—সম্ভবতঃ সেক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে ইতিবাচক মূল্যায়ন করতে হত, তা তাদের পছন্দ নয়।

এদেশের ইতিহাস—আলোচকদের মধ্যে এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সুমিত সরকার, সুকোমল সেন, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, রণজিৎ দাশগুপ্ত প্রমুখ। সুমিত সরকার সঠিকভাবেই লিখছেন "স্বদেশী যুগের সবচেয়ে অবহেলিত, প্রায় বিস্মৃত অধ্যায় হচ্ছে শ্রমিক-বিক্ষোভ সম্পর্কে আলোচনা। এ যুগের দীর্ঘ আলোচনার সময়ে ডঃ রমেশ মজুমদার শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে মাত্র ৬ লাইন লিখেছেন। হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় এক লাইনও লেখেন নি।...এই অবহেলার প্রবণতা থেকে মুক্ত একমাত্র সোভিয়েত ইতিহাস-বিদরা... ।"(৬)

জাতীয় আন্দোলনের প্রথম তিন দশকের নেতৃত্ব, কি নরমপন্থী, কি তথাকথিত চরমপন্থী, কেউই জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক মঞ্চে শ্রমিক-শ্রেণীকে সংগঠিত করার কথা ভাবেন নি। বরঞ্চ শহরে কলকারখানার ও বস্তিবাসী শ্রমজীবীদের বিক্ষোভকে তাঁরা বেশ খানিকটা ভয়ের চোখেই দেখেছেন। টালা-চিৎপুর অঞ্চলে ১৮৯৭-তে প্রধানতঃ মুসলিম শ্রমিক ও বস্তিবাসীদের যে গণবিক্ষোভ দেখা দেয় তার প্রধান লক্ষ্য ছিল পুলিশ ও ইংরেজ রাজপুরুষরা।(৭) তাতে শুধু ব্রিটিশ সরকার ও ইংরেজ বণিককুলই

৬. সুমিত সরকার: দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট ইন বেঙ্গল (১৯০৩-০৮), দিল্লী, ১৯৭৩ পৃঃ ১৮২

সন্ত্রস্ত হয় নি, সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন এমনকি তৎকালীন মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদীরাও। কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত "সঞ্জীবনী" টালার গণবিক্ষোভ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন : "এমন কি সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও কলকাতা অক্ষত ছিল, কিন্তু কলকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাঙ্গামা সেই বিদ্রোহকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। জনসাধারণ কর্তৃক যে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা আগে কখনও দেখা যায় নি···।"(৮)

কোন কোন আধুনিক ইতিহাসবিদ টালা-বিক্ষোভের ধরণের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিবাদী আন্দোলনকে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক চেতনার আত্মপ্রকাশ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং তার স্বরূপ এই বিক্ষোভের পিছনে প্যান-ইসলাম মতবাদ বা হাজি জ্যাকরিয়ার মত ধর্মীয় নেতার প্রভাবকেই বড় করে দেখেছেন।(৯)

এই ধর্মীয় প্রবণতার দিক অবশ্যই শ্রমজীবীদের গোড়ার দিকের বহু গণবিক্ষোভেই ছিল, কিন্তু তার প্রধান জোর পড়েছিল সরকার-বিরোধী, ব্রিটিশ বিরোধিতার উপর, যার জন্য 'ইংলিশম্যান' ও 'সঞ্জীবনী' উভয়েই টালার গণবিক্ষোভকে তুলনা করেছিলেন ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সঙ্গে।

আসলে টালার গণবিক্ষোভ ও শ্রমজীবীদের এই ধরনের প্রথমদিকের বিস্ফোরণগুলির চরিত্র ছিল মিশ্র ও জটিল ধরনের। কলকাতা বা বোম্বাই শহরে ও শহরতলীতে দরিদ্র, দুর্গত জীবনযাপনের, রোগ, ক্ষুধা ও পুলিশী অনাচারের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ বারে বারে ফেটে পড়েছে এবং তার গভীরে থেকেছে, বিদেশী ইংরেজ শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধেও পুঞ্জীভূত ক্রোধ। তারই সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই জড়িয়ে থাকত ধর্মীয় বা জাতপাতের প্রবণতা।

শ্রমিক আন্দোলনের অন্য একজন ইতিহাসবিদ তাই এইসব গণবিক্ষোভের অনেক বেশী সঠিক মূল্যায়ন করে লিখেছেন : "টালা গণবিক্ষোভের জঙ্গী

৭. দি ইংলিশম্যান, ২ জুলাই, ১৮৯৭

৮. সঞ্জীবনী, ৩ জুলাই ১৮৯৭, আর. এন. পি., ১৮৯৭, ১০ জুলাই-এর রিপোর্ট

৯. দীপেশ চক্রবর্তী : কম্যুনাল রায়ট অ্যাণ্ড লেবার, অকেশনাল পেপার নং ১১, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্স, কলকাতা, ১৯৭৬

শ্রমজীবী জনগণের চরিত্র ছিল মিশ্র। একদিকে তারা পুলিশ ও বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, অপরদিকে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল প্যান ইসলামিক মতবাদ…(ভারতের) নবজাত শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এই ধরণের মিশ্র প্রতিক্রিয়া, তৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রায় অনিবার্য ছিল।"(১০)

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদীদের প্রায় কেউই, ঊনিশ শতকের শেষ দশকে, এইসব নিপীড়িত, শোষিত ও বিক্ষুব্ধ শ্রমজীবীদের পক্ষে মত প্রকাশ করেন নি। সামান্য ২|৩ জন ছিলেন এর ব্যতিক্রম, যাঁরা এই যুগেই কলকাতা ও শহরতলীর শ্রমজীবীদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আইনজীবী অশ্বিনী ব্যানার্জীর নাম সর্বাগ্রগণ্য। তাছাড়া শ্রমিক ধর্মঘটের সঙ্গে খানিকটা সহমর্মিতা দেখিয়েছেন সুরেন ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ও পরে অনুশীলন সমিতির কোষাধ্যক্ষ।

১৮৯৯-এ বোম্বাইতে জি. আই. পি. সিগন্যালারস্‌রা ধর্মঘট করলে, তাদের কেন্দ্রীয় সৌহার্দ্য সমিতির প্রধান পুরুষ ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। তিনি কলকাতায় সুরেন ঠাকুরকে চিঠি লেখেন, এই ধর্মঘটের পাশে জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন গড়ে তুলতে। সুরেন ঠাকুর, অশ্বিনী ব্যানার্জিকে চিঠি লেখেন, এই উদ্যমে তাঁকে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে।(১১)

বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময়, জাতীয় আন্দোলনের সমর্থনে বাংলাদেশে শ্রমিকদের বহু ধর্মঘট হয়—হাওড়ার বার্ণ কোম্পানীতে, বাউড়িয়ার চটকলে, ছাপাখানায়, রেলে।(১২) কিন্তু এইসব ধর্মঘটী শ্রমিক ও কর্মচারীদের শতকরা নব্বুই ভাগেরও বেশী ছিলেন বাঙ্গালী। অতএব এইসব ক্ষেত্রে শ্রমিক ও শ্রমজীবীদের শ্রেণীচেতনা থেকে তাঁরা কতটা এই

---

১০. রনজিৎ দাশগুপ্ত: পভার্টি অ্যাণ্ড প্রোটেষ্ট: এ স্টাডি অব ক্যালকাটাজ ওয়ার্কিং ক্লাস অ্যাণ্ড লেবারিং পুওর ১৮৭৫-১৯০০, ১৯৮৩, পৃ. ২৫৪ .

১১. গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরী (সম্পাদিত): সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। কলকাতা, ১৯৭২

১২. সুমিত সরকার: দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (১৯০৩-০৮), পৃ. ১৯২-২৩৮

সর্ব ধর্মঘট করেছিলেন, আর কতটা বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের প্রভাব, তা অবশ্যই বিবেচ্য।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ১৯০৫ থেকে ১৯০৮, স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা বঙ্গদেশেই সবচেয়ে বেশী হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় দাবীর সমর্থনে, শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন রাজনৈতিক পদক্ষেপের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনটি ঘটনা বাংলার বাইরেই ঘটেছিল। পাঞ্জাবে, দুই চরমপন্থী নেতা লাজপৎ রায় ও অজিত সিং-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। তার প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজ সরকার লাজপৎ রায় ও অজিত সিংহকে ভারত থেকে নির্বাসিত করেন। এই প্রচণ্ড দমননীতির প্রতিবাদে ১৯০৭-এ রাওয়ালপিণ্ডির রেল ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের হিন্দু, শিখ ও মুসলিম শ্রমিকরা সমবেতভাবে ধর্মঘট ও হরতাল পালান করে।(১৩)

দক্ষিণ ভারতে চরমপন্থী নেতা সুব্রহ্মণ্য শিব, নিয়মিতভাবে টিউটিকরিনের ইংরেজ মালিকানাধীন সুতাকলগুলি শ্রমিকদের কাছে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রচার করতেন ও ধর্মঘট করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে অচল করে দেবার আহ্বান জানাতেন। ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন, যে পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের মুক্তি আসবে, একমাত্র এই ধরণের বিপ্লবের মাধ্যমেই।(১৪)

সুব্রহ্মণ্য শিব ও চিদাম্বরম পিল্লাইকে সরকার গ্রেপ্তার করলে, ১৯০৮-এর ১১ থেকে ১৩ মার্চ টিউটিকরিন ও তিনেভেলিতে শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট ও গণবিক্ষোভ সংগঠিত হয়।(১৫) শ্রমিকশ্রেণীর এই ধর্মঘট ও সংগ্রামকে অভিনন্দন জানায় কলকাতার "বন্দেমাতরম" পত্রিকা।(১৬)

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে বোম্বাইতে, ১৯০৮-এর জুলাই মাসে ইংরেজ বিচারক কর্তৃক তিলকের ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ ঘোষণা করার পর। ২৩ জুলাই বোম্বাই-এর কয়েক লক্ষ শ্রমিক এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে

---

১৩. বেঙ্গলি ৪ মে, ১৯০৭ এবং সুমিত সরকার : পূর্বোদ্ধৃত, পৃ ২৪৫

১৪. সুমিত সরকার : ঐ

১৫. ঐ

১৬. হরিদাস ও উমা মুখার্জি : শ্রীঅরবিন্দ অ্যাণ্ড দি নিউ থট ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিকস্, ১৯৬৪, পৃ. ২৮৬-৮৮

সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। ২৪ জুলাই পুলিশ শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়। জবাবে লক্ষাধিক শ্রমিক ও বস্তীবাসী গরীব ব্যারিকেড রচনা করে গণ-প্রতিরোধ সংগঠিত করে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় ধর্মঘটের অন্যতম শ্রমিক নেতা গণপৎ গোবিন্দ সহ বহু শ্রমজীবী। ব্যারিকেড সংগ্রামের সময় সংগ্রামী শ্রমিকরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে থাকে ও স্লোগান উঠায়। "তিলক-মহারাজ কি জয়"।(১৭)

ধর্মঘটের তৃতীয় দিনে গুজরাটি ও মারাঠি ভাষাতে ইস্তাহার প্রকাশিত হয়, যাতে লেখা থাকে "জাতির প্রাণ তিলককে যদি বন্দী করা হয়, তবে জাতি কি করে বাঁচবে?" এবং ইস্তাহারের শেষে লেখা থাকে "স্বদেশীর জয় হোক।"(১৮)

বহুদূর থেকে লেনিন, বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর এই গণসংগ্রামকে অভি-নন্দিত করে লিখলেন: "ভারতেও সর্বহারা শ্রেণী সচেতন রাজনৈতিক গণ-সংগ্রামের পথে পা বাড়িয়েছে। তাই, এখন আমি স্থিরনিশ্চিত, যে ভারতে ইংরেজ স্বৈরশাসনের পতন অনিবার্য।"(১৯)

শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব তিলক ব্যতীত অন্য কোনও জাতীয় নেতা সেই যুগে আদৌ উপলব্ধি করতে পারেন নি। শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একটা সক্রিয় মৈত্রী গড়ে উঠলে যে তা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিতে পারে তা ইংরেজ ধনিক শ্রেণীর মুখপত্র বুঝতে পেরেছিল এবং শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিক্ষোভের প্রসারকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার সুপারিশ করেছিল।(২০)

বাংলার জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একমাত্র "নবশক্তি" লিখেছিল: "শ্রমিকশ্রেণী যতদিন না স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগ করতে অগ্রসর হবে, ততদিন বিদেশীর শৃঙ্খল ভাঙ্গা যাবে না। দমননীতির বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদ কি ভাবে করতে হয়, তার পথ দেখাচ্ছেন রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী।

---

১৭. টাইমস অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, ২৫ জুলাই ১৯০৮

১৮. ডি. সি. হোমে: বম্বে ওয়ার্কার্স ফার্স্ট পলিটিক্যাল ষ্ট্রাইক, ১৯০৮, মাসিক নিউ এজ জুন, ১৯৫৩

১৯. ভ. ই. লেনিন: বিশ্ব রাজনীতিতে দাহ্য পদার্থ ৫ আগস্ট, ১৯০৮

২০. পাইওনিয়ার, এলাহাবাদ, ২৭ আগস্ট ১৯০৬

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী কি তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন না ?''(২১)

গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতে স্বরাজের দাবীতে ব্যাপক গণআন্দোলনের যুগ শুরু হলে, শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক আন্দোলন সেখানেও কয়েকটি গুরুত্ব-পূর্ণ ছাপ রাখে। প্রথমতঃ পূর্ণ স্বাধীনতাই যে ভারতের জাতীয় দাবী হওয়া উচিত একথা ১৯২১-এ আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে উত্থাপন করেন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী প্রতিনিধি কমিউনিস্টরাই।(২২) ১৯২৭ মাদ্রাজে কংগ্রেস অধিবেশন বোম্বাই-এর রেলশ্রমিক নেতা কে. এন, যোগলেকর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনলে, জওহরলালের সমর্থনে তা গৃহীত হয়।(২৩)

১৯২৮-এ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের বনেদী নেতৃত্ব ডোমিনিয়ন স্টেটাসকেই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন। সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল ও সংগ্রামপন্থীদের সমর্থিত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সম্বলিত সংশোধনী অল্প ভোটে পরাজিত হল। পরদিন অর্ধলক্ষ সংগঠিত শ্রমিকদের মিছিল কংগ্রেস অধিবেশনে এসে পূর্ণ স্বাধীনতাকেই তাদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করল। কংগ্রেসের সরকারি ইতিহাসবিদ লিখছেন : "কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন ৫০ হাজার শ্রমিকের এক সুশৃঙ্খল মিছিলের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারা দুই ঘন্টার জন্য মণ্ডপ দখল করে, জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করে।"(২৪)

১৯২৭-২৮-এ বোম্বাই, বাংলা ও উত্তর প্রদেশে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত জঙ্গী সাধারণ ধর্মঘট, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক নতুন অস্ত্র দেশবাসীর সামনে হাজির করল। এই যুগের বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রমিক

২১. নবশক্তি, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৭, সুমিত সরকার পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ২৫১

২২. পট্টভি সীতারামাইয়া : হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রথম খণ্ড

২৩, ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিষ্টার, ১৯২৭, ২য় খণ্ড

২৪. সীতারামাইয়া : হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৩২

আন্দোলনের একজন প্রখ্যাত অ-কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদ লিখছেন: "কমিউনিস্টরা ধর্মঘটের নেতৃত্ব দখল করতে পেরেছিল, কারণ তারা শ্রমিকদের মেজাজ ঠিকমত বুঝতে পেরেছিল এবং শ্রমিকদের দাবীর সেরা সমর্থক হিসাবে জোরদার লড়াই করেছিল।…তাড়াহুড়ো করে শ্রমিকদের উপর ধর্মঘট চাপিয়ে দেবার চেষ্টা তারা করে নি। নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা শ্রমিকদের বুঝতে দিল এবং যখন সাধারণ ধর্মঘটের জন্য শ্রমিকদের মন-মেজাজ তৈরী, একমাত্র তখনই তারা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। …তাছাড়া স্বীকার করতেই হবে যে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করত, সম্পূর্ণ নির্ভীক এবং আদর্শের প্রতি গভীর নিষ্ঠাবান ছিল।"(২৫)

এই যুগে শ্রমিক আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করে। ১৯২৮-এর ৩ ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন ভারতে এসে বোম্বাই বন্দরে নামলে, সারা ভারত জুড়ে 'সাইমন ফিরে যাও' বিক্ষোভ হয়। তাতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেয় বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী, সাধারণ ধর্মঘট ও বোম্বাই শহরে ৫০ হাজারের জঙ্গী মিছিল সংগঠিত করে। তাদের রণধ্বনি ছিল: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।(২৬)

এর ঠিক এক বছর পরে বার্লিন থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখলেন: "সাম্রাজ্যবাদ নির্ভুলভাবেই তার সবচেয়ে মারাত্মক ও দৃঢ়চেতা শত্রুকে চিনতে পেরেছে—সেই শত্রু ভারতের সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী।"(২৭)

সাম্রাজ্যবাদী প্রধান, বড়লাট আরউইনও কেন্দ্রীয় লাট-পরিষদে বক্তৃতায় বল্লেন: "কিছুদিন ধরে ভারতে কমিউনিজমের অস্বস্তিকর প্রভাব, আমাদের সরকারের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।"(২৮)

ভারতে আবার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার আগেই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করা, ব্রিটিশ সরকার তার প্রথম কর্তব্য বলে বেছে নিয়েছিল। ১৯২৯-এর সূচনাতেই বড়লাট আরউইন, ভারত সচিবকে লণ্ডনে এক গোপন তারবার্তায় লিখলেন "ভারতের পরিস্থিতি

---

২৫. ভি. বি. কার্নিক: **ষ্ট্রাইকস্ ইন ইণ্ডিয়া** পৃঃ ১৯২-৯৩

২৬. **টাইমস অব ইণ্ডিয়া**, বোম্বাই, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

২৭. **ইনপ্রেকর**, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯

২৮. **কেন্দ্রীয় আইন সভার বিবরণী** ২৮ জানুয়ারি, ১৯২৯

যথেষ্ট বাঁ দিকে মোড় নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে বড়রকমের গোলমালের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।"(২৯)

এর ঠিক একমাস পরে, ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব হেগ, সমস্ত প্রাদেশিক সরকারের কাছে এক জরুরী নির্দেশ পাঠালেন : "ভারতীয় বিপ্লবীরা ও কমিউনিস্টরা হাত মেলাতে চলেছে। খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এইসব চরমপন্থীদের শক্তি বেশী বাড়তে দেওয়া মোটেই উচিত নয়।"(৩০)

ভারতে ইংরেজ গোয়েন্দা প্রধান ইসমঙ্গার সুপরিশ করলেন যে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা করা হোক। এই মামলার উদ্দেশ্য হবে "পার্টির সংগঠনকে ভেঙ্গে চুরমার করা, নেতাদের গ্রেপ্তার করা…"(৩১)

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে একথাও স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণআইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবার পর যদি শ্রমিকশ্রেণী কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিশেষতঃ রেলে সাধারণ ধর্মঘট করত, তাহলে ভারতে ইংরেজ শাসন ভেঙ্গে পড়ার মুখোমুখি এসে দাঁড়াত। তাই তার আগেই সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ববিহীন করা দরকার। প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যেই শুরু করা হয় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৯-এর ২০ মার্চ।

তৎকালীন জাতীয় আন্দোলন, সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের এই আক্রমণের তাৎপর্য ধরতে না পারলেও, তা খানিকটা ধরা পড়েছিল জওহরলাল নেহরুর চেতনাতে। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতা ওয়াল্টার সিদ্রিনকে পাঠানো তারবার্তাতে জওহরলাল লেখেন : "আমি একথা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে মীরাট মামলাকে ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলবে না। সরকার সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের উপর যে আক্রমণ শুরু করেছে, এটা তারই অংশ। একথা ঘোষণা করেছে নিখিল ভারত

২৯. গোপন তার নং ২৫৫৫, ১৯ জানুয়ারী ১৯২৯ ফাইল নং ১৮৪/২৯, ইণ্ডিয়া অফিস পাঠাগার, লণ্ডন

৩০. হেগের চিঠি ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯, ফাইল নং ১৮৪/২৯, ইণ্ডিয়া অফিস পাঠাগার, লণ্ডন

৩১. ইসমঙ্গারের মেমোরাণ্ডাম, ১৭ জানুয়ারি ১৯২৯, হ্যালিফ্যাক্স পেপার্স, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১১

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যকরী সভা। একথা মানতে বাধ্য হয়েছে এমনকি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও।"(৩২)

অথচ খুবই আশ্চর্যের কথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রায় কোনও ইতিহাসবিদই ১৯২৯-৩০'এ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে, বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর এই ভূমিকা এবং তার শক্তি খর্ব করে জাতীয় আন্দোলনকে আঘাত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কোনও গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

সংগ্রামের পদ্ধতির (Forms of Struggle) ব্যাপারেও এই সময়ে শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় আন্দোলনে নতুন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে আসে। ১৯৩০-এর এপ্রিল মাসে কলকাতায় কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান গাড়োয়ানদের ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট হয়। চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা রাজপথে ব্যারিকেড রচনা করে সংগ্রাম করে। সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ খানিকটা আপস করতে বাধ্য হয়, যদিও তারপর ধর্মঘটের নেতা আবদুল মোমিন, বঙ্কিম মুখার্জী প্রভৃতিকে তারা গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ড দেয়।(৩৩)

তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে। ১৯৩০-এর মে মাসে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পর, শোলাপুরের রেল ও সুতাকল শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট ও গণউত্থান সংগঠিত করে চার দিনের জন্য শহরে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়। পরে বোম্বাই থেকে বিরাট ইংরেজ ফৌজ এসে রক্তের স্রোতে শোলাপুর শ্রমিক বিদ্রোহকে দমন করে।(৩৪) গণউত্থানের চারজন নেতার ফাঁসী হয়, গুলি করে হত্যা করা হয় বহু শ্রমিককে, কিন্তু শোলাপুর সারা ভারতের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের কাছে এক নতুন প্রেরণাস্থল হয়ে দাঁড়ায়।(৩৫)

---

৩২. সি. এইচ. ফিলিপস (সম্পাদিত): দ্য ইভল্যুশন অব ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান, লণ্ডন, ১৯৬৫ পৃঃ ২৬০

৩৩. স্টেটস্‌ম্যান কলকাতা, ৫ এপ্রিল, ১৯৩০ এবং আবদুল মোমিন: কলকাতার গাড়োয়ান ধর্মঘটের চারদিন (১-৪ এপ্রিল ১৯৩০), ১৯৮০

৩৪. টাইমস অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, ১৩ মে ১৯৩০

৩৫. চ্যালেঞ্জ, দিল্লী, ১৯৮৪, পৃঃ ৩৫৪-৩৫৯

তবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে ঐতিহাসিক অবদান ঘটে স্বাধীনতা সংগ্রামের একেবারে শেষ পর্বে—১৯৪৫-৪৬-এ। সমগ্র পূর্ব এশিয়াতে সশস্ত্র গণসংগ্রামের পথে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটেছিলেন ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া ও বর্মার জনগণ। ভারতের জনগণও সেই পথে পা বাড়িয়েছিলেন। ১৯৪৫-এর ২১ নভেম্বর কলকাতার গণবিস্ফোরণের মাধ্যমে তার সূচনা হয়, আর ১৯৪৬-এর ১৮ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি নৌবিদ্রোহের মাধ্যমে তার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা দেয়।

কলকাতা, বোম্বাই, লাহোর, কানপুর, দিল্লী, মাদ্রাজ, সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণী সাধারণ ধর্মঘটদের সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের সঙ্গে ব্যারিকেডের সংগ্রাম করে, ইংরেজ শাসনকে অচল করে দেয়।(৩৬) বোম্বাই-এর রক্তাক্ত সাধারণ ধর্মঘটে শহীদ হন তিন শতাধিক শ্রমিক।(৩৭) ভারতে তৎকালীন ইংরেজ সর্বাধিনায়ক অচিনলেক, লণ্ডনে মন্ত্রীসভাকে জরুরী গোপন পত্রে জানান (১ ডিসেম্বর ১৯৪৫) যে ভারতে শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট ও সেনাবাহিনীর বিক্ষোভে যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে হয় বিরাট ইংরেজ সেনাদল দিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে হবে, নয়তো এখনই ভারতের জাতীয় নেতাদের সঙ্গে আপস করত হবে।(৩৮)

নৌবিদ্রোহের সমর্থনে ভারতব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘটের পরদিনই, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমে অ্যাটলি, ভারতে পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণাটি করলেন।(৩৯) এটা নিশ্চয় কাকতালীয় নয়। আরও তিনদিন পরে প্রধান সেনানী অচিনলেক, অ্যাটলিকে গোপন সতর্কবাণী পাঠালেন : "সমগ্র ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট দেশব্যাপী গণবিদ্রোহের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হতে পারে।"(৪০)

---

৩৬. **অমৃত বাজার পত্রিকা**, কলকাতা ২২ ও ২৩ নভেম্বর ১৯৪৫ এবং ১২, ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

৩৭. **টাইমস অব ইণ্ডিয়া** বোম্বাই, ১৯-২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

৩৮. **ট্রান্সফার অব পাওয়ার**, ষষ্ঠ খণ্ড, (১৯৪৫-৪৬) ২৫৬ নং ডকুমেণ্ট

৩৯. **স্টেটসম্যান**, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬

৪০. **ট্রান্সফার অব পাওয়ার**, ষষ্ঠ খণ্ড, ৪৫৮ নং ডকুমেণ্ট

এসব দলিলপত্রই গত এক দশকের উপর সমস্ত ইতিহাস গবেষক ও লেখক-দের জানা আছে। তথাপি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষপর্বে শ্রমিক-শ্রেণীর ও সশস্ত্র বাহিনীর বৈপ্লবিক ভূমিকাকে তাঁরা অবহেলাই করেছেন। এ কাজ সজ্ঞানেই করা হয়েছে। অথচ তাতে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের মূল্যায়ন হয় নি।

১৯৫৪তে ভারতের একজন প্রথম সারির কমিউনিস্ট নেতা এই যুগের সঠিক মূল্যায়ন করে, শ্রমিকশ্রেণী, সশস্ত্র বাহিনী ও মেহনতী জনগণের ভূমিকাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে লিখেছিলেন যে "দেশ যদি এই পর্বে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের আপস পরামর্শ না মেনে ভিন্ন পথে যেত, তাহলে ১৯৪৭-এর পদ্ধতিতে নয়, গুণগত উন্নত পদ্ধতিতে স্বাধীনতা লাভ করত ভারতবর্ষ।"(৪১) জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের এই ধারাটি যথার্থ মূল্যায়নের এখনও অপেক্ষায় আছে।

৪১. ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ: মুখবন্ধ, সুব্রত ব্যানার্জি: দি আর. আই. এন. স্ট্রাইক, ১৯৫৪

প্রসঙ্গ ঃ সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতের ইতিহাস

গৌতম নিয়োগী

'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার চৈত্র ১৩২৬ সংখ্যায় 'ভারত-ইতিহাস-চর্চা' নামক এক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের নানা সম্প্রদায়ের কথা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ইতিহাসে কেমন, সে-কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন ঃ

"এখনো আমাদের মধ্যে ভেদের সমস্যা। এই ভেদ সমাজের ভিতরে থাকাতেই অন্যদেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে কিছুতেই ঠিকমত খাটিতেছে না। আমরা অন্যদেশের নকলে যে-সব পন্থা অবলম্বন করিতেছি, বারম্বার তাহা ব্যর্থ হইতেছে। যাহা হউক আমাদের দেশের এই সামাজিক ইতিহাসের ধারা এখনো আমরা আগাগোড়া অনুসরণ করিয়া দেখি নাই ; অনেকটাই অস্পষ্ট আছে এবং অনেক জায়গাতেই ফাঁক পড়িয়াছে। বিশেষত, যেহেতু আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক এবং ধর্মমূলক সেইজন্যই আমাদের নিজেদের আজন্মকালীন সামাজিক সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস কুয়াশার মতো আমাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সত্যকে নিরপেক্ষভাবে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে বাধা দিতেছে।"(১)

অর্থাৎ ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে সামাজিক সংস্কার এবং ধর্ম মানুষের জীবনচর্চার সঙ্গে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যুগের পর যুগ চলে এসেছে এবং যে দেশে ধর্ম, ভাষা, বর্ণের বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতা ব্যাপক. সেখানে আজন্মলালিত বিশ্বাস দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে ইতিহাসকে দেখার চেষ্টা করলে ইতিহাসের সত্যরূপ দেখা খুবই কঠিন, এ-কথা বুঝেছিলেন ভারত-ইতিহাসে অভিজ্ঞ অসাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথ। নিজ ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা সম্প্রদায়ের প্রতি অন্ধভাবে স্বার্থমগ্ন হওয়ায় যে ধরণের জীবনবিমুখতা ফুটে ওঠে এবং যার ফলে অপরাপর মানবগোষ্ঠীর প্রতি যে উপেক্ষা, বিদ্বেষ এবং সংঘাত সৃষ্টি হয়, তাই যদি সাম্প্রদায়িকতার সহজ সংজ্ঞা হয় তবে সেই মনোভাব মনের সহজ যুক্তিকে টলিয়ে দিয়ে বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে। ফলে দেখা এবং দেখানোর কাজ হয় একদেশদর্শী। ভারত-ইতিহাসের অনুশীলনে

সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা যে ধরণের বাধা ও সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি করে তা স্পষ্ট ক'রে তোলাই ঐতিহাসিকদের কাজ। নতুবা ইতিহাস অধ্যয়ন ও ইতিহাসবোধ বিকৃত হতে বাধ্য : এই কাজ একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের স্তর থেকে গবেষণামূলক রচনার উচ্চক্ষেত্রে পর্যন্ত সর্বত্র ব্যাপ্ত করতে পারলেই জাতীয় সংহতির পথ সুদৃঢ় হবে।

এ-কথা বলার অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষের মতো বহু জাতির, বহু ধর্মের, ভাষার ও বর্ণের ভিন্নতা যেখানে রয়েছে সেখানে বিরোধ এবং সংঘাত কখনোই ছিল না, এবং সেই সংঘাতের অবিকল প্রতিভাস এড়িয়ে যাওয়াই ঐতিহাসিকের কাজ। কিন্তু তখনই মনে প্রশ্ন জাগে যখন দেখি আমাদের দেশের বহু নামী ঐতিহাসিকেরা বিরোধকে সর্বদা সংঘাত হিসেবেই ধরেছেন অথবা বিরোধের ছবির পাশাপাশি, বিরোধের মধ্য দিয়ে মিলনের যে চেষ্টা ভারতবর্ষ আবহমানকাল করে এসেছে, সে-দিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দেন নি। তাই যেন অসংলগ্ন ভাবচ্ছবির ঘনঘটা, যা আমাদের মনকে পীড়িত করে। আমি যে সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত হই না কেন শুধু তার প্রতি অন্ধ আনুগত্যে যদি অতীতের মিলন ও বিরোধ খোলা মনে না দেখি তাহলে ভবিষ্যতে মানবজাতির সঠিক বিকাশ সম্ভব কি? 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' শীর্ষক বিখ্যাত রচনায় রবীন্দ্রনাথ এই সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন :

"এমনি করিয়া দুই ধাক্কার মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়—এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।"(২)

ইতিহাস এমন একটি বিষয় যার গুরুত্ব জাতীয় জীবনে অপরিসীম এবং যে-কোন আধুনিক এবং অগ্রসর জাতির শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ। আমাদের দেশেও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার সময় থেকেই অদ্যাবধি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষা-পাঠক্রমের আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে রাখা হয়েছে ইতিহাসকে। উচ্চ-শিক্ষায় যে কেউ পদার্থবিদ্যা কিংবা অর্থনীতি, বাণিজ্যবিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্র, কারিগরি বিদ্যা কিংবা দর্শন যে-কোনো

বিষয়ই কেউ বেছে নিতে পারেন। কিন্তু প্রাথমিক বুনিয়াদী স্তরে ভাষা বা গাণিতিক জ্ঞানের মতোই ইতিহাসের কিছু জ্ঞান আবশ্যিক। কেননা দেশ, জাতি তথা মানব সভ্যতার অতীত সম্বন্ধে না জানলে বর্তমানকে বোঝা যায় না বলেই হয়তো ইতিহাসকে পঠন-পাঠনের অন্তর্গত করতে হয়। 'জ্ঞান' শব্দটি এখানে সহজ এবং সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কারণ বিদ্যালয়ের পরিসীমায় আমরা ইতিহাস পাঠে যা লাভ করি তা অতীত দিনের ইতিকাহিনী মাত্র। তবে এই ধারণাগুলি মনের গভীরে অল্পদিনের মধ্যেই এমনভাবে গেড়ে বসে যে পরবর্তীকালে আমাদের ব্যক্তিচরিত্র এবং সামাজিক ব্যবহারে তার প্রতিফলন দেখা যায়। যাঁরা মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে, সাম্মানিক এবং সাধারণ স্নাতক ক্লাসে এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইতিহাস পড়েন তাদের পূর্ববর্তী ধারণাগুলির কিছু কিছু অবসান হয়, অন্যদিকে আবার কিছু কিছু ধারনা বদ্ধমূল হয়ে গেড়ে বসে। ফলে দুটি জিনিষ প্রায়ই ঘটে— প্রথমত এইসব প্রচলিত ধারনার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই আমরা ক্ষেপে যাই, মানতে চাই না, এমনকি যদি কেউ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন তবু। দ্বিতীয়ত ইতিহাসের শিক্ষার ফলেই কোন ব্যক্তি, জাতি, দেশ বা সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমরা কখনো অকারণে বিদ্বেষভাব পোষণ করতে শিখি বা অযথা স্তুতি-প্রশংসা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি।

সচেতন দায়িত্ববোধ, সত্যবাদিতা এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী তাই অতীতের কথা বিশ্লেষণ করার সময় ইতিহাসবেত্তাদের জরুরী আদর্শ। কেননা তাদের ইতিহাস রচনার ফলে উদ্ভূত গ্রন্থ পাঠ করেই এবং শিক্ষার নানাস্তরে শিক্ষক মশাইরা সেই রচনাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেন তার উপরে নির্ভর করেই আপামর জনসাধারণের পূর্বোক্ত ধারণাগুলি তৈরী হয়। ভারত তথা পৃথিবীর যে-কোনো দেশের ইতিহাসের অনুশীলনে তাই প্রত্যেকের সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ যেহেতু ঐতিহাসিকরা মানুষ তাই মানবিক দুর্বলতায়, কখনো অজ্ঞতায়, কখনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই, তাঁরা সত্যবাদিতার এবং নিরপেক্ষতার পথে নাও যেতে পারেন। ফলে তাদের সিদ্ধান্ত আমরা বিচার না করে গ্রহণ যদি সর্বদাই করি, তাহলে শুধু নিজেরাই অশিক্ষিত থাকব তাই নয়, সামাজিক জীবনেও বিপদ ডেকে আনব। যেমন ধর্মীয় বা অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর কথাই ধরা যাক। এর শিকার হলে ইতিহাস রচনা যেমন বিকৃত হতে বাধ্য তেমনি সেই ইতিহাস অধ্যয়ন

এবং তার পাঠগ্রহণ আমাদের রুচি, শিক্ষা ও বোধকে সংকীর্ণ করতে বাধ্য।

কয়েক বছর আগে পুণার এক ঐতিহাসিক শিবাজী এবং মারাঠা জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে এক বই লিখেছিলেন যা হয়তো অনেকের মনের বদ্ধমূল ধারণার সঙ্গে মেলে নি, তাই গ্রন্থপ্রকাশের একমাসের মধ্যেই আমাদের গণতান্ত্রিক এবং তথাকথিত বাক্-স্বাধীনতার দেশে লেখকের বাড়ীতে ক্রমাগত ইট-পাথর বৃষ্টি শুরু হয়। অবশেষে মহারাষ্ট্র পুলিশ এসে তাঁকে জেলে নিয়ে গিয়ে এই যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি দেয়।(৩) ইতিহাসের পঠন-পাঠনের ফলে উদ্ভূত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ওইরূপ। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বই লিখে এক বাঙালি ঐতিহাসিককে ঘর-ছাড়া হতে হয়েছিলো তা অনেকেই জানেন।(৪) অন্যদিকে দেখুন, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক এবং ভারতে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার অন্যতম পথিকৃৎ ডঃ ইরফান হাবিবকে সম্প্রতি যে তাঁর নিজের বিশ্ববিদ্যালয়েই হেনস্থা করা হয়েছে তার কারণ তিনি নাকি যথেষ্ট 'ইসলামসম্মতভাবে' ইতিহাস রচনা করেন নি। এই হল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার রূপ। যে সাম্প্রদায়িকতা আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং তার নগ্ন আত্মপ্রকাশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে ঠেলে দেয়, তা কিন্তু অনেকটা তৈরী হয় ইতিহাস পাঠের মধ্যে দিয়ে। শুধু ধর্মীয় নয়, অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সমস্যাও আছে। কয়েক বছর আগেই এক ওড়িয়া ঐতিহাসিক দাবী করেছেন যে গৌতম বুদ্ধ উড়িষ্যা-জাত অর্থাৎ উৎকলবাদী ছিলেন।(৫) 'কালিদাস কি বাঙালি ছিলেন' কিংবা 'তাজমহল হিন্দুর কীর্তি' ইত্যাদি হাস্যকর দাবীর পিছনেও যাচ্ছে স্পষ্ট এক ধরণের প্রাদেশিক ও ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতা।

আসলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং আদর্শ যে-সব কারণে দানা বাঁধে এবং ক্রমে বদ্ধমূল হয় তার মধ্যে ইতিহাস রচনা এবং পাঠ অন্যতম প্রধান। সম্প্রতি প্রকাশিত এক বইতে অধ্যাপক বিপান চন্দ্র এ-বিষয়ে যথার্থই বলেছেন :

"The teaching of Indian history in schools and colleges contributed in a major way to the growth of communal feeling. For generations, almost from the beginning of the modern school system, communal interpretations of Indian history of

varying degrees of virulence at different levels were propagated, first by imperialist writers and then by others. So deep and widespread was the penetration of the communal view of history that even sturdy nationalists accepted, however, unconsciously, some of its basic digits which come to be seen as basic 'truths' of Indian history."(৬)

ভারতের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটি জটিল এবং তার সবিস্তার আলোচনা বর্তমানে সম্ভব নয়। আমি ভারত-ইতিহাস-চর্চায় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী যেভাবে আমাদের প্রকৃত ইতিহাস বিচারে বিকৃতি ঘটায় বলে আমার মনে হয়েছে, সে-বিষয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাইছি এই আলোচনায়। এইসব প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটির ইতিবাচক উত্তর দেওয়া এই মুহূর্তে আমার অভিপ্রায় নয়, কারণ বিষয়টি গভীর অনুসন্ধানসাপেক্ষ। আমি ইতিহাসানুরাগী সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিষয়টি তুলে ধরছি। তবে সুখের বিষয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং নির্মোহ মন নিয়ে বেশ কিছু আধুনিক ঐতিহাসিক এ-বিষয়ে আমার ভাবনায় সাহায্য করেছেন। বিশেষত বিপান চন্দ্র, হরবনস্ মুখিয়া, রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিব, ইকতিদার আলমখান, সতীশ চন্দ্র, আতাহার আলি এবং মুশিরুল হাসানের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনটি প্রবন্ধের কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন, যেখানে হরবনস মুখিয়া, পূরণচাঁদ যোশী এবং সতীশ সাবেরওয়াল ভারত-ইতিহাস চর্চায় সাম্প্রদায়িকতার কুফল সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।(৭) আর রোমিলা থাপার, হরবনস মুখিয়া এবং বিপানচন্দ্র একত্রিতভাবে বেতার ভাষণের অনতিদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয় অবতারণা করেছিলেন, তাই পরে Communalism and the writing of Indian history নামে প্রকাশ করেন নতুন দিল্লীর পিপলস পাবলিশিং হাউস ; এটি যে কোনো ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে অবশ্য পাঠ্য।

সুখের বিষয় গত তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে আমাদের দেশে ধর্ম-নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছে যদিও তার ফলে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলির, এবং কখনো কখনো সরকারী রোষবহ্নি তাদের উপর পড়েছে। তবু কিছু সমালোচনা, সরকারী নিষেধাজ্ঞা, রক্ষণশীলদের হৈ-চৈ, ধর্মান্ধদের হুঙ্কার এসব উপেক্ষা করেই সামগ্রিক স্বার্থে

ভারত-ইতিহাস-চর্চায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ মুক্ত করা প্রয়োজন, একথা বর্তমান ভারতের পেশাদার ঐতিহাসিকগণ বুঝেছেন। ১৯৭৭ সনে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৩৮তম অধিবেশনের বাৎসরিক কার্যনির্বাহী সভায় (২৮ ডিসেম্বর) একটি প্রস্তাব হয়, তার অংশবিশেষ এরকম :

"The Indian History Congress, meeting at Bhubaneswar for its thirty-eight session, reaffirms the commitment of Indian historians to the scientific and secular approach to the study of history. This Congress believes that it is indefensible to use history for conveying communal, caste and racial prejudices.(৮)

আজও ভারত-ইতিহাস-চর্চায় সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে খোলা মনে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বিন্দুমাত্র কমে নি। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ঘোষিত আদর্শগুলির মধ্যে নিরপেক্ষ এবং বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চা মাতৃভাষার মাধ্যমে করাই প্রধান।

২

ভারত-ইতিহাস-চর্চায় সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে কিছু প্রশ্ন তোলার আগে সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। বিপান চন্দ্র মনে করেন যে "Simply put, communalism is the belief that because a group of people follow a particular religion they have, as a result, common social, political and economic interests."(৯) অর্থাৎ একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস যেহেতু এক, সুতরাং তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চেতনা এবং স্বার্থও এক। এই ধারণার বশবর্তী হলে মানুষ তাই সবই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে এবং ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস বজায় রেখে সামগ্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সমস্যা দেখতে মানুষ পারে না সাম্প্রদায়িকতার শিকার হলে। ফলে একই সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বা পটভূমিকা থাকা সত্ত্বেও অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ তখন তাদের বিরোধী হিসেবে প্রতিপন্ন হন।

বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে তিনটি উপাদানের মিশ্রণের ফলে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়। এগুলিকে যথাক্রমে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য বা একাত্মবোধ, অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে পার্থক্য এবং অপরিবর্তনীয় স্বাতন্ত্র্য এবং অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তিনজন ঐতিহাসিকের লেখা থেকে তিনটি বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

কেনেথ জোনস্ সাম্প্রদায়িকতাকে "a consciously shared religious heritage which becomes the dominant form of identity for a given segment of society." (সমাজের কোন এক অংশের একাত্মবোধের প্রধানতম মিলনসূত্র হল ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে চেতনা)।(১০) এই identity হল এক ধরণের ধর্মীয় একাত্মবোধ যা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এরই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আচার-ব্যবহার এবং ভাষা। এই আপনধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, বিশ্বাস এবং একাত্মবোধ থেকেই জন্ম নেয় অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে পার্থক্যবোধ। এ-বিষয়ে উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ বলেছেন "Communalism in India may be defined as that ideology which has emphasized as the social, political and economic unit the group of adherants of each religion, and has emphasized the distinction, even antagonism between such groups."(১১) এই পার্থক্যবোধ এবং শত্রুতা একের সঙ্গে অপরের কিংবা এক গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর প্রতি খড়্গহস্ত করে তোলে। এই উন্মাদনায় মানুষ মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে। এই উন্মাদনাকে ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথ তুলনা করেছেন "the functioning of religious communities, or organisations which claim to represent them, in a way which is considered detrimental to the interests of other groups or of the native as a whole."(১২)

সাম্প্রদায়িক চেতনা যে শুধুমাত্র ধর্মীয় আদর্শে এবং সামাজিক আচরণে ভেদপন্থা ও সংঘাতের সৃষ্টি করে তাই নয়, রাজনৈতিক জীবনেও নিয়ে আসে গভীর তমিস্রা। বস্তুতপক্ষে রাজনীতির সঙ্গে বা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক চিন্তার ও কার্যকলাপের যোগ গভীর। প্রভা দীক্ষিত তাঁর "Communalism—A Struggle for power" বইতে তা

সবিস্তারে দেখিয়েছেন।(১৩) রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে গোপালকৃষ্ণ বলেছেন "that peculiarly destructive Indian expression of religion in polities, which emphasizes religious indentity and requires the political society to be organised as a confederation of religious commmunities."(১৪) বিংশ শতাব্দীতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও সাম্প্রদায়িকতা কুৎসিতভাবে রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ যথার্থই বলেছেন "From this period eommunalism has been a serious all-pervading vitiation of Indian affairs, and increasingly so. Psychologically, it is like a habit-forming drug which, so long it is administered, is needed in ever-increasing doses."(১৫) অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক চাপকে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের হাতিয়ার (a mode of political mobilization) করা হয়েছে, সে-কথাও আধুনিক ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন।(১৬) অর্থাৎ একথা বলা যেতে পারে যে সাম্প্রদায়িকতার কালোছায়া সর্বত্র পড়েছে ধর্মীয় মনোভাব এবং সামাজিক আচরণে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে এবং সংস্কৃতিতে।(১৭)

সাম্প্রদায়িক ইতিহাসচর্চা অনেক সময়ই এর প্রত্যেকটির পিছনে প্রতি-নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকে কারণ তা আগুনের শিখার মতোই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পড়েছেও, আমাদের অনেক ইতিহাসগ্রন্থে। এ-বিষয়ে বিপানচন্দ্রের সঙ্গে আমি একমত : "Even more than through the text books, the communal view of history was spread widely through poetry, drama, historical novels and short stories, newspapers and popular magazines, pamphlets and books, and above all, orally through the public platform, class-room teaching and private discussion and conversation,"(১৮)

বিংশ শতাব্দীতে ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে এক ধরণের ধর্মীয় ভাবনা মিশে কখনো কখনো সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ সর্বসম্প্রদায়গ্রাহ্য জাতীয়তা-বাদ সর্বদা সৃষ্টি হয় নি। জাতীয়তাবাদী নেতারা বারবার বলেছেন ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ জাতির সৃষ্টি।

Devide and Rule নীতির প্রয়োজনে। ঔপনিবেশিক শাসনে ব্রিটিশ সরকারের নীতি যে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল তা ঠিকই। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি ব্রিটিশদের হাতে হয় নি, তারা সুযোগকে এবং বিচ্ছিন্নতার সূত্রগুলিকে কাজে লাগিয়েছিলেন সুচতুরভাবে কূটকৌশলে। এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য উক্তি পাই জওহরলাল নেহরুর লেখা এক চিঠিতে।

"Obviously, no one can say that there was not an inherent tendency towards division in India, and with the prospect of the approach of political power, this was likely to grow. It was possible to adopt a policy to tone down this tendency ; it was also possible to accentuate it. The Gov't adopted the latter policy and encouraged in every way fissiparous tendency in the country."(১৯)

কিন্তু তাই বলে কোন আধুনিক লেখক যেভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের নীতিকে হালকা করে দেখেছেন বা জাতীয়তাবাদী যুক্তি বলে সরলীকরণ করেছেন তা আদৌ ঠিক নয়। যেমন গোপালকৃষ্ণ সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেছেন(২) "In the pre-independence period in the theory of communalism most popular with nationalist writers was that communalism was essentially a product of British policy.···This was a nationalist argument, developed, it appears, in retrospect, from the point of view of the contemporary needs of the national movement rather than justified by historical evidence." ডঃ ফ্রানসিস রবিনসন তো আরো এক ধাপ এগিয়ে। তিনি লিখেছেন (সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি প্রসঙ্গে):(২১) "A second proposition is that the British deliberately created division in Indian society for their own imperial purposes...Indian nationalist historians found the argument particularly attractive and accuse their imperial rulers of having broken an evolving synthesis of Hindu-Muslim culture."

ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ এই সমস্যার সৃষ্টি করে নি ঠিকই কিন্তু যে ভয়াবহ মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছিল তা অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না, যার কুৎসিততম রূপ বিংশ শতাব্দীর নানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে এবং যার পরিণতি সাতচল্লিশ সনের ভারত-বিভাগের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি। ধর্মীয় সত্তা যে সামাজিক সত্তারই অন্তর্গত এবং সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই সেই সত্তার বিকাশ। বিভেদের বীজ ওই পরিবেশের মধ্যেই ছিল দেশের মাটিতেই এবং তাকে কাজে লাগিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা এবং সাম্প্রদায়িক শাসকেরা। K. B. Krishna(২২) এবং Beni Prasad(২৩) এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি সঠিক দিকে আকর্ষণ করেছেন। বৈষম্যমূলক সামাজিক ভেদাভেদ, অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে সমাজে বিদ্যমান সেই সমাজে সামাজিক দ্বন্দ্ব থাকা তাই স্বাভাবিক। এবং এই নানাবিধ দ্বন্দ্বে সুবিধাভোগী শ্রেণীর সঙ্গে অধিকারহীন শ্রেণীর দ্বন্দ্বই প্রধান। উভয় শ্রেণীর মধ্যে নানাবিধ সম্প্রদায়ের লোকই থাকতে পারেন এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামকে ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থ তথা সাম্প্রদায়িক রক্ষণশীল নেতৃবর্গ সাম্প্রদায়িক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। এর সঙ্গে আধুনিক ভারতে যুক্ত হয়েছিল চতুর ইংরেজ সরকারের নীতি। K. B. Krishna লিখেছেন : "These stuggles, arising from the social economy of the country, are accelerated in an epoch of the development of Indian capitalism under feudal conditions by British imperialism, by its policy of counterpoise."(২৪) এখানে counterpoise বলতে অগ্রসর সচেতন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত সাধারণ মানুষদের হতাশা, পশ্চাদমুখিতা ও সুযোগের অভাবকে কাজে লাগিয়ে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা (ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য) সৃষ্টিকে বোঝান হয়েছে। আধুনিক লেখকদের মধ্যে Rajani Palme Dutt(২৫) থেকে A. R. Desai(২৬) পর্যন্ত সকলেই মোটামুটি এই যুক্তি মেনে নিয়েছেন। এমনকি, চল্লিশের দশকে যাদের হেয় করা হয়েছিল সেই কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদ্বয় অশোক মেহতা এবং অচ্যুত পট্টবর্ধনও একথা স্বীকার করেছিলেন।(২৭)

যাই হোক, ভারত-ইতিহাস চর্চায় সাম্প্রদায়িকতার আলোচনায় এই প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি প্রয়োজন। কেননা ব্রিটিশ শাসনাধীন উনিশ শতক থেকেই, বিশেষত বিংশ শতাব্দী থেকে, সামাজিক বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক

দ্বন্দ্বকে সুকৌশলে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে। শুধু সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা নন, জাতীয়তাবাদী লেখকরাও এ-ব্যাপারে কম দায়ী ছিলেন না। সে-বিষয়ে পরে আলোচনা করব। ওই সময় থেকে উৎপত্তি হল দেশীয় এক শ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িক লেখকের, যাদের ইন্ধন যোগালেন একদিকে হিন্দু মহাসভা অন্যদিকে মুসলিম লীগ। একদিকেবিনায়ক দামোদর সাভারকর লিখতে শুরু করলেন হিন্দুত্ব (১৯২৩) হিন্দু সংগঠন (১৯৪০) হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন (১৯৪৯), রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের M.S. Golwalkar লিখলেন *We or Nationhood Defined* (১৯৩৯) ; অন্যদিকে আবির্ভাব হল মহম্মদ আলি জিন্নাহ, Z. A. Suleri, F.K.Khan Durrani প্রমুখ মুসলিম সাম্প্রদায়িকদের। ক্রমে "Strategies of various religious groups, especially Hindus and Muslims, and myths, symbols and legends were major parts of the communal ideology, history teaching at various levels was used to create and propagate them, often on parallel communal lines, thus seperating Hindus from Muslims and strengthening the rival communications. The past, interpreted to suit a particular communalism, was also used as its major intellectual justification or legitimation,"(২৮) তবু রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাধান্য ছিল বলেই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ইতিহাসচর্চায় ও গবেষণায় পূর্ণভাবে মন দিতে পারে নি ১৯৪৭ পর্যন্ত। কিন্তু স্বাধীন ভারতে এবং পাকিস্তানে এই প্রবণতা পূর্ণ আকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে—তখন সাভারকর-গোলওয়ালকরের উত্তরাধিকারী হিসেবে দেখা দেন রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত গবেষক,(২৯) জিন্না-সুলেরির আদর্শের ধ্বজাধারী রূপে ইশতিয়াক আমেদ কুরেশির মতো ঐতিহাসিক।(৩০)

ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চায় সাম্প্রদায়িক চেতনা ও মনোভাব কিভাবে ভেদ-পন্থার সৃষ্টি করে সংহতি বিনষ্ট করেছে তা কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিলেন। যেমন মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদের প্রধান নেতা গান্ধী বলেছেন : "Communal harmony could not be permanently established in our country so long as highly distorted versions of history were being taught in her schools and colleges, through

the history text books.''(৩১) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩১ সনে যে Kanpur Riots Enquiry Committee গঠন করেছিলেন তার প্রতিবেদনে বলা হয়:

"We feel that unless the people begin to see the past in a truer perspective it will be very difficult or will-nigh impossible to restore mutual confidence and to arrive at a real and permanent solution of the present differences. We consider, therefore, that an .attempt to remove historical misconceptions in the first and most indispensable step in the real solution of the Hindu-Muslim problem.''(৩২)

দুর্ভাগ্যবশত এরকম কথা বললেও কার্যত ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, বিদ্বেষ এবং দেশভাগ রোধ করতে পারেন নি। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হওয়ার কাজ তো দূরের কথা। ভারতে ইতিহাসচর্চায় সাম্প্রদায়িকতা কিভাবে ক্ষতি করে বা বিকৃত তথ্য ও ব্যাখ্যা মানুষের সরল মনে ঢুকিয়ে শেষ পর্যন্ত মানবসমাজের ক্ষতি করে সে-বিষয়ে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে কিছু প্রগতিশীল ঐতিহাসিক সজাগ হয়েছেন এটাই সুখের কথা।

৩

আমরা এখন সংক্ষেপে ভারত ইতিহাসের রচনায়, গবেষণায়, শিক্ষণে সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব। বরং বলা ভালো কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করব যেগুলি আরও বিশদভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রশ্নগুলি ছাত্রজীবন থেকেই আমার মাথায় এসেছে যদিও সবসময় সদুত্তর পাই নি। তবু ১৯৭৭এর আগে এ বিষয়ে মনোযোগী হতে পারি নি। কেন ১৯৭৭? সে-কথায় পরে আসছি। আগে ভারতেতিহাসের নানা যুগ সম্বন্ধেই কিছু প্রশ্ন আলোচনা করা দরকার।

প্রথমেই এই যুগ বিভাগ প্রসঙ্গ। আজকাল কথাটি তেমন ব্যবহৃত না হলেও এই কিছু দিন আগে পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের ছাত্র-শিক্ষক-পড়ুয়া অনেকেই ভারতের ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করতেন। বলা হত সুবিধার্থে। তিন ভাগ—হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ, ব্রিটিশ যুগ। এই ধরণের বিভাজন যে

কতোটা অনৈতিহাসিক এবং অবৈজ্ঞানিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আগেকার অনেক বইয়ের ছাপা প্রচ্ছদেও এমন লেখা থাকত—'ভারতের ইতিহাস হিন্দুযুগ'। মধ্যযুগকে 'মুসলিম যুগ বা Muslim period' বলা হত আর বেশি। আর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে বলা হত ব্রিটিশ যুগ, লক্ষণীয় যে খ্রীষ্টান যুগ নয়। বলা বাহুল্য ইতিহাসকে সর্বদা প্রাচীন মধ্য আধুনিক এমনভাবেও ভাগ করতে দেখা যায়। এই যুগ বিভাগও বলা হয় সুবিধার্থে তবে তাও পুরোপুরি সঠিক নয় কারণ প্রাচীন থেকে মধ্য বা মধ্য থেকে আধুনিক যুগ হঠাৎ নির্দিষ্ট কোনো তারিখ থেকে শুরু হয় না, দীর্ঘসময় ধরে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যুগলক্ষণ পরিবর্তিত হয়। যাই হোক সুবিধার্থে Ancient, Medieval, Modern তবু চলতে পারে কিন্তু হিন্দু, মুসলিম, ব্রিটিশ যুগ বললেই আমরা অনেকগুলি ধাধাঁয় পড়ে যাব। মনে প্রশ্ন আসে যেসব যুগের সম্বন্ধে এগুলি বলা হচ্ছে তখন কি অন্য ধর্মের কেউ ভারতে ছিল না? যে ধর্মীয় যুগ বলা হচ্ছে তারা কি সারা ভারতে সমানভাবে সক্রিয় ছিল? কেন এরকম করা হয়েছিল তার উত্তর অনেক বড় এবং সে আলোচনার পরিসরও এখানে নেই তবু দুটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ এই বিভাজন সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকেই প্রথম করেছেন সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক লেখকেরা, পরে সেই প্রদর্শিত ভারত-ইতিহাস রচনার পথে হাঁটতে গিয়েই হোঁচট খেয়েছেন অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক। দ্বিতীয়তঃ আরেকটি বড় ব্যাপার এই পূর্বসূরী ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল যে ভারতের ইতিহাস এবং ভারতীয়ের ইতিহাস বোধ হয় এক। তাই তাঁরা রাজার জীবনের বা রাজবংশের কিংবা শাসকশ্রেণীর ইতিহাসকেই দেশের ইতিহাস বলে ধরে নিয়েছেন, যেন রাজন্যবর্গের ধর্মই সমগ্র দেশের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ যেন এজন্যই বলেছিলেন: "ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকি তাহা রাজাদের জীবনবৃত্তান্ত, দেশের ইতিবৃত্ত নহে।"(৩৩) ইতিহাসকে এইভাবে উপরের দিক থেকে দেখার ফলে প্রশ্ন হতে পারে: তাহলে কোন যুগে রাজার বা রাষ্ট্রশক্তির ইতিহাসই কি আপামর জনগণের ইতিহাস? সেই ইতিহাস থেকে কি জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়? মধ্যযুগের ইতিহাস যদি মুসলিম যুগ হয় তাহলে ঐ সময় ভারতে হিন্দুদের ইতিহাস কি মধ্যযুগের ইতিহাস নয়? বা, প্রাচীন যুগের মানেই যদি হয় হিন্দু যুগ তাহলে বৌদ্ধদের ইতিহাস কি প্রাচীন যুগের বাইরে?

বস্তুত ব্রিটিশ জাতির কূটকৌশলে এবং চালে শুধুমাত্র ভারতের রাজনৈতিক নেতারাই জাতীয় আন্দোলনের সময় বারে বারে বিপথে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন নি, সাধারণ সরল ভারতবাসীরাও যে ভেদপন্থার শিকার হয়েছেন তাই নয়, তাদের হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ স্থাপনের কৌশলে অজ্ঞাতে বা জ্ঞাতসারে পা দিয়েছেন অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক লেখকরাও। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর প্রতিভূ লেখকরা একটি আদ্যন্ত ভ্রান্ত এবং অতি সরলীকরণ সূত্র ভারতীয় সভ্যতার ধারা বুঝতে প্রয়োগ করলেন। যেন (a+b) এর মতো ব্যাপার। প্রাচীন ভারতবর্ষকে 'হিন্দুসভ্যতা' আখ্যা দিয়ে বলা হল যে সেই সময় দেশের লোকেরা স্বর্গযুগে বাস করত, রাজনৈতিক থেকে আধ্যাত্মিক সবদিকেই ভারতীয়রা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কে 'মুসলিম সভ্যতা' নাম দিয়ে বলা হল যে এই সময় 'বিদেশী' মুসলমানদের আক্রমণে হিন্দু রাজত্ব যেমন শেষ হয় তেমনি জাতীয় জীবনে শুরু হয় অবক্ষয়—মুসলিম Tyranny বা অত্যাচারের ফলেই সামাজিক থেকে সাংস্কৃতিক সবদিকেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে নেমে আসে অন্ধকার। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ যুগ বা আধুনিক যুগ নাম দিয়ে বলা হল যে এই পর্বে সুসভ্য ইংরেজ এসে মধ্য-যুগীয় অবক্ষয় থেকে আমাদের রক্ষা করল, লেখা-পড়া শিখিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আমাদের আধুনিকতার দ্বারে পৌঁছে দিল। এই চাতুরীতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা সম্ভব হয়েছিল। প্রথমতঃ ঊনিশ শতকের নবজাগরণের যুগে এবং উত্তরকালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে যারা শিক্ষিত (ঘটনাচক্রে যাদের শতকরা নব্বুই জনের বেশি হিন্দু) সেই শ্রেণীর মনে মুসলিম বিদ্বেষ প্রবেশ করান হল। 'বিভেদ কর শাসক কর' নীতি প্রয়োগ করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে জিইয়ে রাখা হল। দ্বিতীয়ত ইংরেজরা যে আমাদের কত বড় বন্ধু সে কথাও বুঝিয়ে দেখাবার চেষ্টা করা হল যে, তাঁরা আমাদের কত উপকার করছে। সে যুগের ভূদেব-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে এ যুগের যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সরলীকৃত তত্ত্বের পথেই পা বাড়ালেন। অথচ এই ভারতবর্ষ কি কারো ইজারা করা সম্পত্তি? ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় নানা জাতি ধর্মের মিশ্রণ কি হয় নি? হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন|শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন'—এ কী শুধু কবির কল্পনা? এই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে মনে হয় না কি

যে ভারতীয় সভ্যতা মানে হিন্দু সভ্যতা বা মুসলিম সভ্যতা নয়, এক মিশ্র সভ্যতা(৩৪) যে অর্থে মুসলমানরা বিদেশী সেই অর্থে বৈদিক আর্যগণও বিদেশী, কারণ উভয়েই ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিলেন। 'হিন্দু' কথাটি তো এসেছে অনেক পরে। আর যাদের 'উপজাতি' আদিবাসী অন্তেবাসী ইত্যাদি বলে আমাদের নীচের তলায় রাখা হয়েছে, তারাই তো ভারত-ইতিহাসের আদি বাসিন্দা। বিদেশী শাসন বলতে প্রকৃত অর্থে বোঝায় ইংরেজশাসন—যখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার শুধু শোষণ এবং মুনাফালাভের সাধের উপনিবেশ তৈরী করেছিল ভারতবর্ষকে। যাঁরা এদেশে 'লীন' হওয়ার কোন ইচ্ছাই কোনদিন দেখায় নি।

তবে প্রচলিত ধারণা যা আমাদের মনে বদ্ধমূল রয়েছে বা ধীরে ধীরে হয়েছে ইতিহাস পাঠে, সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা সাংস্কৃতিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তা কি সহজে যেতে চায়? এই ধরুন যদি বলা যায় প্রাচীন ভারতে আর্যদের অনেকের কাছেই গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল না, তা হলে আজ কি অধিকাংশ হিন্দু তা মানতে রাজী হবেন? প্রাচীন ভারতের যশোগানে যাঁরা মুখর, তাঁরা সেই ইতিহাসের পাঠ নেওয়া সাধারণ শিক্ষিতেরা প্রায়ই খ্রীষ্টান এবং ইসলাম ধর্মকে দোষারোপ করে থাকেন যে এরা যথাক্রমে একহাতে তরবারি অন্যহাতে বাইবেল বা একহাতে কোরাণ অন্যহাতে কৃপাণ নিয়ে দেশ জয় করেছেন, রাজ্যশাসন করেছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের হিন্দু রাজারাও যে অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন এমন প্রমাণ কিন্তু আমাদের হাতে নেই।(৩৫) এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উৎখাত করতেন এবং নিজ ধর্মাবলম্বী শত্রুদেরও বিনাশ করতেন ধর্মের নামেই। ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ-যাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলে আখ্যা দিয়েছেন সেই সমুদ্রগুপ্ত থেকে শুরু করে অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন, দ্বিতীয় পুলকেশী, মহেন্দ্রবর্মা বা অমোঘবর্ষ প্রত্যেকেই বীর হিসেবে বিখ্যাত এবং মানতেই হবে যে তারা ছিলেন বড় যোদ্ধা। শুধু বোঝা মুশকিল তাঁদের রাজনীতিতে অহিংসার স্থান কোথায়? এই রাজন্যবর্গের মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু অশোক যিনি শেষ পর্যন্ত আর হিন্দু ছিলেন না। আসলে হিন্দু সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক ভিত্তির একটি দিক যে বলা হয় অহিংসা তা কিন্তু রাজন্যবর্গের আচরণে প্রতিফলিত নয়। রাষ্ট্রনীতি এবং ধর্মনীতি সমতটেই প্রতিষ্ঠিত এবং তা অহিংসায় এই দাবি করতে পারেন একমাত্র বৌদ্ধগণ। রাজনীতি ও

অহিংসা যদি একসঙ্গে হিন্দু-রাজত্বে নাই চলে তাহলে শুধু ইসলামী বা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বেলায় দোষ? তাই ভাই ভাই দ্বন্দ্ব প্রাচীন ভারতেও দেখা যায়, মধ্যযুগের মতো ব্যাপক না হলেও কিছু পরিমাণে। যেমন কাশ্মীরি ঐতিহাসিক কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে আছে 'দেবোৎপাটনায়ক' নামক এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ যাদের কাজ ছিল হিন্দু মন্দির এবং দেব-মূর্তি ধ্বংস করা।(৫৬) একে নিযুক্ত করেছিলেন কাশ্মীর রাজ হর্ষ (হর্ষবর্ধন নামে বিখ্যাত কনৌজ-অধিপতি নন)। আসলে মুসলমান বাদশাদের হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করার কারণ এটাই একমাত্র নয় যে তারা মুসলমান। হিন্দু, মুসলমান উভয়রাজের ক্ষেত্রেই মন্দির ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ অর্থনৈতিক—মণিমুক্তা সংগ্রহ ও ধনদৌলত লুঠ। সুতরাং রাজ্য জয় বা রাজ্য শাসনের ব্যাপারে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান রাজাদের মধ্যে তফাৎ অল্প, রাজনীতি এবং অর্থনীতিই সেখানে মুখ্য ব্যাপার, ধর্ম নয়।

আঠার শতক থেকে আমাদের দেশে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চার যে ধারা চালু হয় তা শুরু করেন এক ধরণের প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ বা Orientalist এবং ভারততত্ত্ববিদ (Indologist)। জোনস, কোলব্রুক, প্রিন্সেপ বা উইলসনের মতো পণ্ডিতেরা প্রায় সবাই ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সমাজের মাহাত্ম্য কীর্তনে মুখর। এর পর উপযোগিতাবাদী (Utilitarian) এক ধরণের লেখক ভারতীয় সভ্যতার ধারাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে তাদের মতে যা দৈবানুগ্রহ (Providental) সেই ব্রিটিশ সভ্যতার গুণগানে মত্ত হন। কারণ ব্রিটিশের সংস্পর্শে এসে ভারতীয়গণ আধুনিক হতে পারবে। এদের মধ্যে জেমস্ মিল ছিলেন সবচেয়ে উগ্র প্রবক্তা। আর ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা (Nationalist historians) মিল প্রমুখকে সমালোচনা করেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এবং তারপর পূর্বতন প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণের মতোই প্রাচীন ভারতীয়—ততদিনে যা হিন্দুভারত হয়ে গেছে—সেই সভ্যতার মহিমা প্রচার করতে লাগলেন। তখনকার স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বা বলা ভালো প্রথম দিকের হিন্দু জাতীয়তাবাদের সময় এর প্রয়োজন ছিল হয়ত স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করবার জন্য কিন্তু তাতে এক ধরণের হিন্দু সাম্প্র-দায়িকতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা প্রাচীন ভারতকে হিন্দু ভারত বলেই মেনে এলেন। তাছাড়া প্রাচীন ভারতীয় সমাজের দ্বন্দ্ব—সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় কোন

বিশ্লেষণই করলেন না জাতীয়তাবাদী, ব্রিটিশ পদাঙ্ক অনুসরণকারী ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা।

তাই আমাদের মনে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়, যার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। যেমন প্রাচীন ভারত যদি হিন্দু ভারত হয় তাহলে বৌদ্ধ যুগ কোথায় যাবে? শক, কুষাণ, ইন্দো-গ্রীসিয় প্রভৃতি অহিন্দু শাসনের কি হবে? প্রাক্-মুসলমান যুগে কি আদৌ হিন্দু বলে সর্বভারতীয় সম্প্রদায় ছিল? 'হিন্দু' শব্দটি প্রথম কবে ব্যবহার করা হল? এবং কি অর্থে? প্রাচীন ভারতের 'মধ্যদেশ' বা আর্যাবর্তই' কি সম্পূর্ণ ভারত? তা যদি নাই হয় তাহলে বাকী ভারতের রাজবংশগুলি কি ১২০০ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত সবাই হিন্দু না অন্য কোন সম্প্রদায়ভুক্ত? সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চায় এসব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই কিন্তু নিরপেক্ষমনে পড়তে গেলে এগুলি আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না।(৩৭)

আসলে পূর্বনির্ধারিত ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ হিসাবে যা বিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ে পড়ানো হয় সেই ঘটনাগুলির নির্বাচন নিয়ে কোন আলোচনাই হ'ত না, এখনো হয় না। নূতন তথ্য, নূতন গবেষণার রীতি তো দূরের কথা। যেমন একথা আজ প্রমাণিত যে 'বিশুদ্ধ আর্য সংস্কৃতি' বলে কিছু নেই; সিন্ধু সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার থেকে প্রাচীনতর। আর্যদের আদিভূমি সম্ভবত মধ্য এশিয়ার বা দক্ষিণ রাশিয়ার কোনো অঞ্চলে। প্রাচীন ভারতের সাধারণ মানুষদের কথা, তাদের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, অর্থনৈতিক অবস্থা, দলাদলি, তাদের পোষাক, সঙ্গীত, সাহিত্য, পার্থিব আর নানা সমস্যা আলোচনা না করে 'ভারতের মহান আধ্যাত্মিকতার জন্য আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি' ইত্যাদি বাক্য ছাত্রজীবন থেকে কারও মাথায় ঢুকিয়ে লাভ কি? প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ কিংবা প্রশস্তি কোনোটিই যে একমাত্র সঠিক আকর নয় তা সমাজবিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চায় আজ বলে দিতে হয় না। অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার দেখিয়েছেন যে অশোকের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে প্রায় কিছুই যায় না অথচ লিপি এবং বৌদ্ধ সাহিত্য এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উপাদান দেয়। তাছাড়া ডঃ থাপার ঠিকই বলেছেন যে সমাজের উপরতলার মানুষদের লেখা 'সাহিত্যিক উপাদানগুলির' (Literary sources) ফাঁক ভরিয়েছে প্রাচীন যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রত্নতত্ত্ব।(৩৮) প্রাচীন ভারত সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন: যে সমাজব্যবস্থা

বর্ণাশ্রম নামক ভেদনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজমান সেখানে মানবাত্মার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব কি? আর যদি সম্ভব না হয়, তাহলে প্রাচীন ভারত এমন কি সোনার দেশ ছিল?

তাছাড়া প্রাচীন যুগ কবে কিভাবে শেষ হয়ে মধ্যযুগের আরম্ভ হল? এ বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। এক্ষেত্রেও ব্রিটিশ লেখকরা বলে দিয়েছিলেন যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রবেশই যুগ-সন্ধিক্ষণ। তারপর R. D. Banerjee, R. C. Majumder. K. A. Nilkantha Shastri অথবা R. S. Tripathiর মতো মোটামুটি সবাই ওই ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দকেই মধ্যযুগের সূত্রপাত বলে মেনে নিয়েছেন দেখতে পাই। ঠিকই যে তুর্কীশাসনের সূত্রপাতের সময় থেকে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বিশেষত রাজনৈতিক কাঠামো এবং পরিবেশের উপর নূতন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়ে (।) প্রশাসনের এবং ইসলাম ভারতবর্ষে রাজশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দুটি অনেকাংশে বিপরীত-প্রকৃতি-বিশিষ্ট সভ্যতা পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। তবু শুধু রাজনৈতিক ইতিহাসে অধিক মনোযোগী না হয়ে যদি সার্বিক ইতিহাসের দিকে তাকাই তা-হলে কি অন্য ছবি দেখি না? এ বিষয়ে একটি সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন ডঃ রামশরণ শর্মা, তাঁর "Problem of Transition from Ancient to Medieval Indian history" শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন: "Undoubtedly the establishment of the Muslim Turkish rule introduced certain significant changes in the social, economic and political organisation of the country. But most features such as feudal state organisatlon, reversion to closed economy, proliferation of castes, regional identity ln art, script and language, *puja,* bhakti and tantra, which developed in medieval times and continued later, can be traced back to the sixth and seventh centuries. It would then appear that in these two centuries ancient India was coming to an end and medieval India was taking shape".(৩৯)

যাই হোক মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসকেও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী অনেকক্ষেত্রে বিকৃত করেছে, এবার সেই প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে হিন্দু সাম্প্রদায়ি-

কতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা। এক্ষেত্রেও কতকগুলি প্রশ্ন মনে আসে। প্রথমত প্রাচীন ভারতকে যেমন হিন্দু যুগ বলা ঠিক নয়, তেমনি মধ্যযুগের ভারতকেও মুসলিম ভারত বলা ঠিক নয়। প্রাচীন যুগে মৌর্য এবং গুপ্ত শাসন যেমন বলপূর্বক সারা ভারতে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তেমনি মধ্যযুগের শাসনও বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সামরিক শর্তই ছিল তার ভিত্তি। সুতরাং জনগণের ইচ্ছা নয় সামরিক শক্তিই ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস। কখনো কি এই সময়-পরিধিতে দিল্লীর বাদশার কাছে সারাভারত স্বেচ্ছায় মাথায় নত করেছিল। তাই যদি না হবে তাহলে মুসলমান শাসনকর্তা বলেই কি অ-মুসলমানদের ইতিহাসকেও মুসলিম যুগ বলে ধরতে হবে? দ্বিতীয়তঃ মুসলমান শাসনের আরম্ভের কোন নির্দিষ্ট তারিখ ধরা যায় না। যদি বলি, কেন ১২০৬ খৃঃ? ঐ সময় তো সিন্ধু জয় হয়েছিল মাত্র, তা কি সারা ভারত জয় বলা যায়? আর ঐ সময় থেকে মুঘল সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যে বিস্তার তো কয়েক শতাব্দী বছরের ব্যাপ্তি। আক্রমণকারী মুসলমানদের ভারতের এক অংশের অধিকারকে সমগ্র ভারত অধিকার বলা নিশ্চয়ই ভুল, নয় কি? তৃতীয়ত এই তথাকথিত মুসলমান আমলে বিভিন্ন মুসলমানদের কাছে ইসলাম তো একই অর্থ বহন করে নি। গিয়াসুদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজী, আকবর, দারা শুকোহ, ঔরঙ্গজেব, নিজামুদ্দিন আউলিয়া কিংবা কবীর—সবার কাছে ইসলাম কি একই রকম? চতুর্থত বেদান্ত বা উপনিষদ এবং ইসলাম যেহেতু উভয়েই ঘোষণা করেছে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, সুতরাং তাদের মধ্যে মৌলিক মিল যে নেই তা তো নয়। পরবর্তীকালের পৌরানিক হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর সুবিধাবাদ এবং অন্য-দিকে স্বার্থপর মোল্লা উলেমাদের ভুল ব্যাখ্যাই কি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বাড়ায় নি? মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারায় সাম্যবাদ বা ভ্রাতৃত্ব (মিল্লাৎ) দেখা গেছে মাঝে মাঝেই। তার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার সুযোগ এখানে নেই। একথা আমাদের সুন্দর ব্যাখ্যা ক'রে আগে দেখিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন,(৪০), পরে সব চাইতে সবিস্তারে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন।(৪১) সম্প্রতি অধ্যাপক জগদীশনারায়ণ সরকার (৪২) এবং মুহম্মদ আবদুল জলিল।(৪৩) পঞ্চমত এবং সবচাইতে বড়ো কথা এই যে, তথাকথিত মুসলমান আমলে শাসকশ্রেণীর মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব কম ছিল না। একথা সতীশচন্দ্র (৪৪) আতাহার আলি (৪৫) প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ

করেছেন। রাজনৈতিক তথা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অবশ্যই ছিলো মুসলমান শাসক এবং হিন্দু প্রজার মধ্যে কিন্তু সমাজের নীচের তলার হিন্দুপ্রজা ও মুসলমান প্রজার মধ্যে সমাজজীবনে সংঘাত ও সংমিশ্রনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল এক ভারতীয় সংস্কৃতি। মুসলিম সত্যপীর হ'য়ে উঠলেন হিন্দুর সত্যনারায়ণ আর হিন্দুর, বা সঠিকভাবে বলতে গেলে অনার্যের শাঁখা সিদুঁর চলে গেল মুসলমানদের ঘরে। কিন্তু এ-সব কথা ভাবতে গেলে রক্ষণশীল হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের ভালো লাগে না, কারণ মুসলমান আক্রমণ তাদের শুধু শাসন-চ্যুত করে নি, সামাজিক ধর্মীয় নীতির উপরেও আঘাত হেনেছিল বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। অন্যদিকে গোঁড়া মুসলমান সাম্প্রদায়িকরা ভারতবর্ষকে নিজেদের দেশ বলে ভাবতে বা মানতেই পারেন না; নিজেদের কঠোর ব্যক্তিগত আইন পরিবর্তন ক'রে হিন্দু-মুসলিম যৌথ মিশ্র সংস্কৃতিতে তাদের বিশ্বাস নেই। আসলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধও ছিল, আবার মিলনের প্রচেষ্টাও ছিল, সাদায়-কালোয় মেশানো পূর্ণচিত্র কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান কোন সাম্প্রদায়িক লেখকদের কাছেই গ্রহণীয় নয়। তথাকথিত শূদ্র বা হরিজন বলে সমাজের বৃহত্তর অংশকে শোষণ করা, নারীজাতিকে সতীর চিতায়, অশিক্ষায় এবং অন্ধকারময় কুসংস্কারের জগতে ঠেলে তাদের অধিকার হরণ করেছিল হিন্দুরাই, মুসলমানরা নয়, একথা রমেশচন্দ্র মজুমদার যেমন বুঝতে চান না, তেমনি বদায়ুনির মতো ধর্মান্ধ মুসলমানরা সহজেই বলে দেন যে আকবর ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ করেছেন। সাম্প্রতিক এক মুসলমান সাম্প্রদায়িক এমন কুৎসিত মন্তব্য পর্যন্ত করেন 'Pakistan had existed in India for nearly twelve centuries. (৪৬) তা সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যক্তিরা যাই বলুন, ইতিহাসবিদের পক্ষে নিজের মনের মতো তথ্য চয়ন এবং অন্য তথ্য বর্জন চরম অপরাধ নয় কি?

আলাউদ্দিন খলজীর পদ্মিনীকে পাওয়ার কাহিনী বা বিদ্রোহী হিন্দু জমিদারদের দমন উল্লেখ করে কেউ কেউ তাকে 'ধর্মোন্মত্ত' বলে চিহ্নিত করেছেন, তেমনি জানা প্রয়োজন যে স্বয়ং জিয়াউদ্দিন বরণী লিখেছেন যে তিনি ধর্মপ্রাণ মুসলমান ইক্তেদারদের দমন করতেও কম কঠোর ছিলেন না। ডঃ হরবনস মুখিয়া 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী' কেতাব থেকে দেখিয়েছেন যে কাজী মুঘিসউদ্দিন যখন 'সরিয়ত'এর নির্দেশ উল্লেখ করে আলাউদ্দিনকে 'জিজিয়া কর' আদায় করার সময় হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতে বলেন তখন

মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আলাউদ্দিন জবাব দেন : "ওসব শরিয়ত-টরিয়ত বুঝি না, আমার নির্দেশই সবচাইতে বড়ো।" কোনো ধর্মান্ধ মুসলমান শরিয়তকে এভাবে অবজ্ঞা করে কি ?(৪৭) অনেকটা টিউডর অষ্টম হেনরীর মতো মনোভাব—I am both the political and the ecclesiastical head of the state. আমরা সবাই জানি ঔরঙ্গজেব নিষ্ঠাবান গোড়া সুন্নি মুসলমান। তিনি যে বেশ পরিমাণে ধর্মান্ধ ছিলেন সে-বিষয়েও অস্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সেই একই বাদশা যদি কখনো দেখা যায় যে হিন্দু মন্দির নির্মাণে বা সংস্কারে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তাহলে আমাদের অবাক হতে হয়, কারণ প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তা মেশে না। তাছাড়া অধুনা ইতিহাসচর্চায় একথা প্রমাণিত যে ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতাই মুঘল সাম্রাজ্য পতনের প্রধান কারণ নয়, দায়ী অষ্টাদশ শতকের পরিবেশ, শাসকশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, কৃষকশ্রেণীর প্রতিরোধ, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভাঙন, স্থানীয় বা আঞ্চলিক শক্তির উত্থান এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতা।(৪৮) তেমনি একথাও আজ জানা যাচ্ছে যে আকবরের ধর্মনীতি তার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই গৃহীত। রাজনৈতিক প্রয়োজনই রাষ্ট্রনীতির নিয়ামক—সেখানে উদারতা বা ধর্মান্ধতা বড়ো নয়। মুঘল যুগের কৃষকশ্রেণীর অবস্থা, সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য এবং দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে অনেক সংগত প্রশ্ন আজ উত্থাপিত হচ্ছে। সম্রাট আকবর যেমন ধর্মনিরপেক্ষ (secular) কোনো চিন্তার অধিকারী ছিলেন না, কারণ এই তত্ত্বটি (concept) একেবারে আধুনিক, তেমনি একথা প্রমাণ করবার মতো প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের হাতে নেই যে মধ্যযুগে রাষ্ট্র পাইকারী হারে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেছিল।(৪৯) 'জিজিয়া কর' প্রবর্তন করে বহু মুসলমান শাসক নিন্দিত, কিন্তু খুব কম বইতেই লেখা থাকে যে হিন্দুদের যেমন 'জিজিয়া কর' দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল অনেক সময়, তেমনি অনেক সময় মুসলমানদেরও 'জাকৎ' দিতে হত। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে আওরঙ্গজেবের সময় 'জিজিয়া কর' পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছিল ঠিকই তেমনি অন্য ৬৮টি কর উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যা আকবরের সময় বা পূর্ববর্তীযুগে নেওয়া হত।(৫০) প্রচলিত ইতিহাসগ্রন্থে এ-সব কথা বেশি লেখা হয় না। যাদের শূদ্র বলে পেছনে ফেলে রেখে পদদলিত করে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ সেই ব্রাত্যজনেরাই যে আশ্রয় খুঁজত প্রথমে বৌদ্ধধর্মে পরে

মুসলমান সমাজে তা কি অস্বীকার করা যায়? বিশেষত যেখানে জাতের নিপীড়ন নেই উপরন্তু সরকারী দাক্ষিণ্য লাভের আশা আছে।

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যযুগের ইতিহাসকে অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে আমাদের ভুল পথে চালিত করেছিল। প্রথমত 'মুসলিম শাসন'কে প্রায়ই বলা হত বিদেশী শাসন যার কোন যুক্তিই নেই। তারা যে অর্থে বিদেশী বৈদিক আর্যগণও সেই অর্থে বিদেশী। যাঁরা এসে এদেশ আক্রমণ করে অথবা কূটকৌশলে রাজদণ্ড গ্রহণ করে দেশের সম্পদ বিদেশে নিয়ে যেতেন, তাদের শাসনকেই আমরা বিদেশী শাসন বলতে পারি, যেমন ইংরেজ শাসন। অথবা যারা নিছক আক্রমণকারী তাদেরও আমরা চিহ্নিত করতে পারি—যেমন সুলতান মামুদ বা আহমদ শাহ আবদালী। দাস, খলজী, তুঘলক, সৈয়দ, লোদী, এবং মুঘল এরা প্রত্যেকেই ভারতে রাজত্ব করেছেন, বিদেশ থেকে এসেছেন ঠিকই কিন্তু এদেশ থেকে ফিরে যাওয়ার বা মুনাফা এদেশ থেকে বিদেশে পাচার করবার কোন ইচ্ছেই তাদের ছিল না, যেমন ছিল অর্থ-শোষণকারী ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের। মুসলমান শাসকদের বংশধরেরা আজ ভারতেই মিলে গেছেন, যেমন বৈদিক আর্যদের। দ্বিতীয়ত যারা দিল্লীর সুলতানদের বা মুঘল বাদশাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন নিজ স্বার্থে এবং যাঁরা অনেকেই স্থানীয় প্রজাদের কম শোষণ করতেন না, তাঁরা জাতীয় (National) বীর হলেন কিভাবে? যেমন বাঙলার বারভূইঞারা আসলে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী ছাড়া কিছুই নয় কিন্তু তাদের জাতীয় নেতা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের ইতিহাসে, সাহিত্যে, কিংবদন্তিতে। এর পেছনে সাম্প্রদায়িকতা পরিষ্কার—যেহেতু মুঘল সাম্রাজ্যবাদের বা মুসলমানদের বিরুদ্ধতা করেছেন সুতরাং তারা নায়ক বা হিরো। কেন, কোন যুক্তিতে, কোন পরিপ্রেক্ষিতে, তার বিচার নেই। আকবরের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপ কিংবা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে শিবাজীর লড়াই অবশ্যই গৌরবের কারণ তারা আঞ্চলিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, স্বাজাত্যবোধ এবং দেশপ্রেম তাঁদের সন্দেহাতীত, কিন্তু তারা সর্বভারতীয় নেতা নন, দলমত-নিরপেক্ষ নেতাও নন। তৃতীয়ত ইতিহাসের পছন্দমতন ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করেই কিন্তু গড়ে উঠেছে এক শ্রেণীর সাহিত্য, বিশেষত উপন্যাস এবং নাটক, যা কাউকে অযথা খাটো বা অকারণে মহৎ করে সৃষ্টি করেছে, ফলে দীর্ঘদিন ধরে লোকের মনে শৈশবাবধি অনেক অনৈতিহাসিক ধারণা ঢুকে গেছে।

কতকগুলি বিষয়ে সতর্ক হওয়ারও প্রয়োজন আছে। যেমন "শাসক-শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও আপোষ সেযুগের ঐতিহাসিকদের শব্দ-চয়নে প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই শাসকশ্রেণীর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে সামাজিক স্তরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কোন যোগ ছিল না।"(৫১) অনেক সময় আজকালকার ঐতিহাসিকেরা সে-যুগের ঐতিহাসিকদের ব্যবহৃত ভাষা থেকে যা ছিল শাসকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব তাকে পুরো সমাজের দ্বন্দ্ব বলে বুঝে নেবার চেষ্টা করেন। তাছাড়া, দিল্লী সুলতান আমলে কিংবা মুঘল যুগে অনেক সময় প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তিকে বা পরিবারকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক তাকে সমগ্র হিন্দুসমাজকে ধর্মান্তরের চেষ্টা বলে ভুল করেন। ডঃ হরবনস মুখিয়া তাই ঠিকই বলেছেন যে "যখন আমরা ইতিহাসচর্চার ধারা সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে পারব, যখন বিশেষ কোন শাসকশ্রেণীর ইতিহাসমাত্র না পড়ে সমস্ত সমাজের ইতিহাস পর্যা-লোচনা করব, একমাত্র তখনই আমাদের ইতিহাসচেতনা প্রকৃতই এবং যুক্তিযুক্তভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারবে।"(৫২) এই দৃষ্টিতে দেখলে আমরা ধরে নিতে পারি যে মধ্যযুগে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্ম কখনোই রাজনীতির ঊর্ধ্বে ছিল না।

এবার আধুনিক ভারতের কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর যে-সময় আধুনিক ভারতের অন্তর্গত সেখানে সাম্প্রদায়িকতা ইতিহাসচর্চাকে ব্যাহত করেছে এবং বিকৃত করেছে অনেক জটিল এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে। আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাষাগত, জাতিগত এবং প্রাদেশিক সাম্প্রদায়িকতা। যুক্ত হয়েছে আরো একটি ঘৃণ্য জিনিষ—ইতিহাস রচনায় রাজনৈতিক বিশেষ দলীয় বা সরকারী মতের অনুপ্রবেশ। ধর্মীয় ভেদাভেদ শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, হিন্দু-শিখ, হিন্দু-ব্রাহ্ম, হিন্দু-খৃষ্টান নানা দিকে ছড়িয়েছে।

আধুনিক ভারতে কী করে সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব হল এবং তা মারাত্মক আকারে বেড়ে গেল তা এই রচনার মূল উপজীব্য নয়, তবু স্মরণ করা প্রয়োজন যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে সেই সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, যে অর্থে আজকাল আমরা ব্যবহার করি। প্রাচীন ভারতে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় এবং অ-হিন্দু

নানা আদিবাসী ও উপজাতি। তাদের মধ্যে বিরোধ ছিল কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ছিল কিন্তু সর্বস্তরে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। সপ্তদশ শতকে যখন মারাঠা, শিখ, জাঠ প্রভৃতি আঞ্চলিক শক্তির উত্থান দেখা গেল এবং মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে মারাঠা ও শিখদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়, তখনও সামাজিক জীবনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি। এমন কি আওরঙ্গজেবের সময়েও নয়। ঐ সব অভ্যুত্থানের প্রকৃত কারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। যে বিরোধগুলি ছিল তা মূলত শাসকশ্রেণীর, রাষ্ট্রশক্তি গণ-প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে সতেরো-আঠারো শতকে ক্রমবর্ধমান অর্থ-নৈতিক চাপ সহ্য করতে না পেরে শেষে কৃষকবিদ্রোহ দেখা দেওয়ার ফলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে মুনাফা লুণ্ঠনকারী ইংরেজ শাসন ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসবার পর সাধারণ মানুষদের শোষণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং এই অবস্থায় যে-বিরোধ আগেই ছিল তাকে সাম্প্রদায়িক দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। একদিকে চতুর-সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও প্রসার এবং দুইয়ের সংঘর্ষ এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমবর্ধমান। এই যুগ থেকেই ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত নানা সম্প্রদায়ের আলাদা সত্তা (সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক) চিন্তা করতে শুরু করেন। অর্থাৎ কোন বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর সবরকম সত্তাই এক এবং অপর গোষ্ঠীদের বেলায়ও তাই। ফলে নিজ গোষ্ঠীর সবই ভালো, অপর গোষ্ঠীর সবই খারাপ এরকম ধারণা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে সামিল করার জন্য অনেক সময়ই জাতীয়তাবাদী নেতারা ধর্মচেতনায় সুড়সুড়ি দিতেন। এতে তাদের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হলেও সাম্প্রদায়িক সংহতি বিনষ্ট হল। সংহতি এমনিতেই কমে এসেছিল ভারতের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অসাম্য থাকায়—এক সম্প্রদায় শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী করেছে, পাশ্চাত্যের ভাবধারা অনেকাংশে গ্রহণ করেছে, সরকারী চাকরী তথা নানা সুযোগসুবিধা বেশি পাচ্ছে—অন্য সম্প্রদায় তুলনায় সবদিকে পিছিয়ে পড়েছে। এই দুই সম্প্রদায়ের বৈষম্য যেমন দুই মানসিকতার সৃষ্টি করেছে, তেমনি এক

সম্প্রদায়ের বঞ্চনাকে কাজে লাগিয়েছে ইংরেজ শাসন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ঐতিহাসিকগণ এই সাম্প্রদায়িক চিন্তার বাইরে ছিলেন না।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ, যারা আধুনিক যুগের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন, তাঁরা এবং সরকারী আমলা ও প্রশাসক সবাই ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন।(৫৩) তারাই প্রচার করেন ভারতকে হিন্দু, মুসলিম এবং ব্রিটিশ এই তিন যুগে ভাগ করে ইতিহাস পড়তে হবে। দ্বিতীয়ত তারাই দেখান যে ভারত চিরকালই অত্যাচারীদের দ্বারা শাসিত (যেন ব্রিটিশ শাসনও যদি অত্যাচারী হয় তাহলে আর ক্ষতি কি ?) এবং মুসলমানরাও বিদেশী শাসক (যেন বৃটিশরাই প্রথম বিদেশী শাসক নয়)। তৃতীয়ত মধ্যযুগে মুসলমানদের হাতে হিন্দুরা সর্বদাই 'অত্যাচারিত' এই তত্ত্বও তারা প্রচার করেন। এবং চতুর্থতঃ, সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যেটা তা হলো যেহেতু দুই সম্প্রদায়—হিন্দু মুসলমান খড়্গহস্ত এবং পরস্পরের শত্রু (যেন তারা তৃতীয় পক্ষ বা ইংরেজশাসন না থাকলে বিপদে পড়বে)। ভারতীয় সাম্প্রদায়িক লেখকরা ও ঐতিহাসিকেরা অনেকেই এই ধরণের চিন্তার শরিক হলেন। জাতীয়তাবাদী হিন্দু ঐতিহাসিকরা যেমন K. P. Jaysawal, P. N. Banerjee, B. K. Sarkar, D.R, Bhandarkar, U, N, Ghosal কিংবা R. C Majumdar প্রাচীন ভারতের যশোগানে মুখর হলেন, অন্যদিকে মুসলমানরা হলেন আরবী তুর্কীর স্বর্ণযুগের বন্দনায় মুখর, তেমনি তাদের নিজেদের সাম্প্রদায়িক পতনের কারণ ব্যাখ্যায় (Altaf Husain Ali, Syed Tufail Ahmed Mangalori, Z.A. Suleri প্রভৃতির লেখা দ্রষ্টব্য)। বিজ্ঞানসম্মত নিরপেক্ষ ইতিহাসচর্চা শুরু হল না। সমধর্মাবলম্বী সব মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা যে সমান নয়, নানা ব্যক্তির শ্রেণী-স্বার্থ যে আলাদা, শ্রেণী-ঐক্য বা শ্রেণী-বিরোধ দেখা প্রয়োজন, এইসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি।

বিপানচন্দ্র বলেছেন : "ভারতে জাতীয় আন্দোলন যেহেতু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলবিশেষ এবং যেহেতু একটি নতুন ও দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে অনেক হাতড়ানো, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনেক ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে এদের সৃষ্টি হয়েছিল, সেইজন্য এটা অনিবার্য ছিল যে, এদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী অনেক কিছুই থাকবে। সুস্থ ও অসুস্থ, দুধরণের প্রবণতাকে

এরা স্বভাবতই সৃষ্ট ও বর্ধিত করেছিল। যে সময় ভারতের মানুষ জাতীয়তা-বাদের পথ হাতড়ে বার করতে শুরু করেছিলেন তখন পরিবর্ধমান জাতীয় অনুভূতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মাশ্রয়িতা ইত্যাদি অনেক কিছু যে মিশে থাকবে এটাও অবশ্যম্ভাবী। গতিশীল আন্দোলনের নেতৃবর্গ ও তাঁদের উত্তরপুরুষদের অবিরাম কর্তব্য হল নীর থেকে ক্ষীর বেছে নেওয়া।"(৫৪)

দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার পরেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর হয় নি। মারাঠা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিলো তা অকারণে অস্বীকার করেছেন মারাটা ঐতিহাসিক সারদেশাই। বৃদ্ধ বয়সে রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রাথমিক দলিল দস্তাবেজ আদৌ না ঘেঁটে 'আধুনিক ভারত' সম্পর্কে লেখা একাধিক বইতে রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজকে অকারণে অযৌক্তিকভাবে আক্রমণ করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক, তাঁর বহু ঐতিহাসিক গবেষণা আমাদের আজও প্রেরণা দেয়, শিক্ষা দেয়, কিন্তু তাঁর মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ, ব্রাহ্ম বিদ্বেষ যেমন আমাদের পীড়া দেয়, তেমনি অ-বাঙালী বিদ্বেষও সুস্থ মানসিকতার পর্যায়ে পড়ে না। যেমন ডঃ মজুমদার তাঁর *Glimpses of Bengal in the 19th century* গ্রন্থের ১৯৬০ এর সংস্করণের উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন "Dedicated to the Bengal that was, by one who has the misfortune to live in Bengal, that is, while the croaking Ahom frog killed with impunity the dying Bengal elephant and the people and the Government of India merely looked on.' এরপরেও যদি আসামে 'বঙ্গাল খেদা' হয় তার জন্য এই সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা কি দায়ী থাকবেন না? অন্য অনেকগুলি সুলিখিত গ্রন্থের লেখক আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডঃ সর্বপল্লী গোপাল তাঁর '*Nehru: A Political Biography* গ্রন্থে এমন কিছু কথা লিখেছেন যা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তারাচাঁদ বা রমেশচন্দ্র মজুমদার কারো গ্রন্থেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যায় না। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস যেগুলি লিখিত হয়েছে তার কোনটিতে সচেতনভাবে অহিংস আন্দোলনকে বড় করা হচ্ছে; কোথাও বা বিশেষ প্রদেশের ভূমিকাকে বড়ো বা ছোট করা হচ্ছে। আসলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তথা ব্রিটিশবিরোধী নানা ধরণের প্রতিরোধ এবং সংগ্রামের পূর্ণ চিত্র অঙ্কিতই হয় নি। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস' চতুর্থ খণ্ড লিখেছেন যার নাম 'মুক্তি সংগ্রাম', তার মধ্যে বহু যায়গায়

অত্যন্ত নগ্নভাবে সাম্প্রদায়িকতা ফুটে উঠেছে, যা একজন প্রবীন শ্রদ্ধাভাজনের কাছে আমাদের মতো শিক্ষার্থীগণ আশা করে না।

৪

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষে বহু ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হয়েছে যারা ভারত ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে না দেখে সমগ্র বিষয়ের তথা ইতিহাসের পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন সমস্যাকে, তা যে যুগেরই হোক না কেন। ফলে আমরা পেয়েছি অমলেন্দু দে, হোসেনুর রহমান, সালাউ'দ্দিন আমেদ কিংবা রফিউদ্দিন আমেদের মতো অ-সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকদের। সামাজিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ইত্যাদি সব দিক একসঙ্গে আলোচনা করবার সার্বিক দৃষ্টি আমাদের আজ হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত নিরপেক্ষ ইতিহাসচর্চা আজ শুরু হয়েছে এটাই সুখের কথা—এজন্য রোমিলা থাপার, হরবনস্ মুখিয়া, ইরফান হাবিব, বিপান চন্দ্র, সতীশ চন্দ্র, আতাহার আলি, সুমিত সরকার, ইকতিদার আলম খান, রামশরণ শর্মা, বরুণ দে, অমলেন্দু গুহ, রণজিৎ গুহ, কে. এন. পানিক্কর, মুশিরুল হাসান, সৈয়দ নুরুল হাসান, সুনীল সেন প্রমুখ ঐতিহাসিকের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

তবু সাম্প্রদায়িক চেতনা সহজে ইতিহাস পঠন-পাঠনের আওতা ছাড়তে চায় না। বস্তুবাদী ঐতিহাসিকদের মুসলিম সাম্প্রদায়িকরা চট করে ইসলামবিরোধী বলে গালাগালি দেন। হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা অযথা শিখ সম্প্রদায়ের উপর দাঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৭৭ সনে কেন্দ্রে জনতা সরকার ক্ষমতায় এসেই পাঁচটি বইকে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, যেগুলি সম্পূর্ণ সুলিখিত এবং নিরপেক্ষভাবে লেখা। বইগুলি হল—(১) *Ancient India*, লেখক রামশরণ শর্মা (প্রকাশক NCERT) ; (২) *Medieval India*, লেখক রোমিলা থাপার (প্রকাশক NCERT) (৩) *Modern India*, লেখক বিপানচন্দ্র (প্রকাশক NCERT) ; (৪) *Freedom Struggle*, লেখক বিপানচন্দ্র, বিরুণ দে এবং অমলেশ ত্রিপাঠী (প্রকাশক National Book Trust) : (৫) *Communalism and the writing of Indian History.*) লেখকগণ রোমিলা থাপার, হরবনস্ মুখিয়া ও বিপানচন্দ্র (প্রকাশক Peoples Publishing House)। প্রতিটি প্রকাশকই দিল্লীর এবং শেষেরটি ছাড়া বাকী সবই সরকারী পরিচালনাধীন। এই নিষেধাজ্ঞার পিছনে ছিল

একশ্রেণীর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ, যার পেছনে স্পষ্ট ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এবং ভারতীয় জনতা দলের হাত।(৬৫) সৌভাগ্যবশত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হয় নি এবং আজও বিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়স্তরে এই সুলিখিত বইগুলি ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ প্রয়োজন মেটায়।

ভারত ইতিহাস প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার আলোচনায় এবার উপসংহার টানা যাক। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাঁরা ইতিহাস রচনা করবেন তাঁরা ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ভাষা সবকিছু-নিরপেক্ষভাবে লিখবেন, যে লেখা পড়ে ভবিষ্যৎ ভারতবাসীরা বুঝতে পারেন 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' সব জাতি, সব ধর্ম, সব ভাষা মিলে গড়ে উঠেছে এক ভারতীয় সভ্যতা। বিকৃত ইতিহাস পাঠের শিকার হয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাব যেন আমাদের মনে ঢুকে জাতীয় জীবনকে কলুষিত না করে, একথা মুক্ত মন নিয়ে আমাদের চিন্তা করার সময় উপস্থিত। [ভারতবর্ষে নানা ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, পরিধান আছে ঠিকই, কিন্তু যে-কোন মার্কসবাদী ঐতিহাসিকই জানেন, এগুলি সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্কের নিয়ন্ত্রক নয়, সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক সম্পর্ক উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।]

প্রসঙ্গ ও সূত্রনির্দেশ

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারত-ইতিহাসচর্চা, শান্তিনিকেতন, চৈত্র, ১৩২৬। পরবর্তীকালে প্রবোধচন্দ্র সেন এবং পুলিনবিহারী সেন সঙ্কলিত 'ইতিহাস' গ্রন্থের (কলকাতা, ১৩৮৬ সং) অন্তর্ভুক্ত, পৃ ৮১-৮২।

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫৯।

৩ ঔরঙ্গাবাদের অধ্যাপক র‍্যানাডেকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, যদিও পরবর্তীকালে ভারতের নানা প্রান্তের প্রগতিশীল স্বাধীনচিন্তাকামী বুদ্ধিজীবীদের চেষ্টায় তাঁকে পুনরায় স্বপদে বহাল করা হয়।

৪ অমূল্যচন্দ্র সেন লিখিত চৈতন্য-বিষয়ক গ্রন্থটি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ পর্যন্ত করা হয়েছিল।

৫ এই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রয়াত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র

সরকার। তিনি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে (১৯৮০) সভাপতির অভিভাষণে বিষয়টি উল্লেখও করেছিলেন।

৬ বিপানচন্দ্র, কম্যুনালইজম ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া, বিকাশ পাবলিশিং, নিউ দিল্লী, ১৯৮৪, পৃ ২১০।

৭ এইসব লেখকদের নিম্নোক্ত গ্রন্থ|প্রবন্ধ থেকে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি :

Irfan Habib, "The contribution of Historians to the Process of National Integration in India—Medieval Period", *Proceedings,* IHC 1961.

—, "Economic History of the Delhi Sultanate—An Essay in Interpretation", *The Indian Historical Review,* Vol IV, No 2, Jan., 1978.

Bipan Chandra, *Communalism in Modern India,* New Delhi.

Harbans Mukhia, "Communalism : A study in its Socio-Historical perspective", *Social Scientist,* Vol I, No 1, Aug., 1972.

Satis Chandra, *Communal Interpretation of Indian History,* New Delhi, n. d.

—, Jizyah and the state in India during the 17th century", *Journal of the Economic and Social History of the Orient,* Vol VII, Part II 1969.

M. Athar Ali, *The Mughal Nobility under Aurangzeb,* Bombay, 1966.

—, "Causes of the Rathor Rebellin of 1679", *Proceedings,* IHC, 1961.

—,"The Religious Issues in the War of succession", *Medieval India Quarterly,* Vol V, 1963.

Romila Thapar, "Interpretations of Ancient Indian History", in her *Ancient Indian Social History.* New Delhi, 1978.

R, S. Sharma, "Historiopraphy of Ancient Indian Polity upto 1930", in his *Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India,* Delhi, 1968.

Iqtidar Alam Khan, "Mughal Nobility and Akbar's Religious Policy", *Journal of Royal Asiatic Society,* London, 1968,

Mushiul Hasan, *Nationalism and Communal Politics in India,* 1916-1928, New Delhi, 1979,

—(ed.), *Communal and Pan-Islamic Trends in Colonial India,* New Delhi, 1981.

৮ ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সমিতির পক্ষে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ডঃ ইরফান হাবিব এবং তা সমর্থন করেন ডঃ অমলেন্দু গুহ এবং ডঃ আনিস সয়ীদ। দ্রঃ, প্রসিডিংস্ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি কংগ্রেস, থার্টি-এইটথ সেশন, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় (ভুবনেশ্বর), ১৯৭৭, (আলিগড় ১৯৭৮), পৃ ৮১৫।

৯ বিপানচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১।

১০ কেনেথ ডবলিউ জোনস্, "কমিউনালইজম ইন দি পাঞ্জাব", জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিজ, ২৮(১৯৭৮), পৃ ৩৯।

১১ উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, মডার্ন ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া, এ সোসাল অ্যানালিসিস, লণ্ডন, ১৯৪৫, পৃ ১৪৭।

১২ ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথ, ইণ্ডিয়া অ্যাজ এ সেকুলার স্টেট, প্রিন্সটন, ১৯৬৩, পৃ ৪৫৪।

১৩ প্রভা দিক্ষিত, কমিউনালইজম—এ স্ট্রাগল ফর পাওয়ার, ওরিয়েন্ট লংম্যানস্, নতুন দিল্লী, ১৯৭৪।

১৪ গোপাল কৃষ্ণ, "রিলিজিয়ান ইন পলিটিকস্", দ্রঃ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিউ, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৭১, পৃ ৩৯২-৯৩।

১৫ উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৭২।

১৬ জি. আর, থ্রাসবি, হিন্দু-মুসলিম রিলেশসনস্ ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, ই. জে. ব্রিল, লিডেন, ১৯৭৫, পৃ ৭।

১৭ এ. কে. ভকিল, থ্রি ডাইমেনশনস্ অফ হিন্দু-মুসলিম রিলেশনস্, মিনার্ভা অ্যাসোসিয়েট, কলকাতা, ১৯৮১।

১৮ বিপানচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২১১।

১৯ Lord Lothianকে লেখা জওহরলাল নেহরুর পত্র। দ্রঃ নেহরুর, *Selected Works* (সম্পাদনা সর্বপল্লী গোপাল), সপ্তম খণ্ড, পৃ ৭৯-৭০।

২০ গোপাল কৃষ্ণ, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ৩৬৩-৬৪।

২১ ফ্রান্সিস রবিনসন, সেপারেটিজম্ অ্যামংগ ইণ্ডিয়ান মুসলিমস্, নতুন দিল্লী, ১৯৭৫, পৃ ২।

২২ কে. বি. কৃষ্ণ, দ্য প্রবলেম অফ মাইনরিটিস্, লণ্ডন, ১৯৩৯, পৃ ২৯৬, ৫৪৬।

২৩ বেনী প্রসাদ, দ্য হিন্দু মুসলিম কোয়েশ্চেনস্, এলাহাবাদ ১৯৪১, পৃ ১৬৩।

২৪ কে. বি. কৃষ্ণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৯৬।

২৫ রজনীপাম দত্ত লিখেছেন : "This was the soil which made it easy for official policy to play on the latent antagonisms and build upon them a whole political system." দ্রষ্টব্য, ইণ্ডিয়া টু-ডে, বোম্বাই ১৯৪৯ সং, পৃ ৪২৫।

২৬ এ. আর. দেশাই লিখেছেন : Communalism was mainly the result of the peculiar development of the Indian social economy under the British rule, of the uneven economic and cultural development of different communitics and of the action of the strategy of both the British Government and the vested interests "within these communities." দ্রঃ, এ. আর. দেশাই, সোশাল ব্যাকগ্রাউণ্ড অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালইজম্, বোম্বাই, ১৯৬৮, পৃ ৫৯৩।

২৭ অশোক মেহতা এবং অচ্যুত পটবর্ধন, দ্য কমিউনাল ট্রায়াঙ্গেল ইন ইণ্ডিয়া, এলাহাবাদ, ১৯৪২, পৃ ৭৯।

২৮ বিপানচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২০৯।

২৯ আমাদের দেশে ড: রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। তিনি বোম্বাইয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবন-প্রকাশিত 'দ্য হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পিপল' সিরিজের ষষ্ঠ খণ্ডে দিল্লী

সুলতানী আমল আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে মধ্যযুগের ভারত ছিল "Permanently divided into two powerful units, each with marked individuality of its own, which did not prove amenable to a fusion or even any close permanent cordination." ইনি হিন্দু মুসলিম যুক্ত সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা এবং বিভেদের পাশে ধীরে ধীরে মিলনের চেষ্টা আদৌ দেখতে পান নি বা চান নি।

৩০ পাকিস্তানে ডঃ ইশতিয়াক আমেদ কুরেশির লেখা থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। তিনি নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত *The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent* বইতে লিখেছেন : "at all times the Muslims of the subcontinent were resolute in refusing to be assimilated to the local population and made conscious efforts to maintain their distinctive character." ইনিও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টার কোনো ব্যাপারই দেখতে পান নি বা ইচ্ছাকৃতভাবেই দেখতে চান নি।

৩১ এ. এন. বিদ্যালঙ্কার লিখিত 'ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন অ্যাণ্ড টিচিং অফ হিস্ট্রি' গ্রন্থে (নতুন দিল্লী, তারিখ নেই) উদ্ধৃত। সাম্প্রদয়িকতা সম্পর্কে গান্ধীর মনোভাবের জন্য দ্রষ্টব্য, এম. কে. গান্ধী, দ্য ওয়ে টু কমিউনাল হারমনি, (নির্বাচিত রচনাবলী), আমেদাবাদ, ১৯৬৩।

৩২ Report of the Cawnpore Riots Enquiry committee, appointed by the Indian National Congress in 1931, N. Gerald Barrier (ed.) *Roots of Communal Politics*, (Delhi, 1976), গ্রন্থে এই প্রতিবেদন সম্পূর্ণ উদ্ধৃত আছে, সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ।

৩৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৬০।

৩৪ এই প্রশ্নগুলি সঙ্গতভাবে উত্থাপন করেছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক সুশোভন সরকার। দ্রষ্টব্য, S. C. Sarkar, "Delhi Crusade against modern historians", in the *Amrita Bazar Patrika*, 23 Nov, 1977 এবং "প্রগতিশীল ইতিহাস চর্চার উপর হিন্দুত্বের আগমন", পরিচয়, ডিসেম্বর, ১৯৭৭। সুশোভনবাবুর অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধটির প্রত্যুত্তরে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি প্রবন্ধ বের

হয় একই কাগজে। দ্রঃ, R. C. Majumdar, "Accademic Freedom", in the *Amrita Bazar Patrika*, 2 December, 1977. এর পর রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখার অসঙ্গতি দেখিয়ে ছাপা হয় একগুচ্ছ প্রবন্ধ। যেগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করে নিখিল চক্রবর্তী সম্পাদিত *Mainstream* পত্রিকায় (দিল্লী, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭২ সংখ্যায় সুশোভন সরকার এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার উভয়ের লেখা দুটি পুর্নমুদ্রিত হয়েছিল) ডিসেম্বর থেকে কয়েক মাস। লেখকদের মধ্যে ছিলেন : ডঃ ভি. সি. পি. চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায়, অধ্যাপিকা রুবি রায়, মন্মথনাথ গুপ্ত, ডঃ সুবীরা জয়সওয়াল এবং ডঃ হরবনস মুখিয়া। ডঃ সর্বপল্লী গোপাল একই সময়ে রমেশ থাপার সম্পাদিত *Seminar* পত্রিকায় (জানুয়ারী, ১৯৭৮) 'Fear of History' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। বর্তমান লেখক উপরিউক্ত প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ সংকলন ও সম্পাদনা করে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ইংরাজী মুখপত্র *The Indian Messenger* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে পুনর্মুদ্রিত করেছিলেন (ফেব্রুয়ারী ২২—আগস্ট ৭, ১৯৭৮)।

৩৫ ডঃ রোমিলা থাপারের প্রবন্ধ সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-ইতিহাস রচনা, (অনুবাদ তনিকা সরকার), কলকাতা, কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোং, ১৯৭৬।

৩৬ পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৩৭ গৌতম নিয়োগী, 'ইতিহাস-পাঠ এবং সাম্প্রদায়িকতা', দেশ, ২৮ জুলাই, ১৯৮৪ সংখ্যা। জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমে প্রশ্নগুলি বৃহত্তর বাঙালি পাঠক সমাজের কাছে উত্থাপন করেছিলাম।

৩৮ রোমিলা থাপার, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০।

৩৯ R. S. Sharma, "Problem of Transition from Ancient to Medieval Indian History", in the *Indian Historical Review*, Vol. I, No 1, March, 1974, p. 9.

৪০ দ্রঃ 'বৃহৎবঙ্গ' এবং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ইত্যাদি গ্রন্থ।

৪১ দ্রঃ ক্ষিতিমোহন সেন, 'ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা' কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৪৬। অপিচ দ্রষ্টব্য, তাঁর *Medieval Mysticism in India*, (Reprint, New Delhi, 1974)

৪২ দ্রঃ জগদীশনারায়ণ সরকার, বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক (মধ্যযুগ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৮৮।

৪৩ ডঃ মুহম্মদ আবদুল জলিল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দুমুসলিম সম্পর্ক, পাবনা, বাংলাদেশ, ১৯৮৩।

৪৪ দ্রঃ Satish Chandra, *Parties and Politics at the Mughal Court*, New Delhi, People's Publishing House, 1959.

৪৫ দ্রঃ M. Athar Ali, *The Mughul Nobility under Aurangzeb*, Bombay, 1966.

৪৬ মন্তব্যটি করেছিলেন Nawab of Mamdot, যেটি উদ্ধৃত আছে Moin Shakir রচিত *Khilafat to Partition* (নতুন দিল্লী, ১৯৭০) গ্রন্থ, পৃ ২০০।

৪৭ হরবনস মুখিয়ার 'Debate on History' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রঃ, *the Indian Messenger*, 21 May, 1978.

৪৮ দ্রঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৮৪।

৪৯ হরবনস মুখিয়ার প্রবন্ধ। সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতের ইতিহাস রচনা (পূর্বোক্ত), পৃ ৪৫।

৫০ একথা লিখেছেন Satis Chandra তাঁর *Communal Interpretation of Indian History* পুস্তিকায় (নতুন দিল্লী, তারিখ নেই)।

৫১ হরবনস মুখিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৯।

৫২ ঐ, পৃ ৪২।

৫৩ বিপানচন্দ্রের প্রবন্ধ। পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৫৪ ঐ, পৃ ৭১-৭২।

৫৫ এই পাঁচটি পুস্তক নিয়ে যে দেশব্যাপী বিতর্ক হয়, সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য V. C. P. Chowdhury, *Secularism Versers Communalism* (An Anatomy of the National Debate on Five Controversial History Books), Patna, 1977.

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম-বিষয়ক
বাংলা গ্রন্থের সূচী

সাধারণভাবে আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বিশেষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে ইতিহাসানুরাগী বাঙালী সংস্কৃতিমান পাঠক-পাঠিকারা যাতে ব্যাপকতর পড়াশুনো করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই বর্তমান পঞ্জীটি সংকলিত। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের নানাস্তরে ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মেটানোই এই সংকলনের মৌল অভিপ্রায়। তবে এই গ্রন্থপঞ্জীটি কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও গবেষক বন্ধুদের নানা কাজে লাগবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। পশ্চিম বঙ্গ ইতিহাস সংসদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা' শীর্ষক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই উপলক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের কয়েকটি ধারা সম্বন্ধে কিছু বাংলা বইয়ের তালিকার একটি প্রাথমিক খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে এই বিষয়ে পূর্ণতর সূচী প্রকাশ করা গেল।

তবে, এই সূচীর ত্রুটিগুলির বিষয়ে, আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। প্রথমত এই পঞ্জী কোন অর্থেই পূর্ণাঙ্গ হিসেবে দাবী করতে পারে না এবং সংকলয়িতা-দ্বয়ের সজাগ দৃষ্টি এবং ব্যাপক্ অনুসন্ধান সত্ত্বেও বহু গ্রন্থ বাদ পড়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই পঞ্জী আপাতত শুধুমাত্র বাংলা বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। একথা আমরা অবশ্যই মানি যে ইংরাজি ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম-বিষয়ক গ্রন্থ-প্রবন্ধ যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এগুলি আমাদের ইতিহাসবোধকে ও যথেষ্ট সজীব করেছে। তৃতীয়ত, যদিও সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং নানা ধারা সম্বন্ধেই গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন আমাদের অন্বিষ্ট, তবু প্রাথমিক ঝোঁক বাংলাদেশের উপরেই। এই সীমাবদ্ধতা স্বীকার না করে উপায় নেই। এবং চতুর্থত, বহু মূল্যবান প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে, বর্তমান সূচীতে সেগুলি সমস্তই সংকলিত হলে উপযুক্ত হত সন্দেহ নেই

কিন্তু এই মুহূর্তে অনিবার্য কারণবশত তা করা সম্ভব হল না। ভবিষ্যতে আরও পূর্ণতর সূচী সংকলিত হলে পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।

সমগ্র সূচীটিকে বিষয়-ভিত্তিক কতকগুলি ভাগ করা হয়েছে, সেগুলি এই :

ক) ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রাম—সামগ্রিক আলোচনা

খ) কৃষক বিদ্রোহ ও উপজাতি অভ্যুত্থান

গ) উনিশ শতকের বাংলা

ঘ) ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহ

ঙ) কংগ্রেস রাজনীতি

চ) 'স্বদেশী' আন্দোলন

ছ) জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন

জ) মুসলিম রাজনীতি ও পাকিস্তান আন্দোলন

ঝ) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

ঞ) সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

ট) বামপন্থী আন্দোলন

ঠ) স্বাধীনতার শেষপর্ব ও ভারত-বিভাগ

ড). লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত বাজেয়াপ্ত পুস্তিকা

তাছাড়া তালিকার বিন্যাস বিষয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমত, তালিকা লেখকের নামের বর্ণ অনুসারে সাজান হয়েছে, পদবী (Sername) অনুসারে নয়। দ্বিতীয়ত, যে সব ক্ষেত্রে পুস্তকে লেখকের নাম ছাপা নেই, সেসব ক্ষেত্রে শিরোনাম কিংবা প্রকাশন সমিতির নাম ধরেই সাজান হয়েছে। তৃতীয়ত, লেখক নামের পর ক্রম অনুসারে পুস্তক বা পুস্তিকার নাম, প্রকাশনার নাম, প্রকাশ স্থান, প্রকাশকাল, প্রকাশনার বৎসর (বঙ্গাব্দ অথবা খ্রীষ্টাব্দ) দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা সংখ্যা বা অতিরিক্ত তথ্য (যেমন 'ভূমিকা' যদি লেখক স্বয়ং না লিখে থাকেন, সে-ক্ষেত্রে অন্য ভূমিকা লেখকের নাম) বা মন্তব্য যুক্ত হয়েছে।

লণ্ডনের কমনওয়েলথ রিলেশনস অফিসে (পূর্বতন ইণ্ডিয়া অফিস

লাইব্রেরী) রক্ষিত ব্রিটিশ শাসনাধীনে বাজেয়াপ্ত বইয়ের বিবরণ ক্যাটালগস নম্বর সহ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী সমিতির (২৬ ন্যাশনাল পার্ক, নিউ দিল্লী) পক্ষ থেকে শ্রীঅরুণ ঘোষ সংকলিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শীর্ষক একখানি গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হয়েছে (১৯৮৫)। বর্তমান সূচীটি সংকলনের ক্ষেত্রে এই পুস্তিকাটি থেকে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে তা স্বীকার করি সানন্দে। বিশেষত লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত বাজেয়াপ্ত বইয়ের তালিকা এই পুস্তিকা থেকেই নেওয়া। তাছাড়া প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতের জাতীয় আন্দোলন' গ্রন্থের (দ্বিতীয় সং, ১৩৬৭) সঙ্গে যুক্ত শ্রীআদিত্য ওহদেদার কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থপঞ্জীটিও আমাদের কাজে লেগেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্যাটালগ বা পুরাতন সূচীর উপর নির্ভর না করে বইগুলি প্রত্যক্ষভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে; যেখানে সম্ভব হয় নি শুধুমাত্র সেখানেই পরোক্ষ সূত্র ধরে সঙ্কলন করা হয়েছে। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, শ্রীচৈতন্য লাইব্রেরী, জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী (উত্তরপাড়া) কর্তৃপক্ষ সানুগ্রহ সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বহু ব্যক্তিগত সংগ্রহও ব্যবহার করা হয়েছে, স্থানাভাবে প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা গেল না। তবে এই সূচীর মুসাবিদার প্রত্যেক স্তরে রয়েছে প্রবীণ গবেষক শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশের শুভেচ্ছা ও সাহায্য। শ্রীমতী অরুন্ধতী নিয়োগীও নানাভাবে 'সাহায্য করেছেন।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী—সংকলিত

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রাম—সামগ্রিক আলোচনা

অমলেশ ত্রিপাঠী, বিপান চন্দ্র এবং বরুণ দে, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। নতুন দিল্লী, ১৯৭২। অনুবাদক: ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়।

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া। ২য় সং, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৮১। ভূমিকা—যোগানন্দ দাস।

রজনীপাম দত্ত, আজিকার ভারত (নির্বাচিত অংশ)। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা. ১৯৮১।

নরহরি কবিরাজ. স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা। মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৬৪, ২৬২+১১ পৃ। ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৮।

যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৫২। ৫৩৮ পৃ।

মনি বাগচী, কেমন ক'রে স্বাধীন হলাম। কলিকাতা, বসু প্রকাশনী, ১৯৫৯ ১১৬ পৃ।

আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর। ঢাকা, নওরোজ কিতাবইস্তান, ১৯৭০। ৬৯১ পৃ।

হীরেন মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন। কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৪৩। ১২০ পৃ।

কমলা দাশগুপ্তা, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী। কলিকাতা, বসুধারা, ১৩৭০। ২৯৮ পৃ। (গ্রন্থপঞ্জী)

ছবি রায়, বাংলায় নারী আন্দোলন। কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৩৬২। ১৭৭ পৃ।

সুকুমার রায়, ভারতবর্ষে'র স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। কলকাতা ওরিয়েন্ট বুক, ১৯৫৬। ১৬০ পৃ।

বিভাস দে, ভারত কি ক'রে স্বাধীন হল। কলিকাতা, ১৯৫৫। ৬০ পৃ।

দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালী। চুঁচুড়া, গ্রন্থাগার, ১৯৫০। ১৪২ পৃ।

সৌরীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা: রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ। সুবর্ণরেখা, কলকাতা।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতের জাতীয় আন্দোলন। ২য় সং, গ্রন্থম কলকাতা ১৩৬৭। ৪১৩ পৃ। ভূমিকা রমেশচন্দ্র মজুমদার। প্রথম প্রকাশ, বরদা এজেন্সি, ১৯২৫। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

যোগেশচন্দ্র বাগল, ভারতবর্ষী'য় স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। ১ম খণ্ড। ১৩৫২। ২৫১ পৃ।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়, রুশ বিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন। মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৬৭। ৮৮ পৃ।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ। চারুপ্রকাশ, ১৯৮০। ৯৫ পৃ।

রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, (১৯০৫-১৯৪৭) আধুনিক যুগ (মুক্তি সংগ্রাম) কলিকাতা, ১৯৭৫। ৪র্থ খণ্ড।

অক্ষয়কুমার দত্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী, ১৯৬৩,|১৪৬ পৃ।

অনাদিনাথ পাল. ভারতের মুক্তি সংগ্রাম। কলিকাতা, পুস্তকালয়। ১ম খণ্ড।

অযোধ্যা সিং. ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কলিকাতা, রেখা, ১৯৭৪। ৯৯ পৃ। (কমলেশ সেন ও আশা সেন কর্তৃক হিন্দী থেকে অনূদিত)।

অরুণ চন্দ্র গুহ (সংকলক), অর্ঘ্য। কলিকাতা, ১৩২৮। (বিভিন্ন লেখক কর্তৃক লিখিত দেশাত্মবোধক সংগীত)।

— দেশ পরিচয়। (১৩৩৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)।

অশোক গুহ, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। পরিবর্ধিত সংস্করণ। কলিকাতা, ১৯৫৮।

আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ। চট্টগ্রাম, গ্রন্থকার, ১৯৭৬। ১৬২ পৃ।

উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৯৪৭। ১৮৪ পৃ।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মুক্তি সাধনায় বাঙ্গালী। কলিকাতা, ১৩৫৬।

— বঙ্গের বীর সন্তান। ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৯৩২।

করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গের আহ্বান: বাঙ্গালী পল্টনের রণ-গীতি। কলিকাতা, ১৯১৮।

কমলা দেবী ও অনিল সেন, স্বাধীনতার মূল্য। কলিকাতা, ১৯৪৮।

কৃষ্ণানন্দ দাসগুপ্ত, সংগ্রামী ভারত (১৯৫৭-১৯৪৭)। কলিকাতা, সরোজিনী প্রকাশনী, ১৯৭৩। ১৮০ পৃ।

কেদারনাথ শীল, স্বরাজ সাধনায় নরসুন্দর সমাজ। সিরাজগঞ্জ, ১৯২৪।
গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪৯। ২ খণ্ড।
গোপাল ভৌমিক, ভারতের মুক্তিসাধক। কলিকাতা, বেঙ্গল, ১৯৪৫। ১২৮ পৃ।
জ্যোতির্ময় ঘোষ, পলাশী হইতে কোহিমা। কলিকাতা, জ্যোতি প্রকাশালয়। ১৯৪৯। ১২৮ পৃ।
তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, স্বাধীনতার সংগ্রামে মেদিনীপুর। কলিকাতা, ভূতপূর্ব রাজবন্দী গ্রন্থাগার। ১৯৭৩। ১৯১ পৃ। (গ্রন্থপঞ্জী)
দুর্গাদাস লাহিড়ী, স্বাধীনতার ইতিহাস। কলিকাতা, ১৯২৩।
দিগীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, স্বাধীনতার বাণী। কলিকাতা, ১৯০৭। ২য় খণ্ড।
ধীরেন্দ্রলাল ধর, স্বাধীনতার সংগ্রাম। কলিকাতা, বৃন্দাবন ধর, ১৯৪৮। ১৩৬ পৃ।
নগেন্দ্র কুমার গুহ, স্বাধীনতার কথা। ১৩৩২। ১৬৭ পৃ।
দ্বিজদাস দত্ত, স্বরাজের সিঁড়ি। কান্দির পাড়া, ১৯২৪।
দ্বিজেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ শ্রীহট্ট। শ্রীহট্ট, ১৯৩০।
ধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ভারতে স্বরাজ সাধক ; ১ম অংশ। কলকাতা, যুগবার্তা সাহিত্য ভাণ্ডার, তারিখ নেই। ১৮৯ পৃ।
নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, স্বরাজ সাধনায় বাঙ্গালী। কলকাতা, সরস্বতী লাইব্রেরী। ১৯২৩। ২০৮ পৃ।
নদীয়া জেলা স্বাধীসতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা সমিতি। স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া। কৃষ্ণনগর, ১৯৭০। ৩৮৭ পৃ।
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স ; ১৯৪১। ৩১৪ পৃ।
প্রিয়নাথ জানা, জাতীয়তার মন্ত্রগুরু যাঁরা : বঙ্গদেশ পর্ব। কলকাতা, বাণী নিকেতন, ১৯৭২। ২৯০ পৃ।
রেজাউল করিম, জাতীয়তার পথে, কলকাতা, ১৩৪৬।
নীরোদ কুমার গুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি। শিলচর, ১৯৭৪।

প্রবোধ কুমার ভৌমিক, মেদিনীপুরের কাহিনী। কলিকাতা, মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদ, ১৯৫৮। ৮৮ পৃ।

পুলকেশ দে সরকার, বাঙালীর বিপ্লব সাধনা। কলকাতা, দত্ত চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৭৭। ১৮৭ পৃ।

প্রফুল্ল দাসগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ। হাওড়া, বিপ্লবী পরিষদ, ১৯৭২। ১১৫ পৃ।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, রুদ্ধকারার দিনগুলি। কলকাতা, সিগনেট প্রেস। ১৭৫ পৃ।

বিমলা দাসগুপ্ত, ত্রয়ী (গান্ধী, মহাম্মদ আলী, চিত্তরঞ্জন)। ১৯২৭। ৭৭ পৃ।

বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর। আত্মজীবনী। কলিকাতা, যুগযাত্রী, ১৩৬২। ২৩৯ পৃ।

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য. বিদ্রোহী বাঙালী। কলিকাতা, ১৯৬৫।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ শাখা, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস। কলিকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি। ১৯৫৯। ৭৮ পৃ।

মৃত্যুঞ্জয়ী, কলিকাতা, মহাজাতি সদন, ১৯৬৬। ২০৮ পৃ।

যোগেশচন্দ্র বাগল, জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী। কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৪। ৫৪ পৃ।

রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস। কলিকাতা, ১৯৫৮। ১ম খণ্ড।

রাতুল রায়চৌধুরী, ভারতবর্ষে বিপ্লব আন্দোলন। কলিকাতা, ১৯৭১।

শংকর ঘোষ, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। কলিকাতা, শিশু-সাহিত্য সংসদ। ১৯৭৫। ১৪৮ পৃ।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৩।

সতীশচন্দ্র সামন্ত, মুক্তির গান। কলিকাতা, ওরিয়েন্ট বুক।

সখারাম গণেশ দেউস্কর, দেশের কথা। কলিকাতা, ১৩৯১।

সত্যানন্দ স্বামী, হে অতীত কথা কও। কলকাতা, নবভারতী, ১৯৬৯। ৫৩৩ পৃ।

সত্যানন্দ ভারতী, স্বরাজ সাধনা, কলকাতা, ১৯২৩ ।

হীরালাল দাসগুপ্ত ও মনোরঞ্জন গুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল। কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬ । ২ খণ্ড ।

হরিহর শেঠ, মুক্তিসাধনায় চন্দননগর । কলকাতা, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ১৯৫৭ । ১৫৫ পৃ ।

হরিপদ দত্ত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুরমা উপত্যকা । করিমগঞ্জ, গ্রন্থকার, ১৩৭৭। ৩৩ পৃ ।

স্বরাজ সঙ্গীত । (দেশাত্মবোধক গানের সংকলন) । ঢাকা, মডেল লাইব্রেরী, ১৯১১ ।

সুরেশচন্দ্র দে, স্বাধীনতা সংগ্রামে নবাবগঞ্জ । কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৩৭৮ । ৭৩ পৃ ।

সাফি. এম, স্বরাজ পথে হিন্দুমুসলমান । কলকাতা, কে. বি. ব্রাদার্স, ১৯২১ ।

সুবোধকুমার দে, গ্রাম্য স্বরাজ । কলকাতা, ১৯২৫ ।

সুধীরচন্দ্র মৈত্র, পরাধীন ভারতের মুক্তি সংগ্রাম । দেওঘর, ১৯৬৯ ।

সুধা দেব, স্বরাজ সঙ্গীত । নওগাঁ, ১৯২১ ।

সুকুমার রায় ও অজিত বসু মল্লিক (সম্পাদক), আগস্ট সংগ্রাম ও মেদিনীপুরে জাতীয় সরকার । তমলুক ।

— আজাদ হিন্দ দিবসে কলিকাতায় গুলি বর্ষণ । কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৩৫৩ । ১২৮ পৃ ।

সুধাংশু সেন, ভারতীয় বাহিনীর নবজাগরণ । কলকাতা ওরিয়েন্ট বুক, ১৯৪৭। ১০৩ পৃ ।

ফণীভূষণ ভট্টাচার্য্য, নৌ বিদ্রোহের ইতিহাস । কলকাতা, ১৯৭৩ ।

দেবজ্যোতি বর্মন, বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনা । কলকাতা, ১৩৬৪ । ১৫২ পৃ ।

তুষার চট্টোপাধ্যায়, হুগলী জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস । কলকাতা ১৯৮৩ ।

গোপীনন্দন গোস্বামী । বাংলার হলদিঘাট তমলুক, ১৯৭৩ ।

কৃষক বিদ্রোহ ও উপজাতি অভ্যুত্থান

সুপ্রকাশ রায়, ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। ১ম খণ্ড, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলকাতা।

নিখিল সুর, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, সুবর্ণরেখা।

আবদুল্লাহ রসুল, ভারতে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

মণি সিংহ, জীবন সংগ্রাম, ঢাকা, ১৯৮৩।

বিনয় চৌধুরী, বাংলার ভূমিব্যবস্থার রূপরেখা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ১৯৭৭।

প্রমোদ সেনগুপ্ত, নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, সুবর্ণরেখা, ১৯৮১।

গোপীনাথ সেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের ভূমিকা, বিদিশা, মেদিনীপুর, ১৯৭৫।

অমলেন্দু দে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী, রত্না প্রকাশন, ১৯৮১।

বদরুদ্দিন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক, চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮০।

প্রমথ গুপ্ত, মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী : ময়মনসিংহ। মণীষা, ১৯৮২। ২য় সং।

ধনঞ্জয় রায় (সম্পাদিত), উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন, মালদহ, ১৯৮৪।

পরিচয় (মাসিক পত্র), কৃষক সংগ্রাম সংখ্যা, জুলাই, ১৯৭০।

দেবেশ রায় ও রণজিৎ দাশগুপ্ত, ধানের গায়ে রক্তের দাগ, জলপাইগুড়ি, ১৯৬৭।

তেভাগা সংগ্রাম রজতজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কলকাতা ১৯৭৩।

আবদুল্লা রসুল, নীলবিদ্রোহের অমর কাহিনী। কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬০, ৪৮ পৃ।

সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী। কলকাতা, ১৯৫৪।

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস। কলকাতা, পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৭৬। ১২৮ পৃ।

নির্মলকুমার ঘোষ, ওড়িশার পাইক বিদ্রোহ। কলকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬৯। ৯৮ পৃ।

নরেন্দ্রনাথ রায়, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। কলকাতা, সরস্বতী পুস্তকালয়।

বিনোদ শঙ্কর দাস, জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুরের গণবিক্ষোভ (১৭৬০-১৮০৫)। মেদিনীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৮।

বিহারীলাল সরকার, তিতুমীর। কলিকাতা, কালিকা প্রেস। ১৮৯৭।

স্বর্ণ মিত্র, প্রচলিত ইতিহাস ও অবহেলিত তিতুমীর। কলকাতা (অনুষ্টুপ পত্রিকায় প্রকাশিত)।

সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী, নীলকর বিদ্রোহ। কলকাতা, অধ্যয়ন, ১৯৭২। ১৪৪ পৃ।

সুপ্রকাশ রায়, মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক। কলকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৬২। ২০৭ পৃ।

নটরাজন, এল. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৫০-১৯০০)। পীযুষ দাশগুপ্ত কর্তৃক অনুদিত। ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৬১। ৯২ পৃ।

শ্যামাপ্রসাদ বসু, ওয়াহাবী থেকে খিলাফৎ। কলকাতা, ১৯৮১।

গোদাবরী পারুলেকর, আদিবাসী বিদ্রোহ, কলকাতা।

ঊনিশ শতকের বাংলা

দিলীপকুমার বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা। সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৮৩।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। শেষ সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিসিং, ১৯৭২।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়। প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, নতুন দিল্লী, ১৯৭৭।

যোগানন্দ দাস, রামমোহন ও ব্রাহ্ম-আন্দোলন। কলকাতা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ, ২য় সং, ১৩৫০।

শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। কলকাতা, ১৩১১, ৩৫৯ পৃ। শেষ সং, নিউ এজ, ১৯৫২।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, ৪র্থ সং, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। ১৯৬২। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত।

অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী। ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, এলাহাবাদ। ১৯১৬। শেষ সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, ১৯৭১।

গৌতম নিয়োগী, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা। ১৯৭৮।

গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য কেশবচন্দ্র। শতবার্ষিক সংস্করণ, ৩ খণ্ড। এলাহাবাদ, ১৩৪৫। (১—৭০৪)+(৭০৫—১৪৩৬)+(১৪৩৭—২৩০২) পৃ।

যোগেশচন্দ্র বাগল, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। রঞ্জন পাবলিসিং হাউস, ১৯৬৩।

রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ; (শেষ সংস্করণ), ১৯৬১।

রাজনারয়ণ বসু, সেকাল আর একাল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা। ১৩৫৮ সং। ৯৬ পৃ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারিত্রপূজা। ১৩০৪। ১১৪ পৃ। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শেষ সং।

শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিক সংস্করণ। গৌতম নিয়োগী কর্তৃক সম্পাদিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা। ১৯৮২।

বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, যুগযাত্রী প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৫৫।

বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর, যুগযাত্রী প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৫৫।

কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত। ২য় সং, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা। ১৯৭৪। কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত পরিশিষ্টসহ।

নরহরি কবিরাজ (সম্পা.), উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ, তর্ক ও বিতর্ক। কে. পি. বাগচী, কলকাতা, ১৯৮৪।

প্রফুল্লকুমার দাস, শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত বর্কৃতা ও স্মারকলিপি, ফার্মা. কে. এল. কলকাতা।

রমাপ্রসাদ দে (সম্পা.), ডিরোজিও। শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৩।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; কলকাতা, দু'খণ্ড। ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, (সাহিত্য সাধক চরিতমালা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৫৩ সং।

রামগোপাল সান্যাল, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী। ১২৯৪। ৫৬ পৃ।

বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি। ১ম খণ্ড। ১৩৫৫। ২০৮ পৃ।

অনাথনাথ বসু, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ। ১৩২৭। ৪৯৫ পৃ।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলার ঊনবিংশ শতাব্দী। ১৩৩৪। ৪১৭ পৃ।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর। প্রথম প্রকাশ ১৩০২। ৫৪২ পৃ।

চণ্ডীচরণ সেন, মহারাজ নন্দকুমার। শেষ সংস্করণ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত), কলকাতা, ১৩২৬। ২৪০ পৃ।

মন্মথনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র। ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়; ১৩৩৫। ২ খণ্ড।

যোগেশচন্দ্র বাগল, ভারতের মুক্তি-সন্ধানী। কলিকাতা, পপুলার লাইব্রেরী, ১৭৩ পৃ।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আত্মচরিত। কলকাতা, ১৩৪৪। ৫৫৭ পৃ।

—জাতিগঠনে বাধা (ভিতরের ও বাহিরের)। কলিকাতা, ১৩২৮। ১৬ পৃ।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস : অষ্টাদশ শতাব্দী। কলকাতা, ১৩১৫। ৫৭৬+২৪ পৃ।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, পলাশীর যুদ্ধ। কলকাতা, ১৩৬৩। ১৯৭ পৃ।

,পলাশীর পর বকসার। কলিকাতা, নাভানা, ১৯৮৩।

দীনবন্ধু মিত্র, নীলদর্পন (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকা সহ)। কলকাতা, ১৩২৮। ১৮৮ পৃ। প্রথম প্রকাশ—১৭৮২ শকাব্দ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ। তিন খণ্ড, সম্পাদনা : গোপাল হালদার। সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৩।

মন্মথনাথ ঘোষ, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। কলকাতা, ১৩২২। ১২৫ পৃ।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী। কলকাতা, ১৯৫৯।

কটন হেনরি, নবভারত বা পরিবর্তন যুগের ভারতবর্ষ (রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক নিউ ইণ্ডিয়া পুস্তকের অনুবাদ)। কলকাতা, ১২৯৩। ১৭১ পৃ।

সুশীলকুমার গুপ্ত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ। কলকাতা, ১৩৬৬। ২৭২ পৃ।

স্বামী, সুন্দরানন্দ, জাতীয় সমস্যায় স্বামী সুন্দরানন্দ। কলকাতা, ১৯৫৯। ২০১ পৃ।

সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্রোহী রাজা রামমোহন। কলকাতা, ১৩৪১। ৯২ পৃ।

যোগেশচন্দ্র বাগল, জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ। কলকাতা, ১৩৫৩। ২২৪ পৃ।

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা। ১০ খণ্ড। ১৩৬৪-৭০।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি। কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭১।

সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ৪ খণ্ড, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা।

স্বপন বসু, গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, কলকাতা, পুস্তক-বিপনি, ১৯৮৪।

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ভারত শ্রমজীবী, কলকাতা, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ১৯৭৬।

কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ। কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৩।

নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি। কলকাতা, ১৩৬১ সং।

রাজনারায়ণ বসু, হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত। সম্পাদনা: দেবীপদ ভট্টাচার্য। কলকাতা, ১৯৬৩। প্রথম প্রকাশ, ১৮৭৫।

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নারী জাগরণ। কলকাতা, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ১৩৫৩।

বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত্র-চিত্র, কলকাতা, ১৯৫৮।

বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। তিনখণ্ড, কলকাতা, ১৯৫৭-৫৯।

বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র। ৫ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬২-৬৬।

মন্মথনাথ ঘোষ, সেকালের লোক। কলকাতা, ১৩৪৬।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৬৮।

ইন্দ্র মিত্র, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৯।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৭৯।

অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম মানস। কলকাতা, ১৩৬৬, ২য় সং।

গৌতম নিয়োগী, যোগেশচন্দ্র বাগল। সাহিত্য সাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৮৫।

যোগেশচন্দ্র বাগল, হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত। কলকাতা, ২য় সং, ১৯৬৮।

যোগেশচন্দ্র বাগল, জাগৃতি ও জাতীয়তা। কলকাতা, ১৩৬৬।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ২ খণ্ড। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৪৯-১৯৫০।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ। তিন খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৭৫-৭৮।

স্বপন বসু, বাংলার নবচেতনার ইতিহাস। কলকাতা, ১৯৭৫।

সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৪।

ভবতোষ দত্ত, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। কলকাতা, ২য় সং, ১৯৭৩।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতে শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন। কলকাতা, ১৯৬৩।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর—জন্মশতবর্ষ সংকলন (সম্পাদক) গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরি। ১৯৭২।

১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহ

প্রমোদ সেনগুপ্ত, ভারতীয় মহাবিদ্রোহ। শেষ সংস্করণ, সুবর্ণরেখা, ১৯৮২। প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৪। ৩৬৩ পৃ।

সুকুমার মিত্র, ১৮৫৭ ও বাংলাদেশ। ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬৪।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিষ এঙ্গেলস্, ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ। (বাংলা অনুবাদ) প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৭৬। ২৬৫ পৃঃ।

হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ বা ডঃ মজুমদার, ডাঃ সেন ও বিরুদ্ধ পন্থীদের আলোচনার পর্যালোচনা। ১৩৬৪, কলকাতা। ৩৮ পৃ।

শ্যামাপ্রসাদ বসু, ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ। ক্রান্তিক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮২।

রজনীকান্ত গুপ্ত, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস। ৫ খণ্ড, কলকাতা, ১৩১৭। ২৬৪, ২৪৪, ২৬৮, ৩১২, ৪৫৫ পৃ। দ্বিতীয় সং, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

পরিচয় (মাসিকপত্র) মহাবিদ্রোহ শতবার্ষিকী সংখ্যা। ১৯৫৭।

যদুনাথ সর্বাধিকারী, সিপাহী বিদ্রোহ বিবরণ।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্রোহে বাঙ্গালী বা আমার জীবনচরিত। কলকাতা, বঙ্গবাসী প্রেস, ১৩৩১। ৫২১ পৃ।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। কলকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৩৬১। ২৪৭ পৃ।

মণি বাগচি, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস। কলকাতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৩৬৪। ৩৬৪ পৃ।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিপাহী বিদ্রোহ বা মিউটিনি। কলকাতা, বসুমতী কার্যালয়। ১৩২২। ৫৩৪ পৃ।

দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, সিপাহী যুদ্ধ। কলকাতা, ১৩৩৮।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঝাঁসীর রাণী। কলকাতা, ১৩১০। ৭৩ পৃ।

সখারাম গণেশ দেউস্কর, ঝাঁসীর রাজকুমার। ১৩১৫। ৫২ পৃ।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, ঝাঁসীর রাণী। কলিকাতা, নিউ এজ ১৩৬৩। ৩৩৮ পৃ।

উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, নানাসাহেব। কলকাতা, ১২৯০।

চণ্ডীচরণ সেন, ঝানসীর রাণী। ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, ১৩০১।

বিকাশ গুপ্ত, ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ। কলকাতা, ১৯৪৭।

সিপাহী যুদ্ধে বহরমপুর। ১৯৫৭।

সুধীন্দ্রনাথ রাহা, সিপাহী বিদ্রোহ। কলকাতা, শরৎ সাহিত্য ভবন, ১০৩ পৃ।

সত্যেন সেন, মহাবিদ্রোহের কাহিনী। কলিকাতা, ১৯৭১।

কংগ্রেস রাজনীতি

অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস। কলকাতা, ১২৯৭।

অপর্ণা দেবী, মানুষ চিত্তরঞ্জন। কলকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, ১৩৬২। ৩৪৭ পৃ।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহাজাতি গঠনের পথে: রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। কলকাতা, ১৩৫১। ২৯১+৫৬ পৃ।

অরুণচন্দ্র গুহ, কংগ্রেসের পথ। কলকাতা, সরস্বতী লাইব্রেরী। ৯৪ পৃ।

অরুণচন্দ্র গুহ, সত্যাগ্রহ ও পাঞ্জাব কাহিনী। ১৩২৮।

ইন্দুভূষণ সেন, স্বরাজ। কতকাতা, ১৯২১। ৬৪ পৃ।

উপেন্দ্রনাথ কর, সত্যাগ্রহ ও পাঞ্জাব কাহিনী। কলকাতা, ১৯২২। ১৩০ পৃ।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত, দেশের আহ্বান। কলকাতা, আদর্শ পুস্তকালয়, ১৯২১। (অসহযোগ আন্দোলনে নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে পুস্তিকা)।

ঋষি দাস, আবুল কালাম আজাদ। কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক, ১৯৪৮।

— লোকমান্য তিলক। ১৩৬৪। ৮৫ পৃ।

কৃষ্ণলাল গঙ্গোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী। কলকাতা, ১৩৪১।

কৃষ্ণ দাস, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাত মাস। ১৯৩৫।

কৃষ্ণচন্দ্র শর্মা, স্বরাজের শিখা। কলকাতা, ১৯২১।

কার্তিকচন্দ্র দত্ত, স্বরাজ সাধনা। কলকাতা, ১৯২১।

কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কলকাতা, ১৯২৪। ২৪৪ পৃ।

কৃপালিনী, জে. বি, অহিংস বিপ্লব। কলকাতা, গান্ধী স্মারক নিধি, ১৩৫৫। ৪৮ পৃ। বাংলা ভাষান্তর ধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৃপালনী, জে. বি ও সত্যব্রত সেন, স্বদেশী এত কেন? কলকাতা, অভয়-আশ্রম, ১৯৭০। ৪৯ পৃ।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী (সংকলন), চিত্তরঞ্জন দাস। কলকাতা, সাহিত্য ভবন। (চিত্তরঞ্জন দাসের অপ্রকাশিত রচনা)।

গোপালচন্দ্র রায়, কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত (১৮৮৫-১৯৪৭)। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪৯। ১৫৩ পৃ।

চারুবিকাশ দত্ত, মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস। কলকাতা, তারিখ নেই।

চন্দ্রকান্ত দত্ত (সরস্বতী), গোখলে। দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ১৩৬৮। ৪৮ পৃ।

চিত্তরঞ্জন দাস, দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

চিত্তরঞ্জন দাস, দেশবন্ধুর ব্রজবাণী। কলকাতা, ১৯২৫। (দেশবন্ধুর জীবনী, রচনা ও বাণীর সঙ্কলন)। ৭৪ পৃ।

চিত্তরঞ্জন দাস, দেশের কথা। কলকাতা, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, ১৩২৯। ১৪৩ পৃ।

তারিনীশঙ্কর চক্রবর্তী, আগস্ট বিপ্লব (১৯৪২) বাংলা ও আসাম। কলকাতা, হিন্দুস্থান বুক ডিপো, ১৯৪৬।

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, গড়ে ওঠার পথে না ভাঙনের পথে ? (আত্মপরিচয়ের যৎকিঞ্চিৎ)। চন্দননগর জ্যোতিষচন্দ্র স্মৃতি কমিটি, ১৯৭২। ১১২ পৃ।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, দেশের ডাক। কলকাতা, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি। ১৯২৭। ৬৬ পৃ।

জওহর লাল নেহেরু, আত্মচরিত। কলকাতা, আনন্দ হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ১৩৫৫। অনুবাদক : সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ৬৭২ পৃ।

জওহরলাল নেহেরু, কারাজীবন ও কোন পথে ভারত। কলকাতা, ডি, এম. লাইব্রেরী, ১৩৫৬। অনুবাদক : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

জওহরলাল নেহেরু, পত্রগুচ্ছ। কলকাতা, এম. সি. সরকার। ১৩৬৭। ৪৫৩+৩ পৃ।

জওহরলাল নেহেরু, ভারত সন্ধানে। কলকাতা সিগনেট বুকশপ। ১৩৫৬। অনুবাদ : ক্ষিতীশ রায়। ৬৫৮ পৃ।

জালিওয়ালানাবাগ ১৩ এপ্রিল। নিউ দিল্লী, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণা প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৬৯। ৪০ পৃ।

দুর্গাপ্রসাদ, কংগ্রেস। কলকাতা, ৯৩০৩।

দুর্গেশচন্দ্র আচার্য্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনকথা। ময়মনসিংহ, ১৯২০।

নগেন দত্ত, বিপ্লবের পথে কংগ্রেস, কলকাতা, সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৩৫৩। ৮৯ পৃ।

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়। কলকাতা, ১৯২১। ৯৬২ পৃ।

নন্দগোপাল রায়চৌধুরী, পাঞ্জাব কেশরী। ১৯৬১।

নরেন্দ্র দে, গান্ধী গভর্ণমেন্ট পত্রালাত (১৯৪২-৪৫)। কলকাতা. ১৯৪৫।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জাতীয় মহাসমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কলিকাতা, ১৩১৩।

নরেশচন্দ্র ঘোষ, চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন। কলকাতা, জয়শ্রী প্রকাশন, ১৩৭৮। ৫৯৬ পৃ।

নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ, ভারত ছাড়। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৩। ১ম খণ্ড। ৬৪ পৃ।

প্রমথনাথ পাল, দেশপ্রাণ শাসমল। ২য় সং, কলকাতা, ১৩৬৮। ৩৫২ পৃ।
বিমল শাসমল, স্বাধীনতার ফাঁকি।
বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। কলকাতা, ১৯২০।
সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী, বিয়াল্লিশের বন্দীশালায়। কলকাতা, ১৯৭৬।
বীরেন্দ্রনাথ রায়, স্বরাজ ও খলিফত। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ার বুক ক্লাব। ১৯২১।
বেশান্ত, এ্যানি, দ্বাত্রিংশতম জাতীয় মহাসমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী এ্যানি বেশান্তের কংগ্রেস অভিভাষণ। কলিকাতা, ১৩২৪। ৫৯ পৃ।
বীনাপানি দাস (সম্পাদক), পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বা স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক অধ্যায়। কলিকাতা, ১৩৩৭। ১১১ পৃ।
বিপিনচন্দ্র পাল, জেলের খাতা, কলকাতা, ১৯০০।
— আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ। কলকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২২। ১৫ পৃ।
বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, স্রোতের তৃণ বা স্বরাজ আশ্রমে আট মাস। কলিকাতা, ১৩২৯।
মইজুদ্দিন আহমেদ, ভারতের স্বাধীনতা ও মৌলানা আজাদ। বীরভূম, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৪। ১৬৬ পৃ।
মধুসূদন মজুমদার, জনসেবক বিধানচন্দ্র। কলকাতা, দেবসাহিত্য কুটির, ১৯৬৩।
মনকুমার সেন, সীমান্ত গান্ধী বাদশা। কলকাতা, গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান, ১৯৬৯। ১১১ পৃ।
শ্রীপতিচরণ রায়, হোমরুল। কলকাতা, ১৩০০। ৩৮ পৃ।
সরোজনাথ ঘোষ, গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতামালা। কলকাতা, ১৩২৮। ১০৭ + ৮৬ পৃ।
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কংগ্রেস। কলকাতা, সরস্বতী পুস্তকালয়, ১৯২১। ৬৪ পৃ।
— গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন। কলকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২১।

— গান্ধী ও বিপিনচন্দ্র। কলকাতা, সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৯২১।

সুধীরচন্দ্র পাল, লোকমান্য তিলক। কলকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯২০।

সুকুমাররঞ্জন দাস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কলকাতা, ১৯৩৬।২৪৩ পৃ।

সুরেন্দ্রচন্দ্র ধর, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন : কর্মজীবন ও চরিত্র-চিত্র। কলকাতা, অ্যাডভ্যান্স অফিস, ১৯৩৪। ৫৫০ পৃ।

হেমন্তকুমার সরকার, দেশবন্ধু স্মৃতি। কলকাতা, সরকার এ্যাণ্ড কোং, ১৯৩১। ১১৮ পৃ।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দেশবন্ধু স্মৃতি। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৯২৫। ৪৩০ পৃ।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। কলকাতা, অভ্যুদয় প্রকাশন মন্দির, ১৯৪৭, ৩ খণ্ড।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৯২৮।৫৭৫ পৃ।

— কংগ্রেস ও বাঙ্গলা। কলকাতা, সংহতি কার্যালয়, ১৯৪২।

— জাতীয় মহাযজ্ঞের ইতিহাস : কংগ্রেস। ৩য় সং. কলকাতা, ১৩৩৫।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্তমান সমস্যা। কলকাতা, ১৩২৭।

ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ। তারিখ নেই। ১৪ পৃ।

ডায়ার ও পাঞ্জাব কাহিনী। কলকাতা, ১৩২৮। ৭৫ পৃ।

নিশীথনাথ কুণ্ডু, অহিংসা অসহযোগের কথা। কলকাতা, ১৩৩৩। ৫৪ পৃ।

প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, সহযোগিতা বর্জন। কলকাতা, ১৩২৭। ৩৮ পৃ।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, দেশবন্ধু-দেশপ্রিয়। কলকাতা, ১৯৪৭। ১৭৯ পৃ।

রাজকুমার চক্রবর্তী, লোকমান্য তিলক। কলকাতা, ১৩৪৩। ৭৯ পৃ।

যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, (সংকলিত), স্বরাজ্য দলের কীর্তি। কলকাতা, ১৩৩০। ২৯ পৃ।

চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, কংগ্রেস সংগঠনে বাংলা। কলকাতা, ১৩৬১। ৮৬ পৃ।
জীবনকুমার ঠাকুরতা, দাদাভাই নৌরজী। কলকাতা, ১৩৩১। ১৫৪ পৃ।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, লাজপৎ রায়। কলকাতা, ১৩২৮। ৪০ পৃ।
নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, ডাঃ বিধানরায়ের জীবনচরিত। কলকাতা, ১৩৬৩। ৫৬০ পৃ।
বসন্তকুমার দাস, কংগ্রেস বাণী। কলকাতা ও মেদিনীপুর, ১৩৩৪। ১০ পৃ।
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—গঠনতন্ত্র। কলকাতা, ১৩৫৬। ১৬ পৃ।
মধুসূদন মজুমদার, দেশপ্রেমিক বিপিনচন্দ্র। কলকাতা, ১৩৫৬। ৪৪ পৃ।
মোহাম্মদ শামসুর রহমান চৌধুরী, মহম্মদ আলি। কলকাতা, ১৩৫৮। ১০০ পৃ।
রেজাউল করিম, মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ। কলকাতা, ১৩৬৫। ১১৮ পৃ।
সুধীরকুমার সেন, মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। কলকাতা, ১৩৫৩। ১০৪ পৃ।

'স্বদেশী আন্দোলন'

অক্ষয়শংকর ভট্টাচার্য, স্বদেশী গান। জলপাইগুড়ি, ১৯২২।
১৯০৫ (উনিশ শ' পাঁচ) সালে বাংলা। কলিকাতা, ১৯৩০।
উমা মুখোপাধ্যায়, "বন্দে মাতরম" ও যুবক বাংলা। কলিকাতা, শিক্ষাতীর্থ কার্য্যালয়। ২০ পৃ।
উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, "জাতীয় শিক্ষা" আন্দোলনে সতীশচন্দ্র ও অরবিন্দ (১৯০৫—১৯১০)। কলিকাতা, শিক্ষাতীর্থ কার্য্যালয়, ১৯৫৩। ১৬ পৃ।
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে "যুগান্তর" পত্রিকার দান বা শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার বিপ্লববাদ। কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২। ২০২ পৃ।
স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫)। কলিকাতা, শিক্ষাতীর্থ কার্যালয়। ১৯৫৩। ২৫ পৃ।
উমাকান্ত হাজরা, বঙ্গ জাগরণ ও স্বদেশের নানা কথা। কলিকাতা, ১৯০৬। ১০৬ পৃ।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ। কলকাতা, নবভারত, ১৯৫৬। ৮৩৬ পৃ।

চারুচন্দ্র বসু মজুমদার, বর্তমান সমস্যা ও স্বদেশী আন্দোলন। কলিকাতা, ১৯০৫।

নরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বদেশী সংগীত। কলিকাতা, শীল এণ্ড ব্রাদার্স, ১৯০৭।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, উনিশ শ পাঁচ। কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৪৯। ১৪৭ পৃ।

বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী, স্বদেশী সংগীত। বরিশাল, ১৯২১।

মতিলাল রায়, স্বদেশী যুগের স্মৃতি। কলিকাতা, প্রবর্তক পাবলিসিং হাউস, ১৯৩১। ১৭২ পৃ।

যোগেন্দ্রনাথ শর্মা (সংকলক), স্বদেশী সঙ্গীত। কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৩১২। ৬৮ পৃ।

লিস্ট, ফ্রেডরিচ, স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি। কলিকাতা, ১৯৩২।

হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ। কলকাতা, ১৯৬১।

— উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। কলকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১। ২২৮ পৃ।

— জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কলকাতা, ফার্মা কে. এল. ১৯৬০। ১৬০ পৃ।

সুরথকুমার বসু, স্বদেশীর কারাবাস। কলকাতা, ১৯০৬।

অনিলবরণ রায়, স্বরাজের পথে। কলকাতা, ১৩২৮। ৫৪ পৃ।

অরবিন্দ ঘোষ, ধর্ম ও জাতীয়তা। কলকাতা, ১৩২৭। ১০৯ পৃ।

ভারতের নবজন্ম। কলকাতা, ১৩৩২। ১০৮ পৃ।

অরুণচন্দ্র গুহ, দেশ পরিচয়। (১৩৩৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)।

কালিদাস মুখোপাধ্যায়, মুক্তি আন্দোলনে অভেদানন্দ। কলকাতা, ১৩৫৫। ৬৪ পৃ।

প্রফুল্লকুমার সরকার, জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ। ২য় সং, কলকাতা, ১৩৫৪। ১১৬ পৃ।

সুরেন্দ্রনাথ সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত। কলকাতা, ১৩৩৮। ৭১ পৃ।

শরৎকুমার রায়, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত।

প্রিয়নাথ গুহ, যজ্ঞভঙ্গ বা বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির ইতিহাস। কলকাতা, ১৩১৪। ১৪৩+১৭৩ পৃ।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ (১৩৩৯ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

মুকুন্দ দাস, পথের গান। (১৩৩৯ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

মুরারীমোহন ঘোষ, বন্দীর ব্যথা (১৩২৯ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য। কলকাতা, ১৯৬০।

জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন

অজয় ঘোষ, ভগৎ সিং—তাঁর সহকর্মীরা। ১৩৫৩। ৫২ পৃ।

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা। কলকাতা, পপুলার লাইব্রেরী। ১৩৬৫। ১৬৮ পৃ।

অরবিন্দ ঘোষ, কারা কাহিনী, প্রবর্তক পাবলিসিং, চন্দননগর। ১৩২৮। ৯৬ পৃ।

অরুণচন্দ্র গুহ, বিদ্রোহী প্রাচ্য (বিদ্রোহী প্রাচ্য গ্রন্থ ১৩৩২ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

অসীমানন্দ সরস্বতী, বিপ্লবের শিখা। ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬২। ১৪২ পৃ।

আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত, চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী। কলকাতা, পূরবী, ১৩৫৫। ২৪৮ পৃ।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন। ১৩৬৩। ২১৪ পৃ।

ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র, শহীদ ক্ষুদিরাম। ১৩৫৫। ২০১ পৃ।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্বাসিতের আত্মকথা। ৩য় সং, ১৩৫৩। ১৩২ পৃ। শেষ সং, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ১৯৭৬। ১২৪ পৃ।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ। ১৩৫৭। ১৯২ পৃ।

কমলা দাশগুপ্ত, রক্তের অক্ষর। কলিকাতা, নাভানা, ১৩৬১। ১৯৮ পৃ।

কল্পনা দত্ত, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা (১৯৫২ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত), কলকাতা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৪৬। ১৩৮ পৃ।

কালীচরণ ঘোষ, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (দুই খণ্ড), বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবের পূর্বাপর ইতিবৃত্ত। কলকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, ১৯৭৩।

গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য, স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ১৩৫৬। ২য় খণ্ড।

গোপালচন্দ্র রায়, শহীদ। ১৩৫৫। ১০১ পৃ।

চারুবিকাশ দত্ত, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। ১৩৫৫। ২৯১ পৃ।

চন্দ্রকান্ত দত্ত, বাংলার বিপ্লবী। ১৩৬৬। ১৪৮ পৃ।

চিন্মোহন সেহানবীশ, রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী। মনীষা, ১৯৭০। ৪২৫ পৃ।

চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৮৫।

জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী, পথের পরিচয়। ১৩৬৩। ১১৫ পৃ।

— বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচী (১৩৩৭ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)।

— বিপ্লবের তপস্যা। ১৩৫৬। ১১৮ পৃ।

নলিনীকিশোর গুহ, বাংলায় বিপ্লববাদ, শেষ সংস্করণ। কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, ১৯৬৯। ৩৬৮ পৃ।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, শেষ সংস্করণ। নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮০।

— ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। কলকাতা, ৩য় সং, বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৯। ২৩২ পৃ।

অনন্ত সিং, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ। গড়িয়া সেন অ্যাণ্ড কোং, ১৯৬৮। দুই খণ্ড। ভূমিকা: গণেশ ঘোষ।

শিব বর্মা, শহীদ স্মৃতি। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৩।

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, বন্দীজীবন, (২ খণ্ড)। কলকাতা, ১৯২২।

নলিনী দাস, দ্বীপান্তরের বন্দী, মনীষা, ১৯৭৪। ১৯২ পৃ।

বাসুদেব মোশেল, সখারাম গনেশ দেউস্কর ও ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ।

আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত, মাষ্টারদা। কলকাতা, পূরবী, ১৩৫৫। ১০৮ পৃ।
চন্দ্রকান্ত দত্ত, শহীদ সূর্য সেন। কলকাতা, বাণীবিথি, ১৩৫৬। ২২ পৃ।
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, বিপ্লবী বাংলা (১৩৩৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)
তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী, বিপ্লবী ভারত। কলকাতা শ্রী। ১৩৫৫। ১৩৩ পৃ।
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, জেলে ত্রিশ বছর। কলকাতা, আনন্দ হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ১৩৫৫। ১৭৯ পৃ।
দীনেন্দ্রকুমার রায়, অরবিন্দ প্রসঙ্গ। ১৩৩০। ৮৪ পৃ।
নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বড় বিপ্লবের এক অধ্যায়। চন্দননগর, ১৩৬১। ১৫৪ পৃ।
— স্বাধীনতা পূজারী শ্রীশ্রীচন্দ্র মিত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামে কলিকাতায় পিস্তল লুঠ। ১৯১৪। ১৩৫৫। ১৬ পৃ।
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন বসু। ১৩৫৭। ৪৫ পৃ।
দেবপ্রসাদ ঘোষ, সতের বছর পরে। ১৩৪৫। ১২৯ পৃ।
দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়, তখন আমি জেলে। কলকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড। ১৩৬৩। ৫১৭ পৃ।
নগেন্দ্রকুমার গুহ, স্বাধীনতার কথা। ১৩৩২। ১৬৭ পৃ।
নগেন্দ্রকুমার রায়, শহীদ যুগল। ১৩৫৫। ২৫২ পৃ। (ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর কথা)।
নজরুল ইসলাম, চন্দ্রবিন্দু (১৩৩৭) সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)
— বিষের বাঁশী (১৩৩১ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অবিস্মরণীয় মুহূর্ত, ২য় সং। ১৩৬২। ২১৫ পৃ।
— বাঘাযতীন, কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির। ১৩৫৭। ১৪৭ পৃ।
— কানাইলাল। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির। ১৩৫৬। ৪৭ পৃ।
— বারীন ঘোষ, কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির। ১৩৫৯। ৪২ পৃ।
— মাতঙ্গিনী হাজরা। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটির। ১৩৫৮। ৪৬ পৃ।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বীর সাভারকর। ১৯৫৮। ৪৭ পৃ।

— মুক্তিপথে ভারত। কলকাতা, ১৩৫৪। ১৪০ পৃ।

পদ্মনাভ, বিপ্লবের সপ্তশিখা। কলকাতা, রিডার্স কর্ণার। ১৩৫৬। ১২৫ পৃ।

পুলকেশচন্দ্র দে সরকার, বিপ্লব পথে ভারত। (১৩৩৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

— ফাঁসীর আশীর্বাদ, ২য় সং, ১৩৫৬। ১০৬ পৃ।

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, বিপ্লবের পথে। ১৩৬৪। ২৩০ পৃ। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিপ্লবী যুগের কথা। বুকল্যাণ্ড, কলকাতা, ১৩৫৫। ১০৪ পৃ।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুক্তিপথে (১৩৩৭ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, বিপ্লবী জীবন। কলকাতা, নিমাই প্রকাশ মন্দির, ১৩৬১। ২০১ পৃ।

প্রমোদকুমার, শ্রীঅরবিন্দ (জীবন ও যোগ)। ১৩৪৬। ২৩০ পৃ।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল। ১৩৬২। ১২০ পৃ।

প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিপ্লব ও ছাত্র সমাজ (১৩৩২ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

— বঙ্গ বিভাগ। ১৩৫৪। ৭০ পৃ।

— বাঘা যতীন। বিপ্রভাণ্ডার, চন্দননগর। তারিখ নাই।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য, বিপ্লবী বাংলা বা স্বাধীনতার ইতিহাস। ১৩৫৬। ৫৩৬ পৃ।

রাসবিহারী বসু, আত্মকাহিনী (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত, প্রবর্তক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)

ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ। কলকাতা, তারিখ নেই।

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, বাঘা যতীন। ১৩৬৫। ১৩৪ পৃ।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, মানুষ গড়া। কলকাতা, ১৩৩৩। ৭৫ পৃ।

— পথের ইঙ্গিত। ১৩৩৭, কলকাতা। ৬৭ পৃ।

— দ্বীপান্তরের কথা। কলকাতা, আর্য পাবলিসিং। ১৯২০। ১০৮ পৃ।

— মায়ের কথা।

বাস্তুহারা, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী। ১৩৫৯। ৫৩ পৃ।

বিজনবিহারী বসু, কর্মবীর রাসবিহারী। মানভূম, ১৩৬৩। ৩৪৪ পৃ।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, কালের ভেরী (১৩৩৭ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

— বিদ্রোহীর স্বপ্ন। ১৯৪৬। ৬২ পৃ।

— স্বরাজ সাধন। (১৯২৯ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

বিজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.), স্বাধীনতার অঞ্জলি। কলকাতা। ১৯৫৫। ১৬০ পৃ।

বিমলপ্রতিভা দেবী, নতুন দিনের আলো (১৩৪৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

রাজকমল নাগ, বিপ্লব যুগের যুগল বলি। কলকাতা, রজত বসু কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৬২। ২৫৬ পৃ।

রাখাল ঘোষ, বিপ্লবী অবনী মুখার্জী। ঢাকা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৬। ১৬১ পৃ।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধানন্দ। ১৩৫৪। ১৪৮ পৃ।

রবীন্দ্রকুমার বসু, মুক্তি সংগ্রাম। কলকাতা, রবীন্দ্র লাইব্রেরী। ১৩৫৬। ৩৬৭ পৃ।

মোহিত মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), বিপ্লবী বাংলা। কলকাতা, ১৩৫৪। ৪৭ পৃ।

ব্রজবিহারী বর্মণ রায়, ক্ষুদিরাম। ৩য়সংস্করণ। ১৩৬০। ১০৩ পৃ। (১৩৩১সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

— তরুণ বাংলা (১৯৩১ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)। বর্মন পাবলিসিং, ১৪৫ পৃ।

— ফাঁসীর সত্যেন। (১৩৫৭ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

— বিপ্লবী কানাইলাল। ১৩৫৪। ৭০ পৃ।

— বীর বাঙ্গালী যতীন দাস। (১৩৩২ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়, বিপ্লব তীর্থে (বিনয় বাদল দীনেশ)। ১৯৫৩। ২১৯ পৃ।

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি। কলকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, ১৩৬৩। ৬৬৭ পৃ।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যুগ সমস্যা। ১৩৩৩। ৮০ পৃ।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ঋষি অরবিন্দ। ১৩৪৭। ১১১ পৃ।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা মায়ের শহীদ ছেলে। ১৩৫৫। ১৫০ পৃ।

মণীন্দ্রনারায়ণ রায়, কাকোড়ী ষড়যন্ত্র। কলকাতা, বর্মন পাবলিসিং। ১৩৫৪। ১২৬ পৃ। (১৩৩৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

মতিলাল রায়, আমার দেখা বিপ্লবী। ১৩৬৪। ১৬৫ পৃ। প্রবর্তক।

— কানাইলাল (সচিত্র)। ৩য় সং, কলকাতা, প্রবর্তক, ১৯৬৭। ৫৮ পৃ।

— শতবর্ষের বাংলা (১৩৩২ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

মদনমোহন ভৌমিক, আন্দামানে দশ বৎসর। কলকাতা, যুগবাণী সাহিত্য চক্র। ১৩৩৭। ১২৪ পৃ। দু'খণ্ড।

মন্মথনাথ গুপ্ত, কাকোরী ষড়যন্ত্রের স্মৃতি। কলকাতা শান্তি লাইব্রেরী ১৩৬৬। ১৫৬ পৃ।

মৃত্যুঞ্জয় দে, শহীদ ক্ষুদিরায ও প্রফুল্ল চাকী। কলকাতা, মানবেন্দ্র পাবলিসিং হাউস, ১৩৫৫। ৪২ পৃ।

স্বদেশরঞ্জন দাস, সর্বহারার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি (১৩৫৩ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

স্বরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী তারক দাস, কলকাতা, ১৩৬৫। ৪০ পৃ।

হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়, কলকতা, ১৩৬১। ১৫৪ পৃ।

হেমচন্দ্র কানুনগো, বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা। কলকাতা, কমলা বুক ডিপো, ১৯২৮। ৩৫৮ পৃ।

হেমন্তকুমার সরকার, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সম্মেলন (৩১/১২/৪৬), অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৫৩। ১০ পৃ।

— বন্দীর ডায়েরী, কলকাতা, ১৩২৯। ১৩৪ পৃ।

— স্বরাজ কোন পথে? কলকাতা, ১৯২২।

হেমন্ত চাকী, অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী, কলকাতা, জেনারেল, ১৩৫৯। ১৮৪ পৃ।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ওঙ্কারনাথ গুপ্ত, বিপ্লবী ভারতের কথা, কলকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৩৫৬। ১৩০ পৃ।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতের বিপ্লব কাহিনী। ৩ খণ্ড। ১ম ১৩৫৪, ২য়+৩য় ১৩৫৫। ২২৮+২৫৭ পৃ।

সুপ্রকাশ রায়, ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, কলকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৩৬২। ৬২২ পৃ।

অখিলচন্দ্র নন্দী, বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ। কলকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, ১৯৭৬। প্রথম ১৭৬ পৃ। ভূমিকা : গোপাল হালদার।

অজিত রায় চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি। কলকাতা, ১৯৭২। ৬৪ পৃ।

অতুলচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরে বোমা ও পিস্তল। কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, ১৩৬৯। ১৩৮ পৃ।

অনন্ত ভট্টাচার্য, আন্দামান বন্দী। দ্বিতীয় সং, কলকাতা, মিত্রালয়। ১৯৫৬। ৮০ পৃ।

অনন্ত সিংহ, অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম। কলকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৯৬৮।

অনন্ত সিংহ, মহানায়ক সূর্য সেন ও চট্টগ্রাম বিপ্লব। কলকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ। ১৩৭৬। দুই খণ্ড।

অনন্ত সিংহ, সূর্য সেনের স্বপ্ন ও সাধনা। কলকাতা, বিশ্ববাণী, ১৩৮৪। ৪০৮ পৃ।

অনিলবরণ রায়, স্বরাজের পথে। ২য় সং, কলকাতা, সরস্বতী পুস্তকালয়। ১৯২১। ৫৪ পৃ।

অনিলচন্দ্র রায়, দল ও নেতা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ। কলকাতা, জয়শ্রী কার্যালয়, ৫৫ পৃ।

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বহির্ভারতে ভারতের মুক্তি প্রয়াস। ফার্মা কে. এল, কলকাতা, ১৯৬২। ১১৫ পৃ।

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ, অগ্নিযুগের নায়ক। কলকাতা, তুলি-কলম, ১৯৭০।

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ, শত শহীদের রক্তে। কলকাতা, ১৯৭০।

অমলেন্দু ঘোষ। বিপ্লব ও বিপ্লবী। কলকাতা, ১৯৭৬।

অমিতা রায়, বিপ্লবী অবনীনাথ মুখার্জী। ২য় সং, কলকাতা, ১৯৬৯।

আওয়াল ম. আ (সম্পাদক) অগ্নিযুগের অগ্নিদিন ১৮ই এপ্রিল। চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা সংসদ, ১৯৭৫। ৬২ পৃ।

আনন্দ গুপ্ত, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

আশা দাস, ত্রিশের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। কলকাতা, ১৯৮০। ১২৮ পৃ।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন। কলকাতা, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। ২:৪ পৃ।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম। কলকাতা, ১৪২ পৃ।

ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র, শহীদ ক্ষুদিরাম। কলকাতা, বিদ্যাশ্রী, ১৯৪৮। ২০১ পৃ।

উল্লাসকর দত্ত, আমার কারাজীবন। ১ম খণ্ড, কলকাতা, তারিখ নেই।

কল্পনা দত্ত, ক্ষুদিরাম। ১৩৫৫। ২০১ পৃ।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্ধ কারার অন্তরালে। কলিকাতা, সত্যব্রত লাইব্রেরী। ১৩৫৫। ১১২ পৃ।

কালীচরণ ঘোষ, মাতৃমঞ্চ। কলকাতা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৬২। ১৩৬ পৃ।

কালীপদ ভট্টাচার্য, জালালাবাদ যুদ্ধের পরিশিষ্ট। কলকাতা, শোভনা প্রেস, পাবলিকেশনস্, ১৩৬৭।

কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, স্বরাজচিন্তা। বরিশাল, ১৯২৫।

কালীপদ বাগচী, বিপ্লবী যতীন্দ্রমোহন রায়। কলকাতা, যতীন্দ্রমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি, ১৩৭২। ১১২ পৃ।

কালিদাস মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, মুক্তি আন্দোলনে অভেদানন্দ। কলকাতা, শিক্ষাতীর্থ কার্যালয়, ১৯৪৮। ৬৪ পৃ।

কুন্দ প্রভা সেন, কারা-স্মৃতি। ২য় সংস্করণ, চট্টগ্রাম, ইউরেকা, ১৩৫৮। ১৯৪ পৃ।

গণেশ ঘোষ, বিপ্লবী সূর্য সেন। কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬। ৯২ পৃ।

ক্ষীরোদকুমার দত্ত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি, ১৯৭৭। ১৩১ পৃ।

— ,বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার। কলকাতা, অধ্যয়ন, ১৩৭৯। ১৯৪ পৃ।

গণেশ ঘোষ, মুক্তিতীর্থ আন্দামান। কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৭৭। ১৬৫ পৃ।

ক্ষীরোদকুমার দত্ত, অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির। কলকাতা, অনুশীলন ভবন। ৮৪ পৃ।

— , বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা, কলকাতা, অনুশীলন ভবন, ১৩৭৩। ২২৪ পৃ।

ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক, অগ্নিযুগের পথচারী। ২৪ পরগণা। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৬৮।

— অগ্নিযুগের ফেরারী। কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, ১৩৭০। ৩০৪ পৃ।

গোপাল ভৌমিক, বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৪। ৭৮ পৃ।

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, বাংলার নায়ক যতীন্দ্রনাথ। কলকাতা।

জীবন মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয়, ১৩৮৩। ৪৭ পৃ।

জগদানন্দ বাজপেয়ী, শহীদ স্মৃতি তর্পণ। ১৯৬৪।

জয়দেব কাপুর, সম্পাদক, যতীন্দ্রনাথ দাস। কলকাতা, শহীদ যতীন দাস সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি, ১৯৮০। ৩৮ পৃ।

জিতেন ঘোষ, গরাদের আড়ালে থেকে। ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান। ১৯৭০। ২৩১ পৃ।

— , জেল থেকে জেলে। ঢাকা, স্টুডেন্টস্ পাবলিকেশন, ১৩৭৬। ২৫৫ পৃ।

জীবনতারা হালদার, অনুশীলন সমিতির ইতিহাস। কলকাতা, ১৩৮৩।

— বন্দেমাতরম: অনুশীলন সমিতির ইতিহাস। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা, ১৯৭৭। ৭২ পৃ।

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী, বিপ্লবী বাংলা: ১৭৫৭-১৯১২; কলকাতা, মিত্রালয়। ২৪৯ পৃ।

তুষার চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশ বছর। কলকাতা, মনীষা পুস্তকালয়, ১৯৭৫। ১৩২ পৃ।

তুষারকান্তি দাশগুপ্ত ও দিলীপকুমার সেন, বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন। বারাসত, ১৯৭৪।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, জীবনস্মৃতি। কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৭৬। ১৩৫ পৃ।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, জেলে তিন বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম। ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬২।

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল, সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়। কলকাতা, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ১৯৬৫। ৭৬ পৃ।

বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সংকলক), বাঘা যতীন ও বালেশ্বর সংগ্রাম ষষ্ঠি বৎসর পূর্তি উপলক্ষে হীরক জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ। কলকাতা, বালেশ্বর সংগ্রাম হীরক জয়ন্তী উৎসব কমিটি, ১৯৭৫। ৬২ পৃ।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ। কলকাতা, ১৯৩৪।

নিরঞ্জন সেন, বীর বিপ্লবী সূর্য সেন। ১৩৫৩। ২৫ পৃ।

— (সম্পাদক) বাংলার বীর বন্দীরা। কলকাতা, ১৯৪৫। ১৬৪ পৃ।

— (সম্পাদক), বিপ্লবী লালমোহন। কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৭৪। ৯১ পৃ।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবের সন্ধানে। কলকাতা, ডি এন বি এ ১৯৬৭। ৩৯১ পৃ।

— স্বাধীনতার পথ। কলকাতা, ১৯৩০।

নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসু। কলকাতা, প্রবর্তক, ১৯৬০।

নলিনীকিশোর গুহ, বিপ্লবের পথে। কলকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯২৬। ১০৩ পৃ।

— ভারতের দাবী। কলকাতা, ১৩৩২। ৭৩ পৃ।

নলিনীকান্ত গুহ, স্বরাজ গঠনের ধারা। কলকাতা, ১৯২৫। ৮০ পৃ।

নলিনীকান্ত গুপ্ত, স্বরাজের পথে। কলকাতা, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ১৯২৩। ১১৫ পৃ।

— ; স্মৃতির পাতা। কলকাতা, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৩৭৪। ২য় খণ্ড।

নীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মুক্তিপীঠ আন্দামান। কলকাতা, ক্লাসিকাল, ১৯৭৫। ২৩৫ পৃ।

পুরঞ্জয় প্রসাদ চক্রবর্তী; রক্তে রাঙ্গা জালিয়ানওয়ালাবাগ। কলকাতা, ১৯৭৫।

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, বিপ্লবীর জীবনদর্শন। কলকাতা, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩৮৩। ৩৮০ পৃ।

পূর্ণচন্দ্র দে, মৃত্যুঞ্জয়ী কানাইলাল। চন্দননগর, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬২। ১২০ পৃ।

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, সে যুগের আগ্নেয় পথ। কলকাতা, ১৯৬০।

বলাই দেবশর্মা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। কলকাতা, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ১৯৬১। ১২৭ পৃ।

বসন্তকুমার দাস, মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রাম। মেদিনীপুর, ১৯৭৫। ১০০ পৃ।

বামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, স্বাধীনতার অভিযান যুগে যুগে। কলকাতা, এণাক্ষী গ্রন্থ মন্দির, ১৯৪৭। ১১৪ পৃ।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অগ্নিযুগ। কলকাতা, বুক করপোরেশন, ১৩৫৫। ১ম খণ্ড।

— , আমার আত্মকথা। কলকাতা, আর্য্য পাবলিশিং হাউস ১৩৩৮। ১৮৮ পৃ।

— নূতন সমাজের ইঙ্গিত। কলকাতা, বিজলী সাহিত্য মন্দির, ১৯৩১। ৫৫ পৃ।

— বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী : ধরপাকড়ে যুগ। কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৭৯। ১১৫ পৃ।

বিনয়জীবন ঘোষ, অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র। কলকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯৫২। ১৫৬ পৃ।

— বিপ্লবী মেদিনীপুর। কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৭৬। ১০৪ পৃ।

বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ, ১৯৩০। আলেখ্যমালা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত। কলকাতা, ১৯৭০।

বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চট্টগ্রাম। কলকাতা।

ঐ, সূর্যসেন স্মৃতি। গ্রন্থমেলা, কলকাতা, ১৯৭১। ২২৭ পৃ।

বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী স্মারক সমিতি, যাঁদের রক্তে স্বাধীনতা। কলকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম খণ্ড।

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, সেই মহাবরষার রাঙ্গা জল। কলকাতা, ১৯৭৪। ৪২ পৃ।

বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্নিযুগের মানুষ। হাওড়া, ১৯৬৫।

বিশ্ব বিশ্বাস, বিপ্লবী সূর্য সেন : মাস্টারদা। কলকাতা, ১৯৬৯।

বীনা দাস (ভৌমিক), শৃঙ্খল ঝংকার। কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৫৫। ১৮৭ পৃ।

বীনা দাস (ভৌমিক) সংকলিত, স্মৃতিতীর্থ। কলকাতা, লেখিকা কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৫৯।

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, অগ্নিযুগের ব্রহ্মা। কলকাতা, সুশীলা প্রকাশনী, ১৩৭৪।

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস, অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস। কলকাতা, অনিলকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৭। ৮৯ পৃ।

ব্রহ্মচারী বঙ্কিম, স্বাধীনতা সংগ্রামে সূতাহাটা। মেদিনীপুর, শহীদ পাঠাগার, ১৯৭৭। ১৬৪ পৃ।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, আমার ভারত উদ্ধার। চন্দননগর, প্রবর্তক পাবলিশার্স হাউস।

ভবতোষ রায় (সম্পাদক), বিপ্লবী পুলিন দাস। কলকাতা, গীতা পাবলিশিং, ১৯৬৫। ২৮৪ পৃ।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, সবার অলক্ষ্যে (বাংলার বিপ্লব ইতিহাসের অপ্রকাশিত কাহিনী)। কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৭৩। ২ খণ্ড।

— ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব। কলকাতা, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৯৭০। ৫৭২ পৃ।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, বিপ্লবের পদচিহ্ন। বোম্বাই, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৩। ২৯২ পৃ।

মনোরঞ্জন গুপ্ত, আমার সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। ২৪ পরগণা। ৮৭ পৃ।

মনোরঞ্জন গুহ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। কলানবগ্রাম, বর্ধমান, ১৩৮৩। ৮৮ পৃ।

মনোরঞ্জন ঘোষ, চট্টগ্রাম বিপ্লব। কলকাতা, ১৯৭০।

— , বিপ্লবী মহানায়ক। কলকাতা, ১৯৭৬।

মালবিকা দত্ত ও অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম। কলকাতা, রবীন আঢ্য, ১৯৪৭।

— , মৃত্যুহীন। কলকাতা, বিপ্লবী নিকেতন, ১৯৭০। ২৩১ পৃ।

মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত, বিপ্লব সাধনায় নিবেদিতা। কলকাতা, অনির্বাণ প্রকাশনী, ১৩৬৩। ২৭০ পৃ।

মেদিনীপুর ও বিপ্লববাদ। কলকাতা, বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস। ১০ পৃ।

যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনতার সন্ধানে। কলকাতা, ১৯৭৭। ৪৮৮ পৃ।

রাখালচন্দ্র দে, বন্দীর জীবন স্মরণিকা। জলপাইগুড়ি, বিদ্যাশ্রম, ১৯৭৪। ১৪৯ পৃ।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য, বিপ্লবী বাংলা বা স্বাধীনতার ইতিহাস। কলকাতা, স্টুডেন্টস লাইব্রেরী, ১৯৪৯। ৫৩৬ পৃ।

রাসবিহারী বসু, বিপ্লবীর আহ্বান। কলকাতা বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৯৩ পৃ।

ললিতমোহন সান্যাল, বিপ্লব-তাপস ত্রৈলোক্যনাথ। কলকাতা, মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা কমিটি, ১৯৭৪। ২০১ পৃ।

শচীন্দ্রনাথ গুহ (সম্পাদক), চট্টগ্রাম : বিপ্লবের বহ্নিশিখা। কলকাতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম পরিষদ, ১৯৭৪। ৩৮৬ পৃ।

শান্তিকুমার মিত্র, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। ২য় সং, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু স্মারক সমিতি, ১৯৬৮। ৬০ পৃ।

শান্তিসুধা ঘোষ, বীর সংগ্রামী সতীন্দ্রনাথ সেন। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৮। ২৫৪ পৃ।

শৈলেন দে, অগ্নিযুগ। কলকাতা, পূর্ণ প্রকাশন, ১৯৭৮। ২৮৩+৩৮৭ পৃ।

— ফাঁসির মঞ্চ থেকে। কলকাতা, তুলি-কলম, ১৯৭২। ১৬৩ পৃ।

— রক্তঝরা দিনগুলি, কলকাতা, ১৯৭৭।

— রক্ত দিয়ে গড়া, কলকাতা, ১৯৬৬।

— রক্তের অক্ষরে, কলকাতা, ১৯৭১।

— শপথ নিলাম, কলকাতা, ১৯৭০।

শৈলেশ বসু, ভারতীয় বিপ্লবের গোড়াপত্তন ও ক্রমবিকাশ। কলকাতা, বি. সিনহা, ১৯৫০। ১৯৮ পৃ।

সচ্চিদানন্দ সরকার, বাংলার দামাল ছেলে, কলকাতা, ১৯৭১।

সঞ্জয় রায়, বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জী, কলকাতা, ১৩৬০। ২৮ পৃ।

সতীন সেন, জেল ডায়েরী। কলকাতা, মিত্রালয়।

সতীশ পাকড়াশি, অগ্নিযুগের কথা। কলকাতা, ২য় সং, নবজাতক, ১৩৭৮। ২৬৪ পৃ।

সতীশচন্দ্র গুহ, যাঁদের ডাকে জাগল ভারত। কলকাতা, ১৩৫৫। ১৭৫ পৃ।

সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিপ্লবী মহানায়ক বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। কলকাতা, ১৯৭৫। ৮০ পৃ।

— মলঙ্গার হাবু ও রডা কোম্পানীর অস্ত্র লুঠ। কলকাতা, ১৯৭৮। ১ম খণ্ড।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিপ্লবী রাসবিহারী। কলকাতা, ১৩৩৫। ১২১ পৃ।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, বন্দীজীবন। কলকাতা, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, ১৩৫১। ১০৬ পৃ।

সান্ত্বনা গুহ, অগ্নিমন্ত্রে নারী। (১৩৩৯ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

সন্তোষকুমার অধিকারী, শহীদ যতীন দাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন। কলকাতা, জে. ঘোষ, ১৯৭২। ৯৯ পৃ।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা। কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৭৩।
হৃষীকেশ শীল, বিপ্লবী সাভারকর। ২য় সং, কলকাতা, ১৩৭৩। ২৩৬ পৃ।
হেমন্তকুমার সরকার ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবের পঞ্চঋষি। কলকাতা, ১৯২৩।
হেমন্তকুমার সরকার, স্বাধীনতার সপ্তসূর্য। কলকাতা, ১৯২৪।
হেমন্তকুমার গুপ্ত, স্বরাজে বঙ্গমহিলার কর্তব্য। সিরাজগঞ্জ, ১৩২৮।
হেমচন্দ্র কানুনগো, অনাগত সুদিনের তরে। কলকাতা, রেনেশাঁস, ১৯৪৫। ২২৬ পৃ।
হীরালাল দাশগুপ্ত, জননায়ক অশ্বিনীকুমার। কলকাতা, দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং, ১৯৬৯। ১১৮ পৃ।
হরিনারায়ণ চন্দ্র, বিপ্লবীর সাধনা। কলকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৪। ২ খণ্ড।
হরিদাস মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবের পথে বাঙ্গালী নারী। কলকাতা, ১৩৫২। ১৪০ পৃ।
সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্নিযুগের অগ্নিকথা। কলকাতা, মিত্র লাইব্রেরী, ১৯৪৯। ২৯১ পৃ।
সুবোধকুমার লাহিড়ী, বিপ্লবের পথে। কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৭। ১১০ পৃ।
সুধীর কুমার মিত্র, মহাবিপ্লবী রাসবিহারী। কলকাতা, হরিহর লাইব্রেরী, ১৯৪৮। ২০৭ পৃ।
নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতের বাণী ও যুগবার্তা। কলকাতা, ১৩২৯।
শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন। কলকাতা, ১৩৬৫। ২২১ পৃ।
শৈলেশনাথ বিশী, বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন। কলকাতা, ১৩৬৩। ১৪৩ পৃ।
সরোজকুমার সেন, ভারতে মুক্তির পন্থা। কলকাতা, ১৩২৮। ১৬ পৃ।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পথের দাবী। কলকাতা, ১৩৬৩ সং। ৪২৮ পৃ (১৩৩৪ সনে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)
শান্তি দাস, অরুণ-বহ্নি। কলকাতা, ১৩৫৮। ১২৯ পৃ।

সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, মরণজয়ী যতীন্দ্রনাথ দাস। কলকাতা, ১৩৩৬। ১৪৮ পৃ।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বন্দী (১৩৪২ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

— , মশাল (১৩৩১ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

বিপ্লবী নলিনী দাস স্মারক গ্রন্থ। কলকাতা, ১৯৮৫।

মুসলিম রাজনীতি ও পাকিস্তান আন্দোলন

অমলেন্দু দে, খাকসার আন্দোলনের ইতিহাস। কলকাতা, জ্ঞানান্বেষণ, ১৯৬৮। ১৮০ পৃ।

আবদুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন। ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৯। ২০৭ পৃ।

আবুবকর সিদ্দিকি, খেলাফৎ আন্দোলন পদ্ধতি। বরিশাল, ১৩২৮।

গোলাম আকবর আলি বেগ ও অক্ষয়চন্দ্র ভদ্র, খেলাফৎ ও মোস্লেম জগৎ। ঢাকা, ১৯২২।

তরিবুদ্দিন আহমেদ, খেলাফৎ সম্বন্ধে দুইটি কথা। ময়মনসিংহ, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২১। ১২ পৃ।

বীরেন্দ্রনাথ রায়, স্বরাজ ও খলিফত। কলকাতা, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব। ১৯২১।

শ্যামাপ্রসাদ বসু, ওয়াহাবি থেকে খিলাফত : একটি ব্রিটিশ-বিরোধী অধ্যায়। কলকাতা, ক্রান্তিক প্রকাশনী, ১৯৮১। ৯৬ পৃ।

গঙ্গাধর অধিকারী, পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য। কলকাতা, ১৩৫১।

মহম্মদ হবিবুল্লা, পাকিস্তান। কলকাতা, ১৩৩৮।

মুজিবর রহমান খাঁ, পাকিস্তান। ১৩৪৯।

ঐ — , পাকিস্তানের বিচার। ১৩৪৯।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, কায়েদে আজাম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। কলকাতা, (?) ১৩৫৫। ১০০ পৃ।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মুসলিম লীগ কী চায়। কলকাতা, ১৩৫৩। ২৫ পৃ।

হুমায়ুন কবির, মোসলেম রাজনীতি। ২য় সং, কলকাতা, ১৩৫২।
৭৬ পৃ।

অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক। কলকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৭২।

অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। কলকাতা, রত্না প্রকাশন ১৯৭৪।

এ. এস. এম. আবদুর রব, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও ঢাকা, ১৯৬৮।

আকবর উদ্দীন, কায়েদে আযম। ঢাকা, ১৯৬৯।

আবুল কাশেম, বাঙ্গলার প্রতিভা, কলকাতা, ১৩৩৭।

কালীপদ বিশ্বাস, যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়। কলকাতা, ১৯৬৬।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত। ১৩৫৩। ৩২৪ পৃ।

—, আমাদের স্বরাজ (ইণ্ডিয়ান হোমরুল এর বঙ্গানুবাদ)। ১৩৩৪। ৮৮ পৃ।

—, গান্ধী গভর্ণমেণ্ট পত্রালাপ (১৯৪২-৪৫)। নরেন্দ্র দে কর্তৃক অনূদিত। ১৩৫২। ৪০৬ পৃ।

—, দক্ষিণ আফ্রিকান সত্যাগ্রহ। ১৩৩৮। ৪৬০ পৃ।

—, বিলাতে ভারতের দাবী। হেমেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক অনূদিত। ১৩৩৯। ১৫৬ পৃ।

—, ভারত-ভাস্কর মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা ও উপদেশ। ১৩২৮। ২১ পৃ।

—, মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা ও উপদেশ। ১৩২৮। ৭৮ পৃ।

—, স্বরাজ। ১৩২৮। ১০ পৃ।

—, স্বরাজের পথে। ১৩২৭। ২২ পৃ।

—, হিন্দ স্বরাজ্য। ১৩৩৭। ১১৪ পৃ।

—, হিন্দুধর্ম ও অস্পৃশ্যতা। ১৩৩৯। ১০৭ পৃ।

—, গান্ধী রচনা সম্ভার। ৫ খণ্ড। কলকাতা, গান্ধী জন্ম শতবর্ষ কমিটি।

অনাথগোপাল সেন, জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজির অর্থনীতি । [illegible] অ্যাসোসিয়েট, কলকাতা । ১৩৫২ । ৯০ পৃ ।

অতুল্য ঘোষ, অহিংসা ও গান্ধী । কলকাতা, কংগ্রেস ভবন, ১৩৬১ । ১০৮ পৃ ।

অনাথনাথ বসু, গান্ধীজি । কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৭০ । ৬৮ পৃ ।

ঋষি দাস, গান্ধী-চরিত । ১৩৫৫ । ৩৯৯ পৃ ।

কানাই বসু, নোয়াখালির পটভূমিকায় গান্ধীজি । ১ম পর্ব । ১৩৫৩ । ১০৮ পৃ ।

কিশোরলাল মশরুওয়ালা, গান্ধী ও মার্কস । ১৩৬৩ । ১৩৪ পৃ ।

কৃষ্ণদাস, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাত মাস । ১ম খণ্ড । ১৩৩৫ । ৫৩৮ পৃ ।

দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অস্পৃশ্যতা বর্জনে মহাত্মাজী । ১৩৫৬, ৭৪ পৃ ।

নির্মলকুমার বসু, গান্ধীচরিত । কলকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং । ১৩৫৬, ২৩০ প ।

— , গান্ধীজি কি চান । কললাতা, ১৩৬৫ । ৮৬ পৃ ।

— , স্বরাজ ও গান্ধীবাদ । কলকাতা, আই. এ. পি, ১৩৫৪, ১৯৭ পৃ ।

— , বিয়াল্লিশের বাংলা । কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৮ ।

বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত, মহামানব মহাত্মা । ১৩৫০ । ১৭০ পৃ ।

বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় গান্ধীজি । ১৩৫৪ । ১৬৪ পৃ ।

মহাত্মা গান্ধী—কথা ও জীবনী । ১৩৩৭ । ২২ পৃ ।

মহম্মদ নাজিমোদ্দিন, মহাত্মা গান্ধীর ভ্রম । ১৩৩৩ । ২৪ পৃ ।

মনোজমোহন বসু, যুগবতার গান্ধী । (১৩২৮ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত) ।

মতিলাল রায়, অনশনে মহাত্মা । ১৩৩৯ । ১৯৭ পৃ ।

বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, গান্ধী হত্যার কাহিনী, ১৩৫৫ । ৩৩৯ পৃ ।

হেমেন্দ্রনাথ রায় (সঙ্কলিত), বিলাতে গান্ধীজি । ১৩৩৯ । ৩০১ পৃ ।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, গান্ধীজিকে জানতে হলে । ১৩৫৪ । ১৩৪ পৃ ।

এম. এল. দাঁতওয়ালা, গান্ধীবাদের পুনর্বিচার, ১৩৫৩ । ৫৩ পৃ ।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গান্ধীজির জীবন-যজ্ঞ। ১৩৩৮, ২০৮ পৃ।
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যাশ্রয়ী বাপুজী, ১৩৫৬, ১৬৯+৫ পৃ।
যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহাত্মা গান্ধী। ১৩২৫, ১২৩ পৃ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী। প্রবন্ধ ও অভিভাষণ। বিশ্বভারতী, ১৯৪৮।
লুই ফিশার, গান্ধী ও স্ট্যালিন। ১৩৫৮। ২৮২ পৃ।
শিবদাস চক্রবর্তী, হারিয়ে যারে জগত কাঁদে। ১৩৫৫। ১৮৯ পৃ।
শৈলেশ বসু, মহামানব, ১৩৫৫। ১৮৮ পৃ।
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, গান্ধীজি ও বিপিনচন্দ্র। ১৩২৮। ২৪ পৃ।
— , গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। ১৩২৮। ৩৫ পৃ।
— , গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন। ১৩২৮। ৪৪ পৃ।
— , গান্ধী না অরবিন্দ। ১৩২৭। ১৪ পৃ।
— , রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধী। ১৩২৮। ২৩ পৃ।
সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মহামানবের জীবন-কথা। ১৩৫৫। ৭৩ পৃ।
সুধীরকুমার মিত্র, আমাদের বাপুজী। ১৩৫৪। ১১২ পৃ।
সুবোধকুমার ঘোষ, অমৃতপথ যাত্রী। ১৩৫৯। ১৯০ পৃ।
শৈলেশ বসু, গান্ধীজির জীবন-চরিত। ১৩৫৫। ১৮৮ পৃ।
অমরনাথ রায়, কর্মবীর গান্ধীজি। কলিকাতা, বিদ্যাভারতী। ১৯৬৯। ৮১ পৃ।
অরুণ চন্দ্র গুহ, মহাত্মা গান্ধী। কলকাতা; ১৯২১।
আশুতোষ মহালনবীশ দাসগুপ্ত, সত্যাগ্রহ। কলকাতা, ১৯১৯। (মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বর্ণনা)।
ঋষি দাস, গান্ধীচরিত। কলকাতা, ১৯৪২।
গোপালচন্দ্র রায়; মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান। কলকাতা, বঙ্গবাসী লিঃ। ১৯৪৮। ৮৮ পৃ।
দিগীন্দ্র কিশোর রায়, মহাত্মা গান্ধীর জীবনী ও উপদেশ। ময়মনসিংহ। ১৯২০।
নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহাত্মার কারবাসে মায়ের ডাক। খুরুট, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯২২।

নিশীথনাথ কুণ্ডু, অহিংসা অসহযোগের কথা। দিনাজপুর, ১৯২৬। ৫৪ পৃ।

যদুনাথ মজুমদার, লবণ কর সত্যাগ্রহ ও মহাত্মা গান্ধীর জয়যাত্রা। কলকাতা জে. এন. মজুমদার। ৩৬ পৃ।

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা গান্ধী। কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯। ৭১ পৃ।

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, চম্পারণে সত্যাগ্রহ। কলকাতা, খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৯৩১। ১১৩ পৃ।

সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মহামানবের জীবনকথা। কলকাতা, ১৩৫৫। ৭৩ পৃ।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধী। কলকাতা, সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৯২১।

মহাদেব দেশাই, সিংহলে গান্ধীজি। কলকাতা, ১৩৩৮। অনুবাদক: সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

মহীতোষ রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), মহাত্মাজীর তিরোধানে। কলকাতা, ১৩৫৪।

সন্তোষ ঘোষ, নোয়াখালী ও গান্ধী। কলকাতা, ১৯৪৭।

সোমনাথ লাহিড়ী, গান্ধীজির উপবাসের পর দেশভক্তদের কর্তব্য। কলকাতা, ১৯৪৩।

পি. সি. যোশী (সম্পাদিত), গান্ধী-যোশী পত্রাবলী (বঙ্গানুবাদ)। কলকাতা, ১৯৪৫।

সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

সুভাষচন্দ্র বসু, নূতনের সন্ধান। কলকাতা, ১৩৩৭। ১৫২ পৃ।

— বাংলার মা ও বোনেদের প্রতি। কলকাতা, ১৩৫৩। ৫০ পৃ।

— ভারত পথিক। কলকাতা, সিগনেট বুকশপ, ১৩৫৭। ১১২ পৃ।

— মুক্তিসংগ্রাম (১৯৩৫-৪২)। কলকাতা, বেঙ্গল পাবলি-

শাস', ১৯৫৩। ১০৮ পৃ। অনুবাদ: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

— তরুণের স্বপ্ন। কলকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, জ্বলন্ত তলোয়ার (১৩৫৮)। ১১৮ পৃ।

হেমন্তকুমার সরকার, সুভাষের সঙ্গে বারো বছর (১৯১২-২৪)। ১৩৫৬। ১৫২ পৃ।

অনিল রায়, নেতাজীর জীবনবাদ। কলকাতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী (তাং নেই)। ১৪৬ পৃ।

উমাপদ খাঁ, নেতাজীর পদক্ষেপ। ১৩৫৯। ৬৫ পৃ।

সমর গুহ, নেতাজীর মত ও পথ। ১৩৫৫। ১৮৪ পৃ।

সমর গুহ, নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা।

গোপাল ভৌমিক, নেতাজী। ১৩৫৩। ১৬৪ পৃ।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে। কলকাতা, আনন্দ-হিন্দুস্থান। ১৩৫৫। ১৫৯ পৃ।

সতীশচন্দ্র গুহ দেববর্মা, আমাদের নেতাজী। ১৩৫৬। ১০২ পৃ।

সতীকুমার নাগ (সম্পা) আজাদ হিন্দ ফৌজ। ১৩৫৩। ৯৬ পৃ।

জ্যোতিপ্রসাদ বসু, নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ। ১৩৫৩। ১৬৫ পৃ।

জ্যোতির্ময় ঘোষ, পলাশী হইতে কোহিমা। ১৩৫৬। ১২৮ পৃ।

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী, আজাদ হিন্দ ফৌজ। ২য় খণ্ড। কলকাতা, হিন্দুস্থান বুক ডিপো। ১৩৫৫।

শাহনওয়াজ খান, আজাদ হিন্দ ফৌজ। কলকাতা, ১৩৫৩। ৫৩০ পৃঃ।

দিলীপকুমার রায়, আমার বন্ধু সুভাষ। ১৩৫৫।

নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র। ১৩৫৯। ২৩২ পৃ।

প্রণবচন্দ্র মজুমদার, সুভাষবাদের অ আ ক খ। ১৩৬১। ১২ পৃ।

বিদ্যারত্ন মজুমদার, আজাদ হিন্দের অঙ্কুর। ১৩৫২। ১৭১ পৃ।

বিশ্বেশ্বর দাস, রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র। ১৩৪৫। ১৮২ পৃ।

এম. জি. মূলকর, আজাদী সৈনিকের ডায়েরী। কলকাতা ওরিয়েন্টাল এজেন্সী, ১৩৫৪। ১৫১ পৃ।

মুকুন্দলাল ঘড়াই, নেতাজী। ১৩৫৬। ৭৪ পৃ।

অতুলচন্দ্র বসু, প্রাচ্য দিগন্তে সুভাষচন্দ্র। মেদিনীপুর, মেদিনীপুর কোঅপারেটিভ প্রেস, ১৩৭০। ৫০ পৃ।

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নেতাজীর জয়যাত্রা। কলকাতা, নিউ বুক স্টল। তারিখ নেই। ৫২ পৃ।

অশোক মুস্তাফি, সুভাচন্দ্র ও ব্রহ্মদেশ। সুভাষ স্কুল অফ সোসাল এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল স্টাডিজ, কলকাতা। ১৯৭৮। ৬৮ পৃ।

উত্তমচাঁদ মালহোত্রা, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান কাহিনী। কলকাতা, এম. সি. সরকার, ১৩৫৩। ১৪১ পৃ।

কালীপদ ভট্টাচার্য, আজাদ হিন্দ ও নেতাজী। কলকাতা, ১৩৭৩।

জ্ঞানেন্দ্র নাথ চৌধুরী, জয়হিন্দ বা সোনার স্বপন। ঢাকা, অ্যালবার্ট লাইব্রেরী, ১৩৫৩। ৭১ পৃ।

পবিত্র মোহন রায়, নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস। কলকাতা, প্রান্তিক, ১৯৮০। ৯৫ পৃ।

প্যারী মোহন সেনগুপ্ত, জয় সুভাষ। কলকাতা। ১৩৫২।

বরুণ সেনগুপ্ত, নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

বিজয়রত্ন মজুমদার, আজাদ হিন্দের অঙ্কুর। কলকাতা, ১৯৪৫।

ভগৎরাম তলওয়ার, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান। কলকাতা, চলতি দুনিয়া, ১৯৭১। ৮২ পৃ।

মদন মোহন সিং, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, জাতীয় সংকট ও নেতাজী। দুর্গাপুর, ১৩৭১।

মহেন্দ্র নাথ গুহ (সংকলক), বাঙ্গালীর প্রতিভা ও সুভাষচন্দ্র। কলকাতা, গ্রন্থকার, ১৯৪৬। ১৩৭ পৃ।

মোহিতলাল মজুমদার, জয়তু নেতাজী। কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৫৩। ১৭৫ পৃ।

রমেন দাস, আজাদ হিন্দের শেষ লড়াই। কলকাতা, মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির। ১৯৪ পৃ।

শিশির কুমার বসু, মহানিক্রমণ। কলকাতা, আনন্দ, ১৯৭৫। ৮৯ পৃ।

শৈলেশ দে, আমি সুভাষ বলছি। কলকাতা, ১৯৭৭। ২ খণ্ড।

শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল রঞ্জন বসু রায়, বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র। কলকাতা, বুক কেবিন, ১৩৫৩। ৩৩৬ পৃ।

শ্যামল বসু, সুভাষ ঘরে ফেরে নাই। কলকাতা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন। ৩ খণ্ড।

সমীর ঘোষ (সম্পাদক), আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী। কলকাতা, ১৯৪৬। ৬০ পৃ।

সুভাষচন্দ্র বসু, কোন পথে? কলকাতা, কথা ও কাহিনী। ১৯৭৪।

— , পত্রাবলী। কলকাতা, এম. সি. সরকার, ১৯৬৪। ৩০৮ পৃ।

— , ভারতের মুক্তি সংগ্রাম : ১৯২০-১৯৪০। কলকাতা, ১৯৬৬।

— , নেতাজীর বানী। কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সনস্, ১৯৫৭। ১৯৩ পৃ।

— , চিঠি (মেজবৌদিকে)। কলকাতা, নবারুণ প্রকাশন, ১৯৬৯। ৭২ পৃ।

— , তরুণের স্বপ্ন, কলকাতা।

যুগবানী (পত্রিকা), নেতাজী সংখ্যা, ১৩৬৬।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। বিচিন্তা, ১৯৭৪, কলকাতা।

বামপন্থী আন্দোলন

নেপাল মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র। সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৬৮।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাত্রী। কলকাতা, জেনারেল প্রিণ্টার্স, ১৯৭৫। ২৭০ পৃ।

মুজাফ্ফর আহমদ্, ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ, ১৯৫২।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়, রুশ বিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৬৭।

— , ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট পার্টি। কলকাতা, ১৯৭৭।

সমরেন রায়, মানবেন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিক কমিউনিজম, ১৯৮৪।

শ্রীনিবাস সরদেশাই, ভারতবর্ষ ও রুশবিপ্লব। কলকাতা, ১৯৬৭।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, যুগ পরিক্রমা, দুই খণ্ড। কলকাতা, ১৯৬১।

মুজাফ্‌ফর আহমদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৭৪। ২ খণ্ড।
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ, ১৯২১—১৯৩৩। কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬০। ৩৬ পৃ।
সমকালের কথা। কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬৩। ১২৪ পৃ।

রণেন সেন, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ। কলকাতা, বিংশ শতাব্দী, ১৩৮৮। ২০৫ পৃ।

যোশী, পি. সি, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অভিযোগের উত্তরে কমিউনিস্ট-দের জবাব। কলকাতা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৪৫।

ভবানী সেন, মুক্তির পথে বাংলা। কলকাতা, ১৯৪৬।

গঙ্গাধর অধিকারী, পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য। কলকাতা, ১৯৪৪।

যোশী, পূরণ চাঁদ, কংগ্রেস লীগ মিলনের পথে স্বাধীন হও। কলকাতা, ১৯৪৬।

স্বদেশরঞ্জন দাস, সর্বহারার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি।(১৩৪৩ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা (১৩৪৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)।

বিনয় ঘোষ, ফ্যাসিজিম ও জনযুদ্ধ। কলকাতা, ১৩৪৯। ১১৪ পৃ।

হীরেন মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ। কলকাতা, ১৩৫০। ১০৩+৬৫ পৃ।

শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ভারতীয় রাজনীতি ও ডায়লেকটিক। কলকাতা, ১৩৫৫। ১৪২ পৃ।

সোমনাথ লাহিড়ী, সাম্যবাদ। কলকাতা, ১৯৩১ (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তরী হতে তীর। কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয়।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পেশোয়ার থেকে মীরাট। ১৯৮৫, কলকাতা।

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী। কলকাতা, ১৯৮৪।

জ্ঞান চক্রবর্তী, ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ। ঢাকা, ১৯৭২।

অনিল মুখোপাধ্যায়, শ্রমিক আন্দোলনে হাতেখড়ি। কলকাতা, ১৯৭০।
বরিশাল জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৮৪ (১৯৩০-১৯৪৭) কলকাতা।
ভবানী সেন, রচনাবলী। ২ খণ্ড, ১৯৭৫, কলকাতা।
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত): কমিউনিস্ট, ১৯৭৫, কলকাতা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ।
গোপাল হালদার (সম্পাদিত) বাংলার ফ্যাশিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য, ১৯৭৫।
চিন্মোহন সেহানবীশ, লেনিন ও ভারতবর্ষ, কলকাতা, ১৯৭০।
মঞ্জু ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়, লেনিন ও সমকালীন বাংলাদেশ। কলকাতা, ১৯৭০।
স্বদেশ রঞ্জন দাস, মানবেন্দ্রনাথ। কলকাতা, ১৯৬৬।
মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা। কলকাতা, ১৯৮৩।
রেণু চক্রবর্তী, ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (বঙ্গানুবাদ),। কলকাতা, ১৯৮০।
অশোক মিশ্র, (সংকলক), কমিউনিস্ট হলাম। মেদিনীপুর, ১৯৭৬।

স্বাধীনতার শেষপর্ব ও ভারত-বিভাগ

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন। কলকাতা, পুস্তকালয়। ১৯৪৮। ২৫৯ পৃ।
গোপালচন্দ্র রায়, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান। কলকাতা, ১৩৫৪।
দুর্গাপদ তরফদার, জাগ্রত কাশ্মীর। কলকাতা, ১৩৫৭।
পঞ্চানন চক্রবর্তী, যুদ্ধের পটভূমিকায় বাংলা। কলকাতা, ১৩৫৩।
পূরণ চাঁদ যোশী, রক্তক্ষয়ী পাঞ্জাব। কলকাতা, ১৩৫৪। ৬০ পৃ।
প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী, ভারতের সামন্ত রাজ্য। কলকাতা, ১৩৫৫। ৪১২ পৃ।
বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী, বিভক্ত ভারত। কলকাতা, ১৩৫৬। ১০২ পৃ।
বিমলচন্দ্র সিংহ, দেশের কথা। কলকাতা, ১৩৫৮। ১৭৪ পৃ।
ভবানী সেন, মুক্তির পথে বাংলা। কলকাতা, ১৩৫৩।

ভারতভঙ্গ আন্দোলন। কলকাতা, ১৩৫৪।

অমলেন্দু দে, স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা: প্রয়াস ও পরিণতি। কলকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৭৫। ১৪৮ পৃ।

ভূতনাথ ভৌমিক, ডোমিনিয়ান ভারতের পথরেখা।

ভূপেশচন্দ্র লাহিড়ী, বঙ্গে হিন্দু রাষ্ট্র চাই। কলকাতা, ১৩৫৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভ্যতার সঙ্কট। কলকাতা, ১৩৪৮।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ, খণ্ডিত ভারত। (অনুবাদ)। কলকাতা, ১৩৫৪।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাশের মন্বন্তর। কলকাতা, ১৩৫২।

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারত ও বর্তমান মহাযুদ্ধ। কলকাতা, ১৩৫১।

সুধাংশু সেন, ভারতীয় বাহিনীর নবজাগরণ (নৌবিদ্রোহের ইতিহাস)। কলকাতা, ১৩৫৪।

সুধীরকুমার মিত্র, নয়া বাংলা। কলকাতা, ১৩৫৩।

সুনীল কুমার গুহ, স্বাধীনতার আবোল-তাবোল। কলকাতা, ১৩৬৪।

ভবানী সেন, বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান। কলকাতা, ১৯৪৭।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্কলিত), মন্ত্রী-মিশন ও পরবর্তী অধ্যায়। কলকাতা, ১৯৪৭।

সন্তোষ ঘোষ, নোয়াখালী ও মহাত্মা গান্ধী। কলকাতা, ১৯৪৭।

আকবরউদ্দিন, কায়েদে আযম। ঢাকা, ১৯৬৯।

অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক। কলকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৭২।

এ. এস. এম. আবদুর রব, শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ঢাকা, ১৯৬৮।

সমর গুহ, প্রজা সোসালিস্ট পার্টি জন্ম ও ভূমিকা। কলকাতা, ১৩৬১। ৬৩ পৃ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মেলন: সভাপতির অভিভাষণ। তারকেশ্বর, ১৩৫৩। ১৬ পৃ।

রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অবন্তী সান্যাল ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়, রক্তের স্বাক্ষর, ডিসেম্বর ১৯৪৫। কলকাতা (ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)।

ভবানী সেন, পাকিস্তান বা সার্বভৌম যুক্ত বাংলা। কলকাতা, ১৯৪৭।

* কমনওয়েলথ রিলেশনস্ অফিস, লণ্ডন (পূর্বতন ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী) রক্ষিত ও ভারতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বাংলা বই ও পুস্তিকা (বর্ণানুক্রমিক সূচী)

অনন্তকুমার সেনগুপ্ত (সংকলক), **স্বরাজ গীতা**। ৩য় সং, কলকাতা, স্বরস্বতী লাইব্রেরী, ১৯২১। ১৫৪ পৃ। (কবিতা ও প্রবন্ধ সঙ্কলন। p. p. Ben. B 62)

অমরেন্দ্রকৃষ্ণ সেন, **খেতে পাই না কেন**? ধুবড়ি, ধুবড়ি পাবলিশিং হাউস্, ১৯৩? ১২ পৃ। (p. p. Ben. B 36)

অমরেন্দ্র নাথ দত্ত, **আশা কুহকিনী**। কলকাতা, এস. এন. দত্ত, ১৯০৯। ৭২ পৃ। (নাটক, p. p. Ben. B 2)

অমূল্যচরণ অধিকারী, **বিদ্রোহী রুশীয়া**। কলকাতা, বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩০। ২২৩ পৃ। (p. p. Ben. B 8)

অরুণচন্দ্র দত্ত, **যুগের বাঙ্গলা**। কলকাতা, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৩। ৬৩ পৃ। (p. p. Ben. B 69) (বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার জাগরণ)

আমার দেশ, কলকাতা, ব্রজেন্দ্রনাথ ভদ্র প্রকাশিত, ১৯৩? (বৃটিশ আমলে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর একটি পোস্টার) (p. p. Ben. F 1)

ইন্দুভূষণ ঘোষাল, **চব্বিশ পরগণা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন**: তৃতীয় অধিবেশন। কলকাতা, গ্রন্থকার, ১৯৩১। বজবজে ইন্দুভূষণ ঘোষালের বক্তৃতা (p. p. Ben. B 26)

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, **মন্দিরের কবি**। কলকাতা, কিরণ মাধব সেনগুপ্ত, ১৯৩১। ৪৮ পৃ। (p. p. Ben. B 37)

খোন্দকার আইন-অল-ইসলাম, **গরু ও হিন্দু মুসলমান**। এরফান আলি প্রকাশিত, ১৯১০। ১৮ পৃ। (p. p. Ben. D 6)

গঙ্গাচরণ নাগ, রাখীকঙ্কণ। ২য় সংস্করণ। বরিশাল, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯০৭। ২১৮ পৃ। উপন্যাস। (p. p Ben. B 48)

গানের বহ্নি, ময়মনসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত কীর্তনীয়া ও কুমুদ ভট্টাচার্য। ১৯৩—? ৮ পৃ। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বিষয়ে কবিতা। (p. p. Ben. B 24)

চারু বিকাশ দত্ত, **বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন**। কলকাতা, বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩—? ৯১ পৃ। (p. p. Ben. B 24)

চারুবিকাশ দত্ত, **রাজদ্রোহীর জবানবন্দী**। কলকাতা, দয়ানন্দ চৌধুরী, ১৯৩১। ৪৫ পৃ। (p. p. Ben. B 49)

ছাত্র সাংবাদিকা, **ছাত্র ফেডারেশন**, ১৯৪—? ৪ পৃ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে গণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বৃটিশের নির্যাতন সম্বন্ধে ছাত্রদের হাতে লেখা নিউজলেটার। (p. p. Ben. F 15)

ছাত্র সাংবাদিকা, সংখ্যা ১। ১৯৫০। পৃ ১। (p. p. Ben. F 17)

জাগো! জাগো!! শক্তি পূজার দিন আগত ঐ। [ ] ১ পৃ। পোস্টার। (p. p. Ben. B 26)

জীতেশ চন্দ্র লাহিড়ী, **বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচী**। রাজশাহী, মিত্র ব্রাদার্স, ১৯৩০। ৫৯ পৃ। (p. p. Ben. B 13)

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, **দেশের ডাক**। ৪র্থ সং, কলকাতা, কে. এস. রায়, ১৯২৮। ৬৫ পৃ। (বিদেশী শাসনে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা, p. p. Ben. B 19)

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, **বিপ্লবী বাঙ্গলা**। কলকাতা, দীনেন্দ্রকুমার গুহ, ১৯৩—?। ২৮ পৃ। (p. p. Ben. B 12)

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, **বিলাতী বস্ত্র বর্জন করিব কেন?** কলকাতা, ব্রজেন্দ্রনাথ ভদ্র প্রকাশিত। ১৯ং—?। ৩৯ পৃ। (p.p. Ben. B 9)

টলস্টয়, কাউন্ট লিও, **বিপ্লবের আহুতি**। কলকাতা, তরুণ সাহিত্য মন্দির, ১২২৮। ১১৬ পৃ। টলষ্টয়ের দুটি গল্পের অনুবাদ (বিনয়কৃষ্ণ সেন-কৃত) (p. p. Ben. B 10)

দয়ানন্দ চৌধুরী, **শিখের আত্মাহুতি**। কলকাতা, আর্য পাবলিসিং কোং, ১৯৩—?, ১৫১ পৃ। মোগলদের বিরুদ্ধে শিখদের সংগ্রাম। (p. p. Ben. B 56)

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, **প্রণব**। কলকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯১৪। ৩০২ পৃ। (খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনী, p. p. Ben. D 12)

দেশের ডাক। ১৯৩৮ ? ৬৬ পৃ। (বিদেশী শাসনে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিবরণ, p. p. Ben. B 20)

দ্বিজেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত, **স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ শ্রীহট্ট**। শ্রীহট্ট, শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত, ১৯৩—? ২৪ পৃ। (p. p. Ben. D 17)

নগেন্দ্রনাথ দাস, **দিনেশের শেষ**। কলকাতা, গ্রন্থকার, ১৯৩—?, ১২ পৃ। (কবিতা ও ছোট গল্প, p. p. Ben. B 23)

নগেন্দ্রনাথ দাস, **দেশভক্ত**। কলকাতা, গ্রন্থকার, ১৯৩—?, ১২ পৃ। (কবিতা, p. p, Ben B 17)

নগেন্দ্রনাথ দাস, **ফাঁসি**। কলকাতা, গ্রন্থকার, ১৯৩—?, ১২ পৃ। (কবিতা, ও প্রবন্ধ, p. p. Ben. B 44)

নগেন্দ্রনাথ দাস, **রক্তপতাকা**। কলকাতা, ১৯৩—?, ১২ পৃ। (কবিতা ও ছোটগল্প, p. p. Ben. B 51)

নগেন্দ্রনাথ দাস, **শোকসিন্ধু**। কলকাতা, ১৯৩—? ১২ পৃ। (কবিতা, p. p. Ben. B 58)

নজরুল ইসলাম, **চন্দ্রবিন্দু**। কলকাতা, ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৩—?, ১১১ পৃ। কবিতা, p. p. Ben. B 15)

নজরুল ইসলাম, **বিষের বাঁশী**। হুগলী, গ্রন্থকার, ১৯২৪, ৫৯ পৃ। (p. p. Ben. D 5)

নজরুল ইসলাম, **ভাঙ্গার গান**। হুগলী, গ্রন্থকার, ১৯২৪, ৩৩ পৃ। (p. p. Ben. D 1)

নজরুল ইসলাম, **যুগবাণী**। কলকাতা, গ্রন্থকার, ১৯২২, ৯২ পৃ। (প্রবন্ধ p. p. Ben. B 70)

নরেন্দ্রনাথ রায়, **সান ইয়াৎ সেন**। কলকাতা, বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩—? ৯৭ পৃ। (p. p. Ben. B 54)

নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী, **দেশের ডাক**। কলকাতা, সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৯২১। ২০ পৃ। (কবিতা ও প্রবন্ধ, p. p. Ben. B 21)

নলিনীকিশোর গুহ, **বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ**। ২য় সং, কলকাতা, বারিদকান্ত বসু, ১৯৩০। ২৬৫ পৃ। (p. p. Ben. B 4)

নলিনীকুমার সরকার (সংকলক), **বন্দনা**। কলকাতা, গ্রন্থকার, ১৯০৮, ২ খণ্ড। (বিভিন্ন কবির কবিতা, p. p. Ben, B 3।1, 2)

নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় **শ্রীভাঁওতা**। কলকাতা, এন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩—? ১০৩ পৃ। বৃটিশ শাসনের তথাকথিত সদিচ্ছার মুখোশের বিরুদ্ধে। p. p. Ben. B 59)

পথের গান। বরিশাল, মুকুন্দ দাস, ১৯৩—?, ২৪ পৃ। (p. p. Ben B 42)

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। **সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস**। ১ম খণ্ড। কলকাতা, নীরদবরণ দাস, ১৯০৯। ২৫৩ পৃ। (p. p. Ben D 16)

পুলিশ কর্তৃক মসজিদ অপবিত্র। কংগ্রেস কমিটি, ১৯৩—?, ১ পৃ। দিল্লীর একটি মসজিদ অপবিত্র করার প্রতিবাদে কংগ্রেস কমিটির ইস্তাহার। (p. p. Ben D 13)

প্রতাপচন্দ্র মাইতি, **স্বরাজ সঙ্গীত**। কলকাতা, এ সি মাইতি, ১৯৩১। ৯৬ পৃ। (স্বরাজ পথে সিরিজ নং ২, p. p. Ben. B 63|64)

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, **মুক্তিপথে**। মহিষবাথান, পি বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩—?, ১৯৭ পৃ। (কবিতা, p. p. Ben. B 40)

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **নবাবগঞ্জ যুব সম্মিলনী**। ঢাকা, সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৩১ ১৫ পৃ। (নবাবগঞ্জ যুবকেন্দ্রের সভাপতির ভাষণ, p. p. Ben. D 11)

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, **কালের ভেরী**। কলকাতা, নব্য সাহিত্য ভবন, ১৯৩১। ১০৮ পৃ। (প্রবন্ধ, p. p. Ben. B 29।30)

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (সংকলক) **ডমরু**। কলকাতা, বি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩০, ৩৫ পৃ। (বিভিন্ন কবির কবিতা। p. p. Ben B 16)

বিমলা দেবী, **শিখীপুচ্ছ**। কলকাতা, ফণীন্দ্রনাথ পাল, ১৯৩০। (নাটক, p p Ben B 16)

ব্রজবিহারী বর্মন রায়, **তরুণ বাঙ্গালী**। কলকাতা, বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩—? ১৪৫ পৃ। (p p Ben B 66)

ব্রাইবন, উইলিয়াম জেনিংস, **ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন**। সান ফ্রান্সিসকো, হিন্দুস্থান গদর (তারিখ নেই)। লেখকের ইংরাজী প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ)

ভাঙ্গার পূজারী। ১৯৩—? ১ পৃ। (বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বানে প্রচারপত্র) (p p Ben D 9)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। **কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন : শয়তান সরকারের যুদ্ধে সাহায্য করিও না**। (ছাত্র ফেডারেশন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, তৃতীয় আন্তর্জাতিক, বাঙ্গলা জেলা কমিটি, ১৯৪—? ১ পৃ। হাতে লেখা প্রচারপত্র। p p Ben F 16)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, **কারাগারে বন্দী স্বাধীনতা যোদ্ধাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার চাই**। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি, ১৩৪০। ১ পৃ। (p p Ben D 8)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, **ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন**। ১৯৪—? ৯ পৃ। (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্য না করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন—হাতে লেখা p p Ben F 18)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, **রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য অগ্রসর হও**। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি, ১৯৪০। ৩ পৃ। হাতে লেখা প্রচারপত্র (p p Ben F 19)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শাখা) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি। **সরকারের যুদ্ধে চাঁদা দিও না**। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি, ১৯৪—? ১ পৃ। (p p Ben F6/F 14)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, (তৃতীয় আন্তর্জাতিকের শাখা,) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি। **পাট সমস্যা ও আমদের কর্তব্য**। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কর্তব্য, ১৯৪১, ৪ পৃ। কৃষক সার্কুলার নং ৫। (p p Ben F।4)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শাখা) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি। **বাংলাদেশের নরনারীর কাছে কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন**। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা, ১৯৪—? ৪ পৃ। (p p Ben F/2 F/3)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শাখা) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি। **রাজবন্দীরা এগারো দিন উপবাসে, তাদের জন্য আপনি কি করেছেন**? বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি, ১৯৪০। ১ পৃ। (p p Ben F 5/F 13)

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, **কালের পথে**। কলকাতা, যুগমন্ত্র পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯২৯। ৯৪ পৃ। (ছোটগল্প, p p Ben, B 14)

মতিলাল রায়, **শতবর্ষের বাঙ্গলা**। চন্দননগর, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ১৯২৭। ৯৩ পৃ। (খ্যাতনামা বাঙ্গালীদের জীবনী p p Ben B 55)

মণীন্দ্রনারায়ণ রায়, **মায়ের ডাক**। কলকাতা চিরঞ্জিব রায়. ১৯৩১। ১ ৩ পৃ। (ছোটগল্প, p p Ben B 38)

মনোরঞ্জন গুপ্ত, **জন মাইকেল ও বিপ্লবী আয়ারল্যাণ্ড**। কলকাতা, সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৯২৯। ২৪৪ পৃ। (p p Ben B 27)

মহাদেব দেশাই, **বারদোলী সত্যাগ্রহ**। কলকাতা, হেমপ্রভা দাশগুপ্তা প্রকাশিত, ১৯৩১। ৩১১ পৃ। অনুবাদক: সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। (pp Ben B 5)

মুকুন্দ দাস, **কর্মক্ষেত্র**। ৩য় সংস্করণ। বরিশাল, আনন্দ আশ্রম, ১৯৩০। ১৮২ পৃ। (নাটক, p p Ben B 31)

মুকুন্দ দাস, **কর্মক্ষেত্রের গান**। ৩য় সংস্করণ, বরিশাল, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩—? ২৪ পৃ। (p p Ben, B 32)

মুকুন্দ দাস, **কর্মক্ষেত্রের গান**। ৪র্থ সংস্করণ, বরিশাল, গ্রন্থকার, ১৯৩—? ২৪ পৃ। (p p Ben B 33)

মুকুন্দ দাস, **কর্মক্ষেত্রের গান**। ৫ম সংস্করণ, বরিশাল, গ্রন্থকার, ১৯৩—? ২৪ পৃ। (p p Ben B 34)

মুকুন্দ দাস, **কর্মক্ষেত্রের গান**। ৬ষ্ঠ সংস্করণ, বরিশাল, গ্রন্থকার, ১৯৩—? ২৪ পৃ। (p p Ben B 35)

মুকুন্দ দাস, **পথ**। কাশীপুর। আনন্দময়ী আশ্রম, ১৯৩—? ৭৬ পৃ। (p.p Ben B 4)

মোছান্নেফ মুন্সী আছিরদ্দিন ও মুন্সী আবু সামাদ সাহেব, **হজরত আলি ও বীর হনুমানের লড়াই**। কলকাতা, আফাজাদ্দিন আহমদ, ১৯০৮। ২৮২ পৃ। (ব্যঙ্গ কবিতা, p p Ben D 7)

যশোদালাল আচার্য, **মায়ের ডাক**। বরিশাল, গ্রন্থকার, ১৯— ? ২০ পৃ। (কবিতা, p p Ben B 39)

যৌবনের ডাক। কলকাতা, আর্য্য পাবলিশিং কোং, ১৯২৯। ১১১ পৃ। বক্তৃতার সংলগ্ন। p p Ben B 68)

রক্ত চাই ! রক্ত চাই !! শুধু রক্ত চাই !!! ১৯৩—? ১ পৃ। (p p Ben B 50)

রমণীরঞ্জন গুহ রায়, **পূজার উপহার বাঙ্গলার—কথা**। কলকাতা, বলাই মুখার্জী প্রকাশিত। ১৯৩—? ১৭ পৃ। (বিদেশী শোষণে বাঙ্গলার অবস্থা। pp Ben B 46)

রাখালচন্দ্র ঘোষ, **বিপ্লবী অবনী মুখার্জী**। ঢাকা, গ্রন্থকার, ১৯২৯, ১৬৫ পৃ। p p Ben B 11)

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, **দেশবাসীর প্রতি নিবেদন**। শান্তিপুর, ১৯৩—? ৮ পৃ। (p p Ben B 18)

শ্রীকালভৈরব, **ভৈরব চক্র**। কলকাতা, হেমন্তকুমার সরকার, ১৯৫—? ১৩৫ পৃ। (উপন্যাস, p p Ben B 6)

শ্রীহট্টে স্বাধীনতা সংগ্রাম। কলকাতা, প্রবাসী প্রেস, ১৯৩—? ১ পৃ।

(শ্রীহট্টে পুলিস ও মিলিটারী অত্যাচারের ফোটোগ্রাফ ও ছবি—২য়, ৩য়, ৪র্থ ছবি—p p Ben F 7, 8, 9)

সখারাম গণেশ দেউস্কর, **তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত**। কলকাতা, গ্রন্থকার, ১৯০৮। ৭৬+২১০+৪৪২ পৃ। (p p Ben B 67)

সখারাম গণেশ দেউস্কর **দেশের কথা**। ৫ম সংস্করণ, কলকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯০৮। ৩৫৪+৩৯+৫ পৃ। (p p Ben B 7)

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, **স্বাধীনতার দাবী**। কলকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩১। ২৬৯ পৃ। (p p Ben B 61)

সান্ত্বনা গুহ, **অগ্নিমন্ত্রে নারী**। কলকাতা, শূলপাণী চক্রবর্তী—প্রকাশিত, ১৯৩১। ৯৬ পৃ। (বিপ্লবী নারীদের জীবনী, p p Ben B 1)

সান্ত্বনা গুহ, **ভাঙ্গার পূজারী**। কলকাতা বন্দেমাতরম সাহিত্য ভবন, ১৯৩১। ১০৩ পৃ। (p p Ben B 7)

সাবাস, বিমল সাবাস। ১৯৩—? ১ পৃ (শহীদ বিমলের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক পোস্টার। p p Ben, D 15)

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, **রক্তরেখা**। কলকাতা, দিনেশরঞ্জন দাশ প্রকাশিত, ১৯২৪। ৭২ পৃ। (কবিতা, p p Ben D 14)

সুরেশচন্দ্র দেব, **পূর্ণ স্বাধীনতা কেন চাই**? করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট কংগ্রেস সংঘ, ১৯৩—? ৯ পৃ। p p Ben B 47)

সুরেশচন্দ্র বসু, **হ'ল কি**? কলকাতা, এম সি বসু প্রকাশিত, ১৯০৫। ৩৯ পৃ। (নাটক p p Ben B 47)

সোমনাথ লাহিড়ী, **সাম্যবাদ**। কলকাতা, প্রকাশক মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩১। ৯৬ পৃ। গ্রন্থপঞ্জী আছে, মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বিষয়ে প্রবন্ধ (p p Ben B 65)

স্বরাজ সঙ্গীত। ২য় খণ্ড। কলকাতা, এ সি এম ১৯৩—? ১৩ পৃ। (p p Ben B 65)

স্বাধীন ভারত, ১৯৩—? ১ পৃ। (p p Ben E 10/11/12)

স্বাধীন ভারতঃ বিপ্লবী ভারতের একমাত্র ভরসা। কলকাতা, স্বতন্ত্র প্রেস, ১৯১—? ১ পৃ। (pp Ben B 60)

হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, **মুক্তির সাধনা**। শ্রীহট্ট, দ্বারকানাথ গোস্বামী, ১৯৩—? ৯ পৃ (p p Ben 10)

হেমেন্দ্রলাল রায়, **রিক্তা ভারত**। কলকাতা, হেমপ্রভা দাশগুপ্তা প্রকাশিত, ১৯৩২। ১৬২ পৃ। (p p Ben B 52)

ভারত-ইতিহাসচর্চায় সাম্প্রদায়িকতা ঃ

গ্রন্থপঞ্জী

ভারত-ইতিহাস অনুশীলনে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা যে ধরণের বাধা ও সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি করে তা স্পষ্ট করে তোলাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি-ভঙ্গিসম্পন্ন ঐতিহাসিকদের কাজ নতুবা ইতিহাস অধ্যয়ন ও ইতিহাসবোধ বিকৃত হতে বাধ্য। এই কাজ বিদ্যালয়স্তর থেকে গবেষণামূলক রচনার ক্ষেত্রে সর্বত্র ব্যাপ্ত করা প্রয়োজন। ভারত-ইতিহাস-চর্চায় অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী যাতে ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা সকলেই গড়ে তুলতে পারেন সেজন্য যে বইগুলি পড়া দরকার তার একটি প্রাথমিক তালিকা পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের 'ভারত ইতিহাস চর্চায় সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক আলোচনা উপলক্ষে (৭ এপ্রিল, ১৯৮৩, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত) প্রকাশ করা হয়েছিল। এ-বিষয়ে পূর্ণতর সূচী বর্তমানে প্রস্তুত করা হল। এই সংকলনকর্মে অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শিবাজী কয়াল, ডঃ রঞ্জিত সেন, অধ্যাপক আবু ওয়াহাব মাহমুদ, ডঃ হোসেনুর রহমান এবং ডঃ অমলেন্দু দে'র নানারূপ পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হয়েছি। আর আমার সূচী রচনার হাতেখড়ি বিশেষজ্ঞ-পঞ্জীকার রবীন্দ্রচর্চাবিদ প্রয়াত পুলিনবিহারী সেনের কাছে। এরা সকলেই সংকলয়িতার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

গৌতম নিয়োগী-সংকলিত

বাংলা

রোমিলা থাপার, হরবনস্ মুখিয়া এবং বিপানচন্দ্র, সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-ইতিহাস রচনা। মূল ইংরাজী থেকে ভাষান্তর—তনিকা সরকার। কে. পি. বাগচী, কলকাতা, ১৯৭৬। ৭৯ পৃ।

কাজী আবদুল ওদুদ, হিন্দু মুসলমানের বিরোধ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ। ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দিলীপকুমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা। সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৪৭। ৩, ৯৫ পৃ।

দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। কলকাতা, দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং, অষ্টম সং, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

গৌতম নিয়োগী, 'ইতিহাস পাঠ এবং সাম্প্রদায়িকতা', দেশ, ৫১ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২৮ জুলাই, ১৯৮৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইতিহাস (প্রবোধচন্দ্র সেন ও পুলিনবিহারী সেন-সংকলিত), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা। শেষ সংস্করণ, ১৯৮৩।

কাজী আবদুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ। কাজী খুরশিদ বখত-প্রকাশিত। কলকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সাধনা।

নির্মলকুমার বসু, হিন্দু সমাজের গড়ন। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ। ১৫৬ পৃ।

অমলেন্দু দে, স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিচালনা : প্রয়াস ও পরিণতি। রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৫। ১১৩ পৃ। পরিশিষ্ট।

কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা।

ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতে হিন্দুমুসলমানের যুক্ত সাধনা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা ১৯৪৬। (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)

ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা।

আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭—১৯১৮)। মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৬৩। ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৭১। ভূমিকা : নীহাররঞ্জন রায়। ৩৮২ পৃ + গ্রন্থপঞ্জী।

গিরিশচন্দ্র সেন, কোরাণ শরীফ। চতুর্থ সংস্করণ, নববিধান পাবলিকেশন সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৩৬। ভূমিকা : মৌলানা আক্রাম খাঁ।

প্রমথ চৌধুরী, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান। কলকাতা, ১৯৪৩।

মুহম্মদ আবদুল জলিল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক। পাবনা, বাংলাদেশ, ১৯৮৩। পরিবেশক : খান ব্রাদার্স, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান, স্বরূপের সন্ধানে। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৫।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৬৫।

আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ। মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭। ৪৩৫ পৃ।

ঐ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮।

ঐ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচিন্তা, ঢাকা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলকাতা, ১৯৩৫।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বঙ্গে বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৬ বঙ্গাব্দ।

কালীপদ বিশ্বাস, যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়।

ওয়াকিল আহমদ, সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য। ঢাকা, মাঘ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর। ঢাকা, ১৯৭৭।

অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক। রত্না প্রকাশন, কলকাতা। ২২৫ পৃ। পরিশিষ্ট।

বদরুদ্দিন উমর, সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা। ঢাকা ও কলকাতা। চিরায়ত প্রকাশন।

গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর। কলকাতা, ১৯৪৮।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

সুশোভন সরকার, "প্রগতিশীল ইতিহাসচর্চার উপর হিন্দুত্বের আক্রমণ", পরিচয়, ডিসেম্বর, ১৯৭৭।

এস, ওয়াজেদ আলি. আকবরের রাষ্ট্র সাধনা।

ঐ, মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ।

আনওয়ারুল কাদির, "বাঙালি মুসলমানের সামাজিক গলদ", শিখা, ১ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

কাজী নজরুল ইসলাম, "হিন্দু-মুসলমান", গণবাণী, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬।

ঐ, "মন্দির ও মসজিদ", গণবাণী, ২৬ আগস্ট, ১৯২৬।

মহম্মদ আবদুল হাকিম, "হিন্দুমুসলমান মিলনের অন্তরায়", বঙ্গনূর, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ, ১৩২৬।

জগদীশনারায়ণ সরকার, বাংলায় হিন্দুমুসলিম সম্পর্ক (মধ্যযুগ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ। ৭০ পৃ + গ্রন্থপঞ্জী। ভূমিকা : দিলীপকুমার বিশ্বাস।

সুকুমার সেন, প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ। (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)।

সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালী। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা। ১৩৫২ বঙ্গাব্দ। (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)।

দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ। দুই খণ্ড, কলকাতা, ১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দ।

নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস। আদিপর্ব, কলকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ। শেষ সংস্করণ। দু'খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতীয় সাধনায় ঐক্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ। (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)।

সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাঙলার ইতিহাসের দুশো বৎসর, স্বাধীন সুলতানের আমল, কলকাতা, ১৯৬২।

সুশীলা মণ্ডল, বঙ্গদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), প্রথম পর্ব, কলকাতা, ১৯৬৩।

বিমানবিহারী মজুমদার, চৈতন্যচরিতের উপাদান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা। ১৯৩১।

আবদুল করিম (সাহিত্যবিশারদ), বাঙলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ। ১ম খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৭।

সুকুমার সেন, ইসলামী বাংলা সাহিত্য। ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৩ বঙ্গাব্দ।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

অমলেশ ভট্টাচার্য, "ভারতে হিন্দুমুসলমান সাধনা ও সমন্বয়", চতুরঙ্গ, মে, ১৯৮৫, বর্ষ ৪৬। সংখ্যা ১, বৈশাখ, ১৩৯২। পৃ ২১-৩০।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাসচিন্তা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৮৪।

চার্বাক সেন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ভারতবর্ষ, বারাসত, ১৯৮২।

অনজ্ঞানন্দ (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), স্বরাজ ও জাতিভেদ, কলকাতা, ১৯২৩।

দেবী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) জাতিভেদ বনাম প্রগতি, কলকাতা, ১৯৮৩।

English :

Thapar, Romila, Mukhia, Harbans and

Chandra, Bipan, *Communalism and the Writing of Indian History*, People's Publishing House, New Delhi, 2nd, 1977, p 61. Originally published in 1969.

Chandra, Bipan, *Communalism in Modern India*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1984.

Smith, Wilfred Cantwell, *Modern Islam in India, a Social Analysis*, 2nd edn, Victor Gollanz, London, 1945. Originally published in 1943 from Lahore.

Joshi, P. C, "The Economic background of Communalism in India", in B. R. Nanda (ed.), *Essays in Modern Indian History*, Delhi, 1980.

Rahman, Hossainur, *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, 1905-1947. Nachiketa Publications, Bombay, 1979. Foreward: Nirmal Kumar Bose. p 95+ Appendies, bibliography.

De, Amalendu, ***Roots of Seperatism in Nineteenth Century Bengal,*** Ratna Prakashan, Calcutta, 1974. Foreward : N. K. Sinha. p 106+ Appendices, bibliography.

Mukhia, Harbans, "Communalism : A study in its Socio-Historical Perspective", *Social Scientist*, Vol I, No. 1, August, 1972.

Hasan, Mushirul, *Nationalism and Commnnal Politics in India,* New Delhi, 1979.

Hasan, M (Ed.), *Communal and Pan-Islamic Trends in Colonial India,* 1916-1928, New Delhi, 1979.

Chandra, Satis, *Communal Interpretation of Indian History,* New Delhi, n-d.

Chandra, Sudhir, "Communal Consciousness in Late 19th Century Hindi Literature", in Hasan, Mushirul (ed.), *Communal and Pan-Islamic Trends in Colonial India*; New Delhi, 1981.

Tara Chand, *Influence of Islam on Indian Culture,* the India Press Limited, Allahabad, 1946. Reprints, 1963.

Desai A. R, *Social Background of Indian Nationalism,* Bombay, 3rd edn, 1959.

Dixit, Prabha, *Communalism—A struggle for Power,* New Delhi, 1974.

Husain, S. Abid, *The Desttny of Indian Muslims,* Bombay, 1965.

Hunter, W. W, *The Indian Musalmans,* New Delhi, 1969. (reprint)

Gopal, Ram, *Indian Muslims : A Political Study* (1858-1947), Bombay, 1959.

Habib, Irfan, "The Contibutions of Historians to the Process of National Integration in India—Medieval Period," Proceedings of the Indian History Congress, 1961, Calcutta, 1963.

— "Economic History of the Delhi Sultanate. An Essay in Interpretation", The Indian

Historical Review, Delhi, Vol IV, No 2, January, 1978.

Krishna, K. B, *The Problem of minorities,* London, 1939.

Krishna, Gopal, "Religion in Politics", *The Indian Economic and Social History Review,* Delhi, Vol VIII, No 4, December, 1971

Islam, Mustafa Nurul,, *Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in the Bengali Press,* 1901-30, The Bengal Academy, Dacca, 1980, p. 341

Ahmed, Imtiaz, "Perspective on the Communal Problem," ICSSR, Research Abstract Quarterly, Vol II, No 1, October, 1972

Ahmed Sufia, Muslim Community in Bengal, 1884-1912, Dacca, 1974.

Ali, M. Athar, *The Mughal Nobility under Aurangzeb,* Bombay, 1966

— "The religions issue In the war of succession," *Medieval Indian Quarterly,* Vol. V, 1963, Aligarh.

Azad, Maulana Abul Kalam, *India Wins Freedom,* Bombay, 1959 (reprint)

Chandra Bipan, *Nationalism and Colonialism in Modern India,* New Delhi, 1979.

Gandhi, M. K, *Way to Communal Harmony,* Ahamedabad, 1963.

Haq, Mushirul, Muslim Politics in Modern India, 1857-1947. Meerut, 1970

Kabir, Humayun, *Muslim Politics and other Essays,* Calcutta, 1969.

Khan, Iqtidar Alam, "Mughal Nobility and Akbar's Religions Policy," *Journal of Royal Asiatic Society,* London, 1968.

Momen H., *Muslim Politics in Bengal,* Dacca, 1972.

Prasad, Beni, *The Hindu-Muslim Questions,* Allahabad, 1941.

Shakir, Moin, *Khilatat to Partition,* New Delhi, 1970.

Thapar, Romila, *Ancient Indian Social History*, New Delhi, 1968

— Past and Prejudice, New Delhi, 1975.

Thursby, G. R, *Hindu-Muslim Relations in British India.*

Zakaria, Rafiq, *Rise of Muslims in Indian Politics.*

Chowdhury, V. C. P., *Secularism versues Communalism : An Anatomy of the National Debate on Five Controversial History Books.* Navadhara Samiti, Patna; 1977.

Adhikari, Gangadhar; *Pakistan and National Question*; Bombay; 1944.

Sarkar, Susobhan, "Delhi Crusade against Modern Historians", in *The Amrita Bazar Patrika*; 23 November, 1977.

Roy M. N., *The Historical Role of Islam,*

Hodson, The Great Divide.

Hashem, Abdul, *In retrospection,*

Mehta A. and Pattwabardhan, A, *The Communal Triangle in India*, Allahabad, 1942.

De, Amalendu, *Islam in Modern India,* Maya Prakashan, Calcutta, 1984.

Tripathi, A, Chandra, B, and

De, Barun, *Freedom Struggle,* National Book Trust, New Delhi, 1973.

Khan, I. A, *etal* (eds.), *Assalt on Reason : Snippets from the historical Writing of Muslim Communalism* (Pamphlet published by Aligarh historians group), December, 1980.

Mallick, Azizur Rahman, *British Policy and the Muslims in Bengal,* The Asiatic Society of Pakistan (now Bangladesh), Dacca, 1961.

Clark, T. W, "The role of Bankim Chandra in the development of Nationalism", in C. H. Philips (ed), *Historians of India, Pakistan and Ceylon,* London, 1961.

Ahmed,, Rafiuddin, *The Bengal Muslims*. Oxford, 1983.

Sen, Kshitimohon, *Medieval Mysticism in India*, tr. by Monomohon Ghosh, Calcutta, 1936, with a foreward by Rabindranath Tagore. Reprint, New Delhi, 1974.

Abdul Wadud, Qazi, "The Mussalmans in Bengal", in A. C. Gupta (ed.) *Studies in Bengal Renaissance*, Calcutta, 1958.

Abdul Latif, Sayyid, *An Outline of the Cultural History of India*, Institute of Indo-Middle East Cultural Studies, Hydrabad; 1958.

Yusuf Ali, A, *Medieval India. Social and Economic Conditions*, London, 1932.

Sharma, Sri Ram, *The Religious Policy of the Mughal Emperors*; New Delhi, latest edn. 1972.

Qanungo, Kalika Ranjan, *Dara Soukoh*, Lucknow, 1953.

Habib, Muhammad, "Indo-Muslim Mystics", in the Journal of the Aligarh Muslim University, Vol IV, 1937.

Sarkar, Jagadis Narayan, *Islam in Bengal*, Ratna Prakashan, Calcutta, 1972.

— Thoughts on Indian History. Presidential Address; Indian History Congress, 37 sesstion, Calicut, 1976.

Tarafder, M. R, *Husain Shahi Bengal*, Asiatic Society, Dacca, 1965.

Paras Ram and G. Murphy; "Recent investigations of Hindu-Muslim relations in India"; in *Human Organisation*, Vol II, No 2, 1951.

Yasmin Muhammad; *A Social History of Islamic India*; 1605-1748, Lucknow; 1958.

Goetz, H, *The Gensis of Indo-Muslim Civilization*, Calcutta; 1931.

Crooke; W.; *Islam in India*; London; 1921, reprint New Delhi, 1972,

Ali (Mrs.), Mir Hahan; *Ovservation on the Indian Musalmans*; London; 1917.

Oman, J. S. *The Mystics*; *Asceties and Saints of India*; London, 1903.

Carpenter, J. E, *Thusin Mediaral India*, London, 1926.

Yasin, Muhammad, "Social Condition in Midieval India", in the *Quarterly Review of Historical Studies*, Vol V, No 4; 1965-66.

Wise, James; "The Muhamedans of Eastern Bengal"; in the *Journal of the Asiatic Society of Bengal*; Vol 63, (1894), pt 3; No 1.

Thomas, F. W; *Mutual Influence of Muhammadans and Hindus in India*; Cambridge, 1892.

Nizami, K. A, *Some Aspects of Religion and Politics in the Thirtenth Century*, Aligarh, 1961.

Karim, Abdul, *Social History of the Muslim In Bengal*, the Asiatic Society of Pakistan (now Bangladesh), Dacca, 1959.

Aziz Ahmad, *Studies in Islamic Culture in the Indian Environment*; Oxford, 1964.

লেখক পরিচিতি

ডঃ ইকতিদার আলম খান, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক।

ডঃ বরুণ দে, কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেস্-এর ইতিহাসের অধ্যাপক। সদস্য, কার্যকরী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।

অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ অফ উইমেন-এর ইতিহাস বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।

ডঃ অশীন দাশগুপ্ত, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর। প্রাক্তন অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।

ডঃ গৌতম নিয়োগী, খড়্গপুর কলেজের ইতিহাস বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। প্রাক্তন অধ্যাপক, টাকী সরকারী কলেজ এবং দার্জিলিং সরকারী কলেজ। সদস্য, কার্যকরী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।